একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়

একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়

মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯৩/ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭
মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০০ কপি

দ্বিতীয় সংস্করণ
আষাঢ় ১৩৯৪/জুন ১৯৮৭
মুদ্রণ সংখ্যা ৫০০০ কপি

(স্বত্ব)
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র

প্রচ্ছদ
কামরুল হাসান

প্রকাশক/মুদ্রক
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র কর্তৃক
৩১ই তোপখানা ঢাকা—২ থেকে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত

মূল্য
৩৫ টাকা

সূচীপত্র

মুখবন্ধ/৪

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে/৬

ভূমিকা/৯

পুনর্বাসনের পটভূমি/১৪

পুনর্বাসিত শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ/৩০

আরও কিছু মুখ্য স্বাধীনতা বিরোধী/৮৩

রাজাকার, আলশামস ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী দল/১০০

পুনর্বাসিত আল বদর/১০৮

একাত্তরের কয়েকটি দলিল চিত্র/১৬৯

উপসংহার/১৭৭

পরিশিষ্ট/১৭৯

মুখবন্ধ

মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র দেশ ও জাতির এমন এক সংকট পরিস্থিতিতে গঠন করা হয়েছিল, যখন স্বাধীনতাবিরোধী রাজনৈতিক শক্তি, একাত্তরের ঘাতক ও পাক হানাদার বাহিনীর এদেশীয় দোসররা, দেশের রাজনৈতিক অঙ্গনেই শুধু প্রতিষ্ঠিত নয়, সরকার ও প্রশাসনের সর্বত্র তাদের অশুভ উপস্থিতি প্রকটভাবে প্রতীয়মান। যার ফলে মুক্তি-যুদ্ধের সমুদয় চেতনাকে সম্পূর্ণভাবে নস্যাৎ করে দিয়ে জাতীয় অর্থনীতি, সমাজ ও সংস্কৃতি জীবনে প্রতিক্রিয়াশীল পশ্চাদপদ নীতি ও ধ্যান ধারণা প্রতিষ্ঠা ও প্রচার করা হচ্ছে। সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা ও সমাজতন্ত্রকে আনুষ্ঠানিক ভাবে খারিজ করে রাষ্ট্রায়ত্ত্ব ব্যাংক, শিল্প-কারখানা ও অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ব্যক্তিমালিকানায় ফি[illegible] দিয়ে, দুর্নীতি চোরাচালান ও ফড়িয়াগিরির ব্যাপক প্রসার ঘটিয়ে [illegible]ষ্টমেয় ব্যক্তিকে হাজার হাজার কোটি টাকার মালিক বানিয়ে, দে[illegible] শতকরা নব্বই ভাগ মানুষকে দারিদ্র্য সীমার [illegible]চে ঠেলে দিয়ে [illegible]শে এক ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি করা হয়েছে।

স্বাধীনতার জন্য জীবনদান যদি স[illegible] মূল্য হয় বাঙ্গালী জাতির মত এত বেশী মূল্য অন্য কোন জা[illegible] দিতে হয় নি। অথচ স্বাধীনতার ষোল বছর অতিক্রান্ত না হতেই স্বাধীনতার ইতিহাস ও চেতনা নতুন প্রজন্মের নাগরিকরা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। এই বিস্মরণ অস্বাভাবিক নয় এ কারণে যে, স্বাধীনতার পর যে কয়টি সরকার আমরা পেয়েছি তারা কেউই মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে চায় নি। বরং চেয়েছে এই চেতনা গোটা জাতির স্মৃতি থেকে দ্রুত অবলুপ্ত হোক। যে কারণে গোলাম আজম, আব্বাস আলী খান বা মওলানা মান্নানের মতো একাত্তরের ঘাতকদের এদেশের রাজনীতিতে বা সরকারের মন্ত্রীসভায় স্থান করে নিতে দেখেও আমরা নিন্দা করি না, প্রতিরোধ গড়ে তুলি না। একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা যখন সরকার প্রশাসন, রাজনীতি কিম্বা শিল্প সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে বসে ছুরি শানাচ্ছে আরেকটি গণহত্যার জন্য, সরকার তখন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত করার জন্য। এ কথা আমরা বহুবার বলেছি, আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুষ্টিমে[illegible] লোক হানাদার বাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে স্বাধীনতার পক্ষের শ[illegible]ত্রুর উপর ইতিহাসের নৃশংসতম গণহত্যা চালিয়েছিল। আমরা চিনি তারা কারা। একাত্তর বাহাত্তরের সংবাদপত্রে তাদের তৎপরতার খবর প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে তাদের ধরিয়ে দেয়ার জন্য প্রতিদিন সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয়েছে। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য সরকারী তত্ত্বাবধানে রচিত মুক্তিযুদ্ধের ১৫ খণ্ডের বিশাল ইতিহাসে

তাদের নাম ছাপা হয় নি। আরো বিস্মিত হই তখন—যখন এইসব ঘাতকদের দেখি পত্রিকায় সদম্ভে ঘোষণা করে—'একাত্তরে আমরা ভুল করি নি।' কিম্বা যখন বলে '...কিসের বিতর্কিত আমি?—' অথচ এর বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ হয় না।

আমরা আগেও বহুবার বলেছি, এখনও বলছি, তালিকা প্রস্তুত করা দরকার মুক্তিযোদ্ধাদের নয়; মুক্তিযোদ্ধাদের তালিকা প্রস্তুত সম্ভব নয়, কারণ দেশের তখনকার সাত কোটি মানুষই ছিলেন মনে প্রাণে মুক্তিযোদ্ধা। তালিকা প্রস্তুত করা দরকার একাত্তরের গণহত্যার জন্য যারা দায়ী সেই মুষ্টিমেয় ঘাতক ও দালালদের, যাতে দেশবাসী তাদের সম্পর্কে সজাগ থাকতে পারেন—তাদের পুনর্বাসন প্রয়াসকে প্রতিহত করতে পারেন।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের নাজী বাহিনী জার্মানী সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে যে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল সেইসব ঘাতকদের তালিকা প্রস্তুত এবং অনুসন্ধানের কাজ ৪৫ বছর অতিক্রম করার পরও অব্যাহত রয়েছে। এখনও তাদের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হচ্ছে তাদের অপরাধের জন্য। সেই সব অপরাধী এখনো তাদের দেশে ভোটাধিকার পর্যন্ত ফিরে পায় নি। অথচ আমরা তাদের মন্ত্রী সভায় স্থান দিচ্ছি, সংসদে নির্বাচিত হওয়ার সুযোগ দিচ্ছি; পাকিস্তানের নাগরিক কুখ্যাত ঘাতক গোলাম আজমকে বাংলাদেশের মাটিতে বসে গণহত্যার রাজনীতি করার সুযোগ দিচ্ছি।

জাতিকে এই সংকট পরিস্থিতিতে সতর্ক করার প্রয়োজনে আমাদের এই প্রয়াস। এই গ্রন্থটিতে একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের সম্পর্কে যে সব তথ্য দেয়া হয়েছে প্রায় সবই সেই সময়ের সংবাদপত্র থেকে নেয়া। এই সব তথ্য যেহেতু যথাযথভাবে গ্রন্থকারে প্রকাশিত মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ১৫ খন্ডের কোথাও ছাপা হয় নি সেহেতু এই গ্রন্থটিকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের ১৬তম খন্ড হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে। তবে এটিও নির্দিষ্ট বিষয়ের পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ নয়। সীমিত ক্ষমতা ও সময়ের ভেতর এটি আমাদের প্রথম প্রয়াস। ভবিষ্যতে আরো কটি খন্ডে ইতিহাসের এই বিশেষ পর্বটিকে পূর্ণাঙ্গরূপে বিবৃত করবার পরিকল্পনা রয়েছে। আমাদের এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য গোটা দেশবাসীর সহযোগিতা প্রয়োজন। আপনারা আপনাদের এলাকার ঘাতক ও দালালদের তথ্য আমাদের কেন্দ্রে প্রেরণ করুন। কোন বিদ্বেষের বশবর্তী নয়, স্বাধীনতার সঠিক ইতিহাস যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনেই এই সব তথ্য সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা দরকার।

কেন্দ্রীয় কমিটি
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র
১০ ফেব্রুয়ারী, ১৯৮৭

দ্বিতীয় সংস্করণ প্রসঙ্গে

গত ফেব্রুয়ারীতে বাংলা একাডেমীর বই মেলায় 'একাত্তরের দালাল ও ঘাতকরা কে কোথায়, বের হওয়ার দশ দিনের ভেতর ৫০০০ কপি. বই বিক্রি হয়ে যায়। শুধু বইমেলার ইতিহাসে নয়, বাংলাদেশের প্রকাশনা জগতে এটি একটি অভূতপূর্ব দৃষ্টান্ত। বইটির বিপুল চাহিদা এটাই প্রমাণ করে—এদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে অবলুপ্ত করার যত চক্রান্তই করা হোক না কেন, জনসাধারণের ভেতর এই চেতনা আজও জাগ্রত রয়েছে। সাধারণ মানুষ, বিশেষভাবে তরুণ সমাজ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অবিচ্ছেদ্য এই অধ্যায়টি জানবার প্রয়োজনেই এই বইটি কিনেছেন এবং পড়েছেন। আমাদের চিঠি লিখে জানানো হয়েছে বইটির বিপুল চাহিদার কারণে মফস্বলের কিছু অসাধু ব্যবসায়ী ২৫ টাকার বই ৫০ থেকে ১০০ টাকায় বিক্রি করেছেন।

সাধারণ পাঠকদের ভেতর বিপুলভাবে সমাদৃত হলেও কয়েকটি পত্রিকায় এই বই সম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কিছু মন্তব্য করে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করেছে। এই সব পত্রিকার অভিযোগ হচ্ছে—(১) এই বইয়ে দালালদের যে তালিকা দেয়া হয়েছে সেটি অসম্পূর্ণ, ইচ্ছাকৃতভাবে কিছু দালালের নাম বাদ পড়েছে, বিশেষ করে চীনপন্থী হিসেবে পরিচিত বামপন্থী নেতাদের নাম, যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন (২) শেখ মুজিবুর রহমান ঘাতক ও দালালদের ক্ষমা করে মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিলেন অথচ এই বই পড়লে মনে হয় দালালদের পুনর্বাসনের জন্য তিনিও কম দায়ী নন। এবং (৩) এই বইয়ে কোন লেখকের বা সম্পাদকের নাম না থাকায় এর যথার্থতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে।

প্রথম অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, এ বইয়ের প্রথম সংস্করণে আমরা সবিনয়ে স্বীকার করেছি এবং বর্তমান সংস্করণ সহ ভবিষ্যতে যে কটি সংস্করণ হবে—স্বীকার করতেই হবে, দালাল ও ঘাতকদের সম্পূর্ণ তালিকা সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। প্রথম সংস্করণে আমরা বলেছিলাম এবং এখনও বলছি আমরা এই তালিকার আরো নাম সংগ্রহ করার চেষ্টা করছি এবং অবশ্যই যুক্তি প্রমাণ সাপেক্ষে। আমরা কাদের দালাল বা ঘাতক বলবো তার ভিত্তি এ বইয়ের ভূমিকায় বলা হয়েছে। বইটি রচনার ক্ষেত্রে যে শৃংখলা রক্ষা করা হয়েছে তার ভিত্তিতে প্রমাণিক দলিল সমেত নতুন কোন নাম জেনে অবশ্যই তা অন্তর্ভূক্ত করা হবে। তবে ৭১-এ চীনপন্থীদের ভূমিকা নিয়ে ভিন্ন রচনা লেখা যেতে পারে; এ বইয়ে তার অন্তর্ভূক্তির অবকাশ নেই। কারণ গণহত্যায় অংশ নিয়েছেন বা পাক বাহিনীর ভূমিকাকে সমর্থন করে

কাগজে বিবৃতি দিয়েছেন কিংবা যুদ্ধ-পরবর্তী সরকার দালালীর অভিযোগ এনেছেন—এমন কোন চীনপন্থীর নাম আমরা ৭১' বা ৭২'-এর সংবাদপত্রে বা সরকারী গেজেটে পাই নি। পরবর্তী সময়ে পাওয়া গেলে অবশ্যই সেগুলি তালিকাভুক্ত করা হবে। বর্তমান সংস্করণে এই তালিকা আরো দীর্ঘ হয়েছে।

দ্বিতীয় অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, শেখ মুজিবুর রহমানের মূল্যায়ন তাঁর কাজের ভিত্তিতে করা হয়েছে। দালালদের ক্ষমা করে তিনি যে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন নি—সমাজে দালালদের বর্তমান উপস্থিতিই সেটা প্রমাণ করে। তাঁর সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের পরিবারের সদস্যরা কিভাবে মূল্যায়ন করেন বর্তমান সংস্করণে তা উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অভিযোগ সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র গঠিত হওয়ার পর পরই সাধারণ সভায় ৩খণ্ডে একাত্তরের দালালদের তালিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রথম পর্যায়ে কেন্দ্রের সভাপতি কাজী নূর উজ-জামান, সাধারণ সম্পাদক শাহরিয়ার কবির এবং কার্যনির্বাহী সদস্য ডঃ আহমদ শরীফকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। পরে আরো কয়েকজন বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবীকে অন্তর্ভুক্ত করে একটি সম্পাদকমণ্ডলী গঠন করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির নামে প্রকাশের সিদ্ধান্ত হয়। ১ম খণ্ড রচনার দায়িত্ব দেয়া হয় সৈয়দ শফিক আহমদকে। যেহেতু এটি এমন একটি গ্রন্থ যার প্রতি সংস্করণেই নতুন নতুন তথ্য সংযুক্ত হবে এবং বহু তথ্যদাতা নাম প্রকাশে ইচ্ছুক না হওয়ায় এই গ্রন্থ রচনার কৃতিত্ব বা দায়িত্ব কোন একক ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের চেয়ে প্রতিষ্ঠানের থাকাই বাঞ্ছনীয় বলে আমরা মনে করি। যেহেতু এই প্রতিষ্ঠান অজ্ঞাত ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত নয় সেহেতু এর কোন প্রকাশনা সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকা উচিত নয়।

দ্বিতীয় সংস্করণে কয়েকটি অধ্যায়ের আমূল পরিবর্তন করা হয়েছে এবং নতুন অনেক তথ্য সংযুক্ত হয়েছে। এই কাজে সাহায্য করেছেন সৈয়দ শফিক আহমদ ও আহমেদ মুসা। কলেবর বৃদ্ধির কারণে বর্তমান সংস্করণে বইয়ের দামও কিছুটা বাড়াতে হয়েছে। আশা করি আমরা আগের মতেই পাঠকের সহযোগিতা পাবো।

কেন্দ্রীয় কমিটি
মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র
৭ই জুন ১৯৮৭

ভূমিকা

গণহত্যাযজ্ঞের শিকার যে কোন জনগোষ্ঠীই তাদের ক্ষয়ক্ষতি ইতিহাসবদ্ধ করতে গিয়ে অতিরঞ্জন করে থাকে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা-যুদ্ধের নয় মাসে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও তাদের এদেশীয় দালালদের দ্বারা সংগঠিত নরমেধযজ্ঞকেও 'মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞ,' 'সাম্প্রতিক কালের নিষ্ঠুরতম হত্যালীলা' ইত্যাদি শব্দমালায় বর্ণনা করা হয়। বলা হয়ে থাকে, রক্তই যদি স্বাধীনতার মূল্য হয় তবে বাঙালী জাতি সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে।

বস্তুত এই বর্ণনায় স্বাভাবিক অতিরঞ্জন অনুপস্থিত। ১৯৮১ সালের ডিসেম্বর মাসে সর্বজনীন মানবাধিকারের ঘোষণার তেত্রিশতম বার্ষিকী উপলক্ষে জাতিসংঘ একটি রিপোর্ট বের করে। ওই রিপোর্টে বলা হয়, বিশ্বের ইতিহাসে যে সমস্ত গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে: তার মধ্যে স্বল্পতম সময়ে সর্বাধিক সংখ্যক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের গণহত্যায়। রিপোর্টে নিহতের সংখ্যা সর্বনিম্ন গণনায় অন্ততঃ ১৫ লক্ষ বলে উল্লেখ করে বলা হয় যে, ১৯৭১ সালের মার্চের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত দৈনিক গড়ে ৬ থেকে ১২ হাজার লোক নিহত হয়েছেন। মানব জাতির ইতিহাসে গণহত্যাযজ্ঞের ঘটনাসমূহে দৈনিক গড় নিহতের সংখ্যায় এটি সর্বোচ্চ। এদিক থেকে আমাদের স্বাধীনতাযুদ্ধের সময়কার হত্যাকাণ্ড নিঃসন্দেহে মানবেতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যাযজ্ঞ।

নিষ্ঠুরতার দিক দিয়েও এই হত্যাযজ্ঞের তুলনা নেই। অন্য কোন্

সত্র না ঘেঁটে শুধুমাত্র বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প প্রণীত খণ্ডমালার অষ্টম খণ্ডে গ্রন্থিত প্রত্যক্ষদর্শী ও ভুক্তভোগীদের জবানবন্দীর কয়েকটি পাঠ করলেই যে কেউ বুঝতে পারবেন, কেবলমাত্র ধর্ষকামী বিকৃত মস্তিষ্ক খুনীরা ছাড়া আর কেউ ঐ ধরনের হত্যাকান্ড সংগঠিত করতে পারবে না। বাংলাদেশের নিরপরাধ সাধারণ মানুষকে এই উন্মাদরা যে কসাইখানার পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট মনে করত, তার একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে দেয়া যেতে পারে। ভৈরবের কাছে নদীতীরের একটি শ্মশানে নিরপরাধ বাঙ্গালীদের হত্যা করা হত। গুলীর শব্দে চমকিত হয়ে যাতে গ্রামের লোকজন পালিয়ে না যায়, সে জন্য এসব হতভাগ্যদের জবাই করা হত। স্থানীয় একজন বৃদ্ধ কসাইকে প্রতিটি জবাইয়ের জন্য শান্তি কমিটির তরফ থেকে পাঁচ টাকা করে দেয়া হত। বধ্যভূমি থেকে কোন ক্রমে পালিয়ে আসা এক ব্যক্তির সংবাদপত্রে প্রকাশিত জবানবন্দী থেকে জানা যায়, পেছনে হাত বাঁধা মৃত্যুপথযাত্রীরা যখন জবাইয়ের জন্য শুতে না চেয়ে ধ্বস্তাধস্তি করত, তখন বৃদ্ধ কসাই তাদের অনুরোধ করত শুয়ে পড়তে, যাতে তারও কষ্ট না হয় আর তাদেরও যন্ত্রণা দ্রুত চিরতরে শেষ হয়ে যায়।

(হত্যাযজ্ঞের বর্ণনা পড়লে আরও একটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ হওয়া যাবে যে, এই বর্বরতায় ঘাতক পাকবাহিনীর সমান নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করেছিল তাদের এদেশীয় দালাল শান্তি কমিটি, জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, আল বদর, আল শামস, মুজাহিদ, রাজাকার, ইপকাফ (ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্সেস) প্রভৃতি বাহিনীর সদস্যরা।)

সেই খুনী দালালরা আজ আমাদের দেশের সর্বস্তরে পুনর্বাসিত হয়েছে। দেশের রাজনীতি, অর্থনীতিসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তারা আজ সবচেয়ে সুসংগঠিত ও প্রভাবশালী। এদের এক বিরাট অংশ আজও এদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার বিরুদ্ধে চক্রান্তে লিপ্ত।

পৃথিবীর দেশে দেশে স্বাধীনতাযুদ্ধের পর অজ্ঞাতনামা শহীদদের উদ্দেশ্যে স্মৃতি সৌধ স্থাপন করা হয়েছে, আর তালিকা তৈরী করে সুচিহ্নিত করা হয়েছে স্বাধীনতাবিরোধীদের। আমাদের দেশে হয়েছে ঠিক তার উল্টো। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে মুক্তিযোদ্ধাদের হেয় করা এবং দালালদের সুপরিকল্পিত ভাবে পুনর্বাসিত করার প্রক্রিয়া অনুযায়ী আজও তথাকথিত প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা তালিকা প্রণয়ন করা হচ্ছে; অন্যদিকে স্বাধীনতাবিরোধী, প্রমাণিত খুনীদের মন্ত্রীসভার সদস্যপদ দেয়া হচ্ছে। যদি শহীদের তালিকা তৈরী করতে হয় তবে অন্ততঃ তিরিশ লক্ষ নাম তাতে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের ভয়াল দিনগুলোতে

স্বাধীনতাকামী সবাই ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, সুতরাং চিহ্নিত করতে হলে মুষ্টিমেয় দালালদেরই চিহ্নিত করা প্রয়োজন।

স্বাধনীনতার অব্যবহিত পর বাংলাদেশ সফরে এসে ভারতের খ্যাতনামা সাহিত্যিক মুল্কুরাজ আনন্দ ১৬ জানুয়ারী ১৯৭২ সালে ঢাকায় বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় বলেছিলেন, 'আপনারা মসী ছেড়ে অসি ধরেছিলেন, এবার অসি ছেড়ে কলম ধরবেন, আপনাদের লেখায় যেন বাংলাদেশের বিপর্যয়ের ছবি আঁকা থাকে। লেখকরা সমাজের প্রতিনিধি। সমাজের হৃদস্পন্দন যেন আপনাদের লেখায় প্রকাশিত হয়। আপনাদের দেশে যে মর্মঘাতী কাহিনী অভিনীত হয়ে গেছে তা যদি প্রকাশ করতে না পারেন; জানবেন—এই দুঃখ প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই...এ'ও একটি কবিতা হবে।'

মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী হয়েও আমাদের সাহিত্যিক ও গবেষকরা এই হত্যাকান্ডের সামগ্রিক রূপরেখা বিশ্ববাসীর কাছে উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। আজও দেশবাসী সঠিকভাবে জানেন না কারা কিভাবে গঠন করেছিল শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল বদর। কোন আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে প্রাণ হারিয়েছিলেন আমাদের বুদ্ধিজীবীরা। স্বাধীনতাবিরোধী খুনী দালালদের পুনর্বাসনে স্বার্থান্ধ রাজনৈতিক নেতৃত্বের অবিমৃষ্যকারিতার পাশাপাশি সমাজের প্রতি বুদ্ধি-জীবী শ্রেণীর দায়িত্বহীনতাও কম দায়ী নয়।

আমাদের লেখক ও গবেষকদের সেই দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা হিসেবে আমাদের এই প্রয়াস। এতে তথ্যের স্বল্পতা আছে, কারণ তথ্যের সূত্র হিসেবে গবেষণাজাত কোন গ্রন্থ খুঁজে পাওয়া যায় নি। আমরা আশা করবো যোগ্য গবেষকরা এগিয়ে আসবেন, আমাদের অসম্পূর্ণতা দূর করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ইতি-হাসের এই কালো অধ্যায়টি যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করবেন।

সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় পনের খন্ডে সমাপ্ত স্বাধীনতাযুদ্ধের যে ইতিহাস রচনা করা হয়েছে, পড়লে পরিষ্কার বোঝা যায় মূলতঃ দালালদের ভূমিকাকে অত্যন্ত সুকৌশলে চেপে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়েই তা প্রণীত হয়েছে। দালালদের ভূমিকা প্রকাশের জন্য সবচেয়ে উপযোগী দলিলগুলিই এতে মুদ্রিত হয় নি; তদুপরি যে সমস্ত দলিল মুখরক্ষার জন্য ছাপা হয়েছে তাতেও বিকৃতি ঘটানো হয়েছে দালালদের পরিচয় গোপন রাখার মাধ্যমে। আমরা, কেউই আমাদের গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, গণহত্যার নায়ক, দালালদের সবাইকে চিনি না বা তাদের তৎকালীন ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে অবহিত নই। স্বাধীনতাযুদ্ধের

ইতিহাসগ্রন্থে কিভাবে দালালদের রক্ষার জন্য বিকৃতি ঘটানো হয়েছে তার একটি দৃষ্টান্ত এই গ্রন্থেই দেয়া হয়েছে।

বাঙ্গালী জাতির জন্য এটা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক যে, স্বাধীন বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলি সরকার গঠিত হয়েছে, প্রত্যেকে একাত্তরের ঘাতকদের পুনর্বাসনের জন্য কম বেশি দায়ী। শেখ মুজিবুর রহমান ঘাতক ও দালালদের বিচার না করে ক্ষমা করেছিলেন, জিয়াউর রহমান তাদের রাজনীতি করার অধিকার দিয়ে নিজের মন্ত্রীসভায়ও ঠাঁই দিয়েছেন এবং বর্তমানে হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ একই নীতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করছেন। জিয়াউর রহমান ও হোসেন মোহাম্মদ এরশাদ সংবিধান থেকে ধর্মনিরপেক্ষতা খারিজ করেছেন এই ঘাতকদের সন্তুষ্ট করার জন্য। জিয়াউর রহমান নিজে মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন এবং ক্ষমতায় থাকাকালীন বিভিন্ন সময়ে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সমুন্নত রাখার কথা বলেছেন। অথচ তিনিই শাহ আজিজুর রহমান, মওলানা আবদুল মান্নান ও আবদুল আলিমের মতো দালাল ও ঘাতকদের মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছেন। একই ভাবে বর্তমান রাষ্ট্রপতিও নিজে মুক্তিযোদ্ধা বলে দাবী করেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা বলেন অথচ তিনিও দালাল ও ঘাতকদের মন্ত্রীসভায় স্থান দিয়েছেন; বরং দালালদের পৃষ্ঠপোষকতার ক্ষেত্রে তিনি তাঁর পূর্বসূরীকেও অতিক্রম করেছেন। ফলে এটা খুবই স্বাভাবিক যে এই সব সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের যে ইতিহাস রচিত হবে সেখানে সত্য গোপন করা হবে, ঘাতকদের আড়াল করা হবে।

'৭১-এ গণহত্যাযজ্ঞের সময় দালালেরা মুক্তিযোদ্ধাদের 'অনুপ্রবেশকারী', 'দুষ্কৃতকারী', 'ভারতের চর', 'ব্রাহ্মণ্যবাদের দালাল', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী', ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করলেও এগুলো দ্বারা মূলতঃ সাধারণ নিরপরাধ স্বাধীনতামনা বাঙ্গালীদেরকেই বোঝাত। সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণকারী নিয়মিত মুক্তিযোদ্ধার সংখ্যা ছিল বড় জোর সোয়া লক্ষ, শহীদ হয়েছেন এর ক্ষুদ্র একটি অংশমাত্র। অথচ মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস ধরে বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতিতে দালালরা দেশের সর্বত্র 'দুষ্কৃতকারী' ও 'বিচ্ছিন্নতাবাদী'দের সমূলে উৎখাত করার কথা ঘোষণা করে বেড়িয়েছে। যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন হানাদার বাহিনীর আকস্মিক আঘাতে বিপর্যস্ত প্রাণ ভয়ে ভীত নিরীহ জনসাধারণ পালিয়ে যাচ্ছিলেন, যখন মুক্তিযোদ্ধারা সংগঠিতভাবে অবরুদ্ধ বাংলাদেশে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ শুরু করেন নি, তখনও এই ঘাতকের দল সর্বত্র 'দুষ্কৃতকারী' নির্মূল করে বেড়িয়েছে। সুতরাং দালালদের 'দুষ্কৃতকারী নির্মূল', 'বিচ্ছিন্নতাবাদী উৎখাত' ইত্যাদি কথার একটি মাত্র অর্থ হচ্ছে নিরপরাধ

নিরস্ত্র অসহায় মানুষের নির্বিচার হত্যা।

এই গ্রন্থে দালাল হিসেবে তাদেরই নাম উল্লেখ করা হয়েছে, যারা '৭১ সালে পাক হানাদার বাহিনীর কার্যকলাপকে সমর্থন করেছেন, হত্যাযজ্ঞে সহযোগিতা করেছেন, নিজেরা অংশ নিয়েছেন এবং যাদের স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার '৭২ সালে দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত করেছে। '৭১ সালে অবরুদ্ধ ঢাকার জাতীয় দৈনিকসমূহে দালালদের কার্যকলাপ গুরুত্বের সঙ্গেই লিপিবদ্ধ হয়েছে। এটা ঠিক যে সংবাদপত্রে তাদের নামই স্থান পেয়েছে যাদের নাম সংবাদ হওয়ার মতো গুরুত্ব বহন করত। এমনও দেখা গেছে কারো কারো দালালীর তৎপরতা '৭১-এর সংবাদপত্রে লিপিবদ্ধ হয় নি কিম্বা '৭২ সালে সরকার বা কোন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকেও তাদের বিরুদ্ধে দালালীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ আনা হয় নি, অথচ পরবর্তীকালে এই সব পাতি দালালরা জাতীয় রাজনীতি-মঞ্চে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাদের নাম এই গ্রন্থে উল্লেখ করা সম্ভব হয় নি। যাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের দালালীর বা নৃশংসতার পূর্ণ বিবরণও এই গ্রন্থে প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। তবে যতটুকু উল্লেখ করা হয়েছে তাদের চরিত্র নির্ণয়ের জন্য সেটুকু যথেষ্ট বলে আমরা মনে করি।

গ্রন্থে স্বাধীনতাবিরোধী মূল সংগঠনগুলির উৎপত্তি ও কার্যকলাপের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে নেতৃবৃন্দের কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এরা সহ সংশ্লিষ্ট অন্যদের নামের তালিকা এবং বর্তমান অবস্থান যথা সম্ভব পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। মূল আলোচনায় নাম নেই বলেই কোন দালালের স্বাধীনতাবিরোধী ভূমিকাকে লঘু করে দেখা ঠিক হবে না। পরিশিষ্টে নামের তা[illegible] হয়েছে সংগঠন, দল বা গোষ্ঠী ভিত্তিতে। যারা এই সব স[illegible] ক্ত নন (যেমন শর্ষিণার পীর) এবং বর্তমানে যা[illegible] দায়িত্বে নিয়োজিত তাদের কীর্তিকলাপ মূলগ্রন্থে [illegible] এ গ্রন্থ রচনায় '৭১ ও '৭২-এর সংবাদপত্র, সরকারী সূ[illegible] ও গেজেটকে গুরুত্ব দিয়েছি, এবং এসব সূত্র থেকে প্রাপ্ত জাতী[illegible] পর্যায়ে আলোচিত দালাল ও ঘাতকদের নাম ও কার্যকলাপ যতদূর সম্ভব উল্লেখ করেছি। যে সব ক্ষেত্রে সূত্রের উল্লেখ করা হয় নি; সে সবও উপরোক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত। এরপরও যদি এমন কারো নাম বাদ পড়েছে বলে জানতে পারি, যাদের বিরুদ্ধে দালালীর সুনির্দিষ্ট অভিযোগ রয়েছে, অবশ্যই এই গ্রন্থের পরবর্তী সংস্করণে তাদের নাম উল্লেখ করা হবে।

২

পুনর্বাসনের সাধারণ পটভূমি

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ মধ্যরাত্রিতে পাকিস্তানী সামরিক বাহিনী বাংলাদেশের সর্বত্র মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকান্ডের সূচনা করে। নিরপরাধ নিরস্ত্র জনগণের উপর বর্বর বাহিনী আধুনিক সমরাস্ত্র নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তাদের সাথে যোগ দেয় বিহারীদের একটি বড় অংশ এবং এদেশে জন্মগ্রহণকারী কিছু বিশ্বাসঘাতক দালাল।

এই হত্যাকান্ডের খবর যাতে বিশ্ববাসী জানতে না পারে, তার জন্য পাক সরকার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়। সে সময় এখানে অবস্থানরত বিদেশী সাংবাদিকদের সামরিক প্রহরাধীনে বিমান বন্দরে নিয়ে দেশ থেকে বের করে দেয়া হয়। যাবার আগে তাঁদের কাছ থেকে প্রায় সমস্ত নোট ও ফিল্ম ছিনিয়ে নেয়া হয়। এরপর থেকে বহির্বিশ্বে সংবাদ প্রেরণ এবং বিদেশী সাংবাদিকদের এদেশে আসার উপর কড়া সেন্সরশীপ আরোপসহ হত্যাযজ্ঞকে বিশ্ববাসীর কাছে গোপন করার জন্য সমস্ত প্রকার প্রচেষ্টা চালানো হয়।

কিন্তু হত্যাযজ্ঞ এতই ব্যাপক ও ভয়াবহ ছিল যে তা চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। যে সমস্ত বিদেশী সাংবাদিক আত্মগোপন করে বা অন্য কোন উপায়ে দেশের ভেতরে থেকে যেতে পেরেছিলেন তাঁরা এই হত্যাযজ্ঞের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন লিখতে থাকেন। এছাড়া সাংবাদিকসহ অন্যান্য যে সমস্ত আন্তর্জাতিক প্রতিনিধিদলকে খুনী চক্র 'প্রদেশের অবস্থা স্বাভাবিক' বলে দেখাবার জন্য নিয়ে এসেছিল, তাঁরাও হত্যাযজ্ঞের ভয়াবহতা চাক্ষুষ দেখে এ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রতিবেদন

লিখেছিলেন। এ সমস্ত প্রতিবেদনের দু একটির অংশবিশেষ উদ্ধৃত করলেই বোঝা যাবে এই হত্যাযজ্ঞ কত ভয়াবহ ছিল। নিউজ উইক পত্রিকায় ২০ জন সাংবাদিক টনি ক্লিফটন লেখেন, 'আমার কোন সন্দেহ নাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের শত শত জায়গায় মাই লাই ও লিডিসের ঘটনা ঘটেছে—এবং আরও ঘটবে বলেই আমার ধারণা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে পদকপ্রাপ্ত জনৈক অফিসার গ্যালাঘার আমাকে বলেছেন,—'আমি ফ্রান্সে যুদ্ধের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা—নরম্যাণ্ডির হনন কেন্দ্র দেখেছি—কিন্তু এগুলোর কাছে সে কিছুই নয়। কান্না চেপে আত্মসম্বরণ করতে আমাকে অনেক বেগ পেতে হয়েছিল।'১

আই পি, এম কারগিলের নেতৃত্বাধীন বিশ্বব্যাংক প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হেনডিক ভ্যানডার হেজিডেন হত্যাকান্ডের স্বরূপ প্রকাশের জন্য কুষ্টিয়া শহরের বর্ণনা দিয়ে তাঁর অনানুষ্ঠানিক রিপোর্টে লেখেন, 'শহরটিকে দেখাচ্ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর বোমার আঘাতে বিধ্বস্ত জার্মান শহরগুলোর মত। শহরের শতকরা ৯০ ভাগ বাড়ি, দোকান, ব্যাংক পুরোপুরি ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে। আমরা যখন ঘুরছিলাম সবাই তখন পালাচ্ছিল। অবস্থাটা ছিল পারমাণবিক হামলার পর দিনের সকালের মত।'২

এই ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের বিবরণ জানতে পেরে সারাবিশ্বের সচেতন মানুষ প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। বিশ্বের বিভিন্ন নেতা গণহত্যার নিন্দা করে বক্তব্য রাখেন। এই প্রতিবাদের প্রকৃতি অনুধাবন করা যাবে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব উ থান্টের বক্তব্য থেকে। তিনি এই হত্যাকান্ডকে 'ইতিহাসের অন্যতম করুণ ঘটনা এবং মানব ইতিহাসের অতি কলংকজনক অধ্যায়' বলে আখ্যায়িত করেন।৩

১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১। ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞে ক্ষরিত এক সমুদ্র রক্তে স্নাত হয়ে জন্ম হল স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের। মুক্তির আনন্দে উদ্বেল হল জনতা।

কিন্তু এই আনন্দ ম্লান হয়ে যায় বিজয়লাভের মুহূর্ত থেকেই। ১৬ ডিসেম্বর থেকে এক সপ্তাহের মধ্যেই সারাদেশে অন্যূন পাঁচ হাজার বধ্যভূমি ও গণকবর আবিষ্কৃত হয়। পরবর্তী দু'মাস ধরে চলতে থাকে গণকবর আবিষ্কারের এই ধারা। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে দেশের প্রত্যেক ইউনিয়নে গড়ে অন্ততঃ একটি গণকবর আবিষ্কৃত হয়।

১. 'বাংলাদেশে গণহত্যা।' দৈনিক বাংলা, ১৬ জানুয়ারী '৭২

২. প্রাগুক্ত

৩. প্রাগুক্ত

সারাদেশে আবিষ্কৃত বধ্যভূমিতে অসংখ্য বিকৃত লাশের সংবাদ পেয়ে সমস্ত বিশ্ব স্তম্ভিত হয়ে পড়ে। সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে এই অপরাধের প্রতিবাদ জানিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসতে থাকে শোকবার্তা। জাতিসংঘে গণহত্যার নিন্দা করে প্রস্তাব গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হয়। কায়রোতে আফ্রো-এশীয় গণসংস্থার সম্মেলনে বাংলাদেশে সুপরিকল্পিত ভাবে নৃশংস হত্যাকান্ড সংঘটিত করায় নিন্দা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। মাদার তেরেসার নেতৃত্বাধীন 'ক্রিসটাস' সংস্থা থেকে বাংলাদেশে গণহত্যা ও নারী নির্যাতনের নিন্দা করে নির্যাতিতাদের সহায়তার জন্য মাদার তেরেসাকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে মানবতাবাদী নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশে আসেন। বিভিন্ন বধ্যভূমিতে অকল্পনীয় নির্যাতনের চিহ্নসহ অজস্র বিকৃত মৃতদেহ এবং হাড় কংকালের স্তুপ চাক্ষুষ দেখে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে যান। আন্তর্জাতিক রেডক্রস, বিশ্ব শান্তি কমিশন, অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল প্রভৃতি মানবাধিকার সংস্থার প্রতিনিধিদল এসেছিলেন মূলতঃ যুদ্ধবন্দী এবং তাদের দেশীয় দোসরদের বিচারের সময় তারা যাতে জেনেভা কনভেনশনের সুবিধা পায়, বাংলাদেশ সরকারকে সে বিষয়ে প্রভাবান্বিত করবার জন্য। কিন্তু দেশ জুড়ে অসংখ্য বধ্যভূমিতে হত্যাকান্ডের ভয়াবহতা দেখে তাঁরা নিজেরাই এদের বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন।

বিশ্ব শান্তি পরিষদ প্রতিনিধি দলের নেত্রী মাদাম ইসাবেলা ব্লুম ২০/১/৭২ তারিখে সাংবাদিকদের বলেন, 'শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমিতে বাঙ্গালী হত্যাযজ্ঞের যে লোমহর্ষক নৃশংসতার স্বাক্ষর আমি দেখেছি তাতে আমি শোকাভিভূত ও সন্ত্রস্ত হয়ে গেছি। এই হত্যাকান্ড নাৎসী গ্যাস চেম্বারের হত্যাযজ্ঞের চেয়ে অনেক বেশী বিভৎস।' তিনি দেশে ফিরে গিয়ে পরিষদের সভাপতির কাছে এই গণহত্যার জন্য আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের দাবী জানাবেন বলে জানান। (আজাদ, ২২/১/৭২)

বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি সমন্বয়ে গঠিত দলটির অপর একজন সদস্য বলেন, 'আমি যা দেখে এসেছি তা আমি বিশ্বাস করতে চাই না। আমাকে আজীবন এই স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা করতে হবে।'

স্বাধীনতাযুদ্ধের সমর্থক মার্কিন সিনেটের ডেমোক্র্যাট দলীয় সদস্য এ্যাডলাই স্টিভেনসন কুমিল্লা ও চট্টগ্রামের বধ্যভূমিগুলো দেখে এসে ৩০ জানুয়ারী বলেন, 'বাংলাদেশে পাকবাহিনীর নৃশংসতা ছিল ভয়াবহ এবং মানবজাতির ইতিহাসে তার কোন নজীর নেই। এই বর্বরতা মানুষের কল্পনাকেও ছাড়িয়ে গেছে।' (আজাদ, ৩১/১/৭২)

মার্কিন সিনেটের অপর সদস্য এডওয়ার্ড কেনেডি বলেন, 'মানুষের মস্তিষ্কে এ'ধরনের বর্বরতার চিন্তা আসতে পারে এ'কথা ভাবতেও কষ্ট হয়।' (আজাদ, ১৭/২/৭২)

ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে মালরো বলেন, 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীদের নৃশংসতার নিদর্শন আমি দেখেছি, কিন্তু এখানকার নৃশংসতা তার চেয়ে অনেক বেশী।' (আজাদ ১৩/৩/৭২)

সারাদেশে ভয়াবহ হত্যাযজ্ঞের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে যথাযথ বিচারের মাধ্যমে হত্যাকারীদের দৃষ্টান্তমুলক শাস্তি প্রদানের জন্য দাবী ওঠে।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের খবর বিশ্ববাসীকে জানানোর জন্য এবং এর সাথে জড়িত পাক সামরিক অফিসার ও তাদের এদেশীয় দালালদের বিচার করবার জন্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় নাৎসীদের বিচারের উদ্দেশ্যে বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জ্যাঁ পল সার্ত, আঁদ্রে মালরো প্রমুখ বিশ্বখ্যাত ব্যক্তিত্বের সমন্বয়ে যে ধরনের আন্তর্জাতিক কমিশন গঠিত হয়েছিল, সে ধরনের কমিশন গঠনের মাধ্যমে প্রকাশ্যে বিচারের দাবী করা হয়। বিশ্বের অন্যান্য স্থান থেকেও আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠনের জন্য দাবী জানানো হয়।

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য সদস্য এই হত্যাযজ্ঞকে নজীরবিহীন বর্বরতা বলে উল্লেখ করে এর বিচারের ব্যবস্থা করার আশ্বাস দেন। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী ব্যক্তিরা জেনেভা কনভেনশনের সুবিধা পাওয়ার অধিকার হারিয়েছে বলেও তাঁরা মত প্রকাশ করেন।

কিন্তু এর ভেতর চলছিল ভিন্ন আর এক খেলা। স্বাধীনতাবিরোধী কুখ্যাত খুনী দালালদের জনরোষ থেকে বাঁচানোর জন্য আওয়ামী লীগ সরকার ১৬ ডিসেম্বর থেকেই প্রচেষ্টা চালানো শুরু করে। ১৬ ডিসেম্বর বিকেল থেকে কুখ্যাত খুনী এবং দালালালদের জন্য একমাত্র নিরাপদ আশ্রয়স্থল হয়ে দাঁড়ায় জেলখানা। কুখ্যাত দালালদের কাছ থেকে সে সময় আওয়ামী লীগ সরকারের কাছে ১১ হাজার লিখিত আবেদনপত্র পড়েছিল, তাদেরকে জেলখানায় সরিয়ে নেয়ার জন্য। এদের বিচারের ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ সরকার কালক্ষেপন নীতি গ্রহণ করে।

১ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে মন্ত্রী পরিষদের এক বৈঠকে গণহত্যা তদন্ত কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। হাইকোর্টের কর্মরত বা অবসরপ্রাপ্ত কোন বিচারপতি বা সমপর্যায়ের কোন মনোনীত ব্যক্তির নেতৃত্বে কমিশন পাকবাহিনী ও

তাদের দালালদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের মৌখিক ও লিখিত সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে ব্যাপক রিপোর্ট পেশ করবেন বলে ঘোষণা করা হয়।

'দালালদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে—'
শেখ মুজিবের প্রতিজ্ঞা

১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। ওই দিন রমনা রেসকোর্স ময়দানে ক্রন্দনরত অবস্থায় শেখ মুজিব বলেন, 'বিশ্বকে মানবেতিহাসের এই জঘন্যতম হত্যাকাণ্ডের তদন্ত অবশ্যই করতে হবে। একটি নিরপেক্ষ আন্তর্জাতিক দল এই বর্বরতায় তদন্ত করুক এই আমার কামনা।' (দৈনিক বাংলা, ১১/১/৭২)

এর পর থেকে তিনি বিভিন্ন সভায়, সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে কিংবা দেশী-বিদেশী অন্যান্য প্রচার মাধ্যমে সাক্ষাৎকারে গণহত্যার নিন্দা করে বাংলার মাটিতে দালালদের অবশ্যই বিচার করা করা হবে বলে বক্তব্য রাখেন।

১০ জানুয়ারীর জনসভাতেই তিনি বলেন 'যারা দালালী করেছে আমার শত শত দেশবাসীকে হত্যা করেছে, মা বোনকে বেইজ্জতী করেছে, তাদের কি করে ক্ষমা করা যায়? তাদের কোন অবস্থাতেই ক্ষমা করা হবে না, বিচার করে তাদের অবশ্যই শাস্তি দেয়া হবে।' এ জন্য দায়িত্ব সরকারের হাতে ছেড়ে দেবার আবেদন জানিয়ে তিনি বলেন, 'আমরা দেখিয়ে দিতে চাই শান্তিপ্রিয় বাঙালীরা স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিতে জানে, তেমনি শান্তি বজায় রাখতেও জানে।' (প্রাগুক্ত)

১২ জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর শেখ মুজিব গনহত্যাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেয়া যাবে না বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করে বলেন, লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী আমি শুনছি, তবু বাংলার মানুষ এত নীচে নামবে না, বরং যা মানবিক তাই করবে, তবে অপরাধীদের আইনানুযায়ী অবশ্যই বিচার হবে।' (দৈ, বা, ১৩/১/৭২)

১৪ জানুয়ারী আওয়ামী লীগ অফিসে তিনি আওয়ামী লীগ কর্মীদের প্রতিশোধ গ্রহণের পথ পরিহার করার জন্য বিশেষভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'দালালদেরকে অবশ্যই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে।' (পূর্বদেশ, ১৫/১/৭২)

৬ ফেব্রুয়ারী কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে দশ লক্ষ লোকের বৃহত্তম জন সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, 'যারা গণহত্যা চালিয়েছে তারা সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ করেছে, এদের ক্ষমা করলে ইতিহাস

আমাকে ক্ষমা করবে না।' (দৈনিক বাংলা ৭/২/৭২)

ঢাকায় ২১ ফেব্রুয়ারীর জনসভায় তিনি বলেন 'বাংলার মাটিতেই খুনীদের বিচার হবে।' (দৈনিক বাংলা ২৩/২/৭২)

৩০ মার্চ চট্টগ্রামের জনসভায় গণহত্যাকারীদের 'নমরূদ' বলে আখ্যায়িত করে তিনি প্রশ্ন করেন দালালদের ক্ষমা করা হবে কিনা, সমবেত জনতা হাত তুলে বলে 'না,' 'না' (পূর্বদেশ, ৩১/১/৭২)

৩১ মার্চ খুলনার জনসভায় শেখ মুজিব বলেন, 'বর্বর হানাদার বাহিনীর সাথে স্থানীয় সহযোগী রাজাকার, আল বদর, জামাত প্রভৃতি যোগ দেয়। তারা জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। যদি কেউ দালালদের জন্য সুপারিশ করতে আসে তবে তাকেই দালাল সাব্যস্ত করা হবে, দালালদের কখনোই ক্ষমা করে দেয়া হবে না।' (পূর্বদেশ ১/৪/৭২)

২৬ এপ্রিল তিনি দিল্লী স্টেটসম্যান পত্রিকার সাংবাদিক কুলদীপ নায়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, 'যারা গণহত্যা করেছে তাদের এর পরিণতি থেকে রেহাই দেয়া যায় না। এরা আমার ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে। এদের ক্ষমা করলে ভবিষ্যৎ বংশধরগণ এবং বিশ্ব সমাজ আমাদের ক্ষমা করবেন না।' (দৈনিক বাংলা, ৩০/৪/৭২)

৬ মে আমেরিকান ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের (এবিসি) সাথে এক টেলিভিশন সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিব যুদ্ধাপরাধীদের প্রসঙ্গে বলেন, 'আমি অবশ্যই তাদের বিচার করব, এ ব্যাপারে বিতর্কের কোন অবকাশ নেই। যেখানে তারা ত্রিশ লাখ লোককে হত্যা করেছে সেখানে কোন দেশ কি তাদের ছেড়ে দিতে পারে?' এই সাক্ষাৎকারেই দালালদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'দালালদের কেসগুলো একটি তদন্ত কমিশন কর্তৃক বিবেচিত হবে। আমরা তদন্ত করছি এবং নির্দোষ লোকদের ছেড়ে দিচ্ছি, অবশ্য যারা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নিশ্চিতভাবেই তাদেরকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।' (আজাদ, ১৫/৫/৭২)

'বাংলাদেশ দালাল অধ্যাদেশ ১৯৭২' : ঘাতকদের রক্ষাকবচ

শেখ মুজিব ও তাঁর সরকারের অন্যান্য সদস্যদের এ ধরনের বক্তৃতা বিবৃতির পাশাপাশি চলতে থাকে দালালদের সুরক্ষার আয়োজন। বিভিন্ন মহল থেকে দালালদের বিচারের জন্য সংক্ষিপ্ত আদালতের দাবীকে উপেক্ষা করে ২৪ জানুয়ারী জারী করা হয় 'বাংলাদেশ দালাল (বিশেষ ট্রাইব্যুনাল) অধ্যাদেশ ১৯৭২'। দালালদের বিচারের জন্য এই আইনের দুবছরের জেল থেকে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির বিধান রাখা হয়। এই আদেশ অনুযায়ী

আসামীর ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করবার অধিকার থাকলেও ফরিয়াদীকে ট্রাইব্যুনালের বিচার্য অপরাধের জন্য অন্য কোন আদালতের বিচার প্রার্থনার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়।

গণহত্যাকারী ও দালাল নেতাদের সুকৌশলে রক্ষার জন্যই প্রণীত হয়েছিল এই আইন। কারণ আইনের ৭ ধারায় বলা হয়েছিল থানার ভারপ্রাপ্ত ওসি যদি কোন অপরাধকে অপরাধ না বলেন তবে অন্য কারও কথা বিশ্বাস করা হবে না, অন্য কারও অভিযোগের ভিত্তিতে বিচার হবে না ট্রাইব্যুনালে। অন্য কোন আদালতেও মামলা দায়ের করা যাবে না। দালালদের আত্মীয়-স্বজনের ওসিকে তুষ্ট করার মত আর্থিক স্বচ্ছলতা ছিল, স্বজন হারানো নির্যাতিত দরিদ্র জনসাধারণের তা ছিল না।

২৮ মার্চ দালাল আইনে বিচারের জন্য সারাদেশের সমস্ত জেলায় মোট ৭৩টি বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। দালাল আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী এই সমস্ত ট্রাইব্যুনালে যেসব অপরাধের বিচার করা হবে তা অন্য যে কোন আদালতের এখতিয়ার বহির্ভূত বলে ঘোষণা করা হয়। এপ্রিল মাস থেকে দালাল আইনের বিচার কাজ শুরু হয়।

দালাল আইন কুখ্যাত খুনী দালালদের জন্য রক্ষাকবচ হিসেবে দেখা দেয়। যে শান্তি কমিটির মূল কাজ ছিল নিরপরাধ বাঙ্গালীদের হত্যা তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের হত্যার জন্য পাকসেনাকে সহায়তা করা তার সদস্যরা সর্বোচ্চ সাত বছরের কারাদণ্ড পেয়ে নিস্তার পেয়ে যায়। শান্তি কমিটির নিজস্ব ঘোষণা অনুযায়ীই এর মূল কাজ ছিল তাদের ভাষায় 'দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় চরদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করে সেনাবাহিনীর সহায়তায় তাদেরকে নির্মূল করা', সুতরাং যে কোন দালালের সর্বোচ্চ শাস্তি পাওয়ার জন্য তার শান্তি কমিটির সদস্য প্রমাণিত হওয়াই ছিল যথেষ্ট।

৩০ নভেম্বর ১৯৭৩ তারিখে তথাকথিত সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আগে ৩১ অক্টোবর ১৯৭৩ পর্যন্ত দালাল অধ্যাদেশে অভিযুক্ত মোট ৩৭ হাজার ৪ শত ৭১ জনের মধ্যে ২ হাজার ৮ শত ৪৮ জনের মামলার নিষ্পত্তি হয়েছিল। এর মধ্যে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল ৭ শত ৫২ জন, বাকী ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। এর মধ্যে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় মাত্র একজন রাজাকারকে। সুতরাং সহজেই প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে কি গণহত্যাযজ্ঞের সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে দালালরা কোন মানুষকে হত্যা করে নি, নির্যাতিত লক্ষ কোটি মানুষের জবানবন্দী কি সবই মনগড়া গল্প ছিল? নারকীয় বধ্যভূমিগুলিতে

প্রাপ্ত বহুবিধ নৃশংস নির্যাতনের চিত্রসহ বিকৃত লাশগুলির সবই কি ছিল শুধু পাক সেনার শিকার ?

দালাল আইনের অধীনে ট্রাইব্যুনালের বিচারও ছিল প্রহসন মাত্র। একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে দেয়া যেতে পারে। সাংবাদিক সাহিত্যক শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণকারী আল বদরের বিরুদ্ধে হত্যার উদ্দেশ্যে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণের অভিযোগ সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, কিন্তু তবু তাকে মাত্র ৭ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া হয়। গণহত্যার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটি, রাজাকার, আল বদর ইত্যাদি দলে যোগদানকারী ব্যক্তিদের এইভাবে লঘু শাস্তি দিয়ে কিছু দিনের জন্য কারাগারে রেখে বিক্ষুব্ধ জনতা এবং তাদের হাতে নির্যাতিতদের রোষানল থেকে রক্ষার ব্যবস্থা করা হয়।

দালাল রক্ষার এই ষড়যন্ত্র কুখ্যাত দালালদের তথাকথিত বিচার হওয়ার পূর্বে জনসাধারণের কাছে ধরা পড়ে নি। তবে সচেতন বুদ্ধিজীবী শ্রেণী প্রথম থেকেই এই চক্রান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে আসছিলেন। এরপর যখন দেখা গেল সরাসরি গণহত্যায় নেতৃত্বদানকারী দালালরা নামমাত্র শাস্তি পেয়ে নিষ্কৃতি পাচ্ছে তখন এ ব্যাপারে সচেতনতা আরো বৃদ্ধি পায়।

২৩ জুলাই ১৯৭২ তারিখের দৈনিক বাংলায় এ বিষয়ে 'দালাল আইন সংশোধনের প্রয়োজন' শীর্ষক একটি রিপোর্টে লেখা হয়—'দেশ স্বাধীন হবার পর দালাল বলে যাদের আটক করা হয়েছে তাদের শতকরা ৭৫ জনেরই মুক্তি পাবার সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ এই বিপুল সংখ্যক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন সুনির্দিষ্ট অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না।

'পুলিশের সংখ্যা এমনিতেই অপ্রতুল। তদুপরি কোলাবরেটরস অ্যাক্ট এ অভিযোগ তদন্তের ভার দেওয়া হয়েছে শুধু থানার ওসিকে। কিন্তু ওসির পক্ষে একা অসংখ্য মামলার তদন্ত করা এক প্রকার অসম্ভব।...

'এছাড়া দালাল আইন সম্পর্কেও কিছু বক্তব্য রয়েছে আইন বিশেষজ্ঞদের। তাঁরা বলেছেন, দালাল আইন করা হয়েছে একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচার করার জন্য। কাজেই সে অপরাধ প্রমাণের জন্যে থাকতে হবে সাক্ষ্য প্রমাণের বিশেষ ধরন। কিন্তু বর্তমান আইনের সাক্ষ্য প্রমাণের জন্য অনুসরণ করতে হয় একশ বছরের পুরনো 'ইভিডেন্স অ্যাক্ট'। এই অ্যাক্ট হয়েছে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে সংঘটিত অপরাধের বিচারের জন্য। কাজেই বিশেষ পরিস্থিতির অপরাধের প্রমাণের জন্য প্রণীত ইভিডেন্স অ্যাক্ট অনুসরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে নানা জটিলতা। ফলে অপরাধ প্রমাণ করা হয়ে উঠেছে অনেক ক্ষেত্রে দুঃসাধ্য।...

'একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোঝা যাবে পরিষ্কার ভাবে। ধরা যাক একজন রাজাকার অপহরণ করেছে কোন এক ব্যক্তিকে, তার পর থেকে সে ব্যক্তির আর কোন সন্ধান মেলেনি। এই অবস্থায় তাঁকে হত্যা করা হয়েছে এই সিদ্ধান্ত করা যায় স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু যদি সেই রাজাকারটির বিরুদ্ধে মামলা চলে দালাল আইনে, তবে তার বিরুদ্ধে আনা যাবে না হত্যার অভিযোগ। অভিযোগ আনা হবে হত্যার জন্য অপহরণ করা হয়েছে। কারণ ইভিডেন্স অ্যাক্টে হত্যার চাক্ষুষ সাক্ষ্য প্রমাণ না এনে খুনের অভিযোগ প্রমাণ করা যায় না সুতরাং এক্ষেত্রে যদিও লোকটি খুন হয়েছেন তবুও আইনের মার প্যাঁচে আসামীকে খুনী প্রমাণ করা যাবে না।'

বিভিন্ন মহলের প্রতিবাদের মুখে আওয়ামী লীগ সরকার বাধ্য হয় এ বিষয়টি বিবেচনা করার জন্য। ৪ আগষ্ট ১৯৭২ তারিখে মন্ত্রী সভা সাব কমিটির এক বৈঠকে অপরাধীদের সর্বোচ্চ শাস্তি দানের বিধান রাখার জন্য দালাল আইন সংশোধনের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। তবে বৈঠকে কোন সিদ্ধান্ত নেয়া হয় নি।

এই কালক্ষেপনের খেলা চলতে থাকে। ১৯৭৩ সালের ১৩ই জুলাই তৎকালীন আইন মন্ত্রী মনোরঞ্জন ধর গণহত্যাকারীদের সহায়তাকারীদের বিচারের জন্য রাষ্ট্রকে ক্ষমতা দেবার উদ্দেশ্যে আনীত সংবিধানের প্রথম সংশোধনী বিল সংসদে উথাপন করেন। বিলটিতে বাংলাদেশ সংবিধানের ৪৭ অনুচ্ছেদ সংশোধনের প্রস্তাব করে গণহত্যাকারীদের দোসরদের বিচার করার জন্য রাষ্ট্রকে নতুন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দেবার কথা বলা হয়।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা : শেখ মুজিবের প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ

১৯৭৩ সালের ৩০ নভেম্বর একটি আকস্মিক সরকারী ঘোষণায় দালাল আইনে সাজাপ্রাপ্ত এবং বিচারাধীন সকল আটক ও সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তির প্রতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করা হয়। ইতিপূর্বেকার সমস্ত প্রতিশ্রুতি, জনসভায় ক্রন্দন, মানব সমাজ ও ইতিহাসের কাছে দায়ী থাকার ভীতি প্রকাশ করে দেয়া বক্তব্য প্রতিজ্ঞা ইত্যাদি বিস্মৃত হয়ে শেখ মুজিবর রহমান ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ নির্দেশ দেন যেন এক সপ্তাহের মধ্যে সমস্ত দালালকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যাতে তারা দেশের তৃতীয় বিজয় দিবস পালনের উৎসবে শরীক হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী এই দালালদের দেশ গড়ার কাজে সামিল হওয়ার জন্যও আহ্বান জানান।

সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার এক সপ্তাহের মধ্যেই মালেক মন্ত্রী সভার সদস্যবর্গ, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি এবং শান্তি ও কল্যাণ পরিষদের নেতৃবৃন্দ, জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পিডিপি, নেজামের ইসলামের নেতৃবৃন্দ এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার চক্রান্তকারী দালালসহ মুল স্বাধীনতা বিরোধীরা জেল থেকে বেরিয়ে আসে।

এভাবেই মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড পরিচালনাকারী উন্মাদদের আবার স্বজন হারানো জনতার মাঝে ছেড়ে দেয়া হয়। এই সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পরও সরকারী গেজেটে আত্মগোপনকারী দালালদের নাম ঠিকানাসহ আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ এবং অন্যথায় সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার হুঁশিয়ারী জানিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে জারী করা সমন প্রকাশিত হতে থাকে, কারণ ইতিমধ্যেই তা মুদ্রিত হয়ে গিয়েছিল।

একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের কেন ক্ষমা করা হল এ নিয়ে আওয়ামী লীগ মহল ও বিরোধী মহলের ধারণা সম্পুর্ণ বিপরীতমুখী। আওয়ামী লীগের আবেগাক্রান্তরা মনে করেন দালালদের ক্ষমা করাটা ছিল 'বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতা', দালালালদের পুনর্বাসনের জন্য তাঁকে কোন ভাবেই দায়ী করা যাবে না। অপেক্ষাকৃত যুক্তিবাদীদের বক্তব্য—পাকিস্তানে আটকে পড়া বাঙ্গালীদের উদ্ধার করার জন্য নাকি দালালদের ক্ষমা করতে তিনি বাধ্য হয়েছিলেন। বিরোধী পক্ষ অবশ্য এ যুক্তি খণ্ডন করে বলেছেন, আটকে পড়া বাঙ্গালীদের মুক্তির জন্য ৯৩ হাজার যুদ্ধবন্দী পাক বাহিনী যথেষ্ট ছিল। বিরোধী পক্ষের কেউ এভাবেও মুল্যায়ন করেছেন — '...আওয়ামী লীগের মধ্যে সামগ্রিকভাবে যদি সাম্প্রদায়িক, ভারত ও সোভিয়েতবিরোধী ও মার্কিনপন্থী শক্তিসমুহের বৃদ্ধি না হতো তাহলে এই ক্ষমা প্রদর্শন আওয়ামী লীগ সরকারের দ্বারা সম্ভব হতো না। এই পরিবর্তন যদি না ঘটতো তাহলে ১৯৭১ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৭২ সালের প্রথমে যাদেরকে বাংলাদেশের "জাতশত্রু" হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিলো, সেই জাতশত্রুদেরকে দেশগড়ার কাজে আহ্বান জানানো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর দ্বারা কিছুতেই সম্ভব হতো না।' (বদরুদ্দীন উমর : যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশ, পৃঃ ১১৯। প্রথম প্রকাশ : ঢাকা, মার্চ ১৯৭৫)

এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই, ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবুর রহমান দালালদের ক্ষমা করার ক্ষেত্রে মহানুভবতা দেখাতে পেরেছেন শ্রেণী স্বার্থ অভিন্ন বলে। '৭১ এর এই নৃশংস ঘাতকদের সঙ্গে এক যুগ পরেও আওয়ামী লীগের সৌহার্দ্যমুলক সম্পর্কের অবনতি যে ঘটে নি গত কয়েক

বছরে তাদের কার্যকলাপই সেটা প্রমাণ করেছে। সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার নামে আওয়ামী লীগ, জামাতে ইসলামের মত ঘাতকদের দলকে শুধু রাজনৈতিক মর্যাদাই প্রদান করে নি, জামাতে নতুন করে শক্তিবৃদ্ধির পথও প্রশস্ত করেছে।

সাধারণ ক্ষমা প্রসংগে শহীদ পরিবারবর্গ

৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ মুক্তিযোদ্ধা ও বুদ্ধিজীবীদের মতো, পিতা, স্ত্রী ও পুত্ররা শেখ মুজিবুর রহমানের সাধারণ ক্ষমা ঘোষণাকে কিভাবে দেখেন ঢাকার একটি সাপ্তাহিকে পরবর্তীকালে এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাধীনতা যুদ্ধে শহীদ তরুণ মুক্তিযোদ্ধা রুমির মা লেখিকা জাহানারা ইমাম বলেছেন, 'গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যায় যাদের ভূমিকা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছিল, স্বাধীনতার পর পরই তাদের ফাঁসি হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সাধারণ ক্ষমার জন্য তা হয়নি। তৎকালীন সরকারের সাধারণ ক্ষমার সিদ্ধান্ত ছিল মারাত্মক একটি ভুল। সেদিন ক্ষমা ঘোষণা না করা হলে ঘাতকরা নিজেদের সমাজে পুনর্বাসিত করার সুযোগ পেত না।...

'প্রখ্যাত সাংবাদিক শহীদ শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার বলেন, বর্তমানে রাজাকার, আল বদরদের যে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধি পেয়েছে তা শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমারই ফল। ওই ক্ষমা ছিল বিচার-বুদ্ধিহীন। সেদিন সরকার যদি ঘাতকদের বিচার করে সাজা দিত, তাহলে আজ এ অবস্থা হত না।

'পান্না কায়সার বলেন আওয়ামী লীগের প্রথম সারির কোন নেতা যুদ্ধে আপনজন হারাননি। ফলে স্বজন হারানোর ব্যথা তাদের জানা ছিল না। ঘাতকদের তারা সহজেই ক্ষমা করে দিতে পেরেছিলেন। তাই আজ খালেকের মত ঘাতকরা বুক ফুলিয়ে সমাজে ঘুরে বেড়াচ্ছে এবং নতুন হত্যার ইন্ধন যোগাচ্ছে। আমার মেয়ে যখন ঘাতক খালেকের বই পড়ে নানা প্রশ্ন করে, আমি উত্তর দিতে পারি না।...

'দেশ স্বাধীন হবার একদিন আগে, ১৫ ডিসেম্বর আলবদর রাজাকাররা এক পরিবারের তিন সহোদর ভাইকে ধরে নিয়ে হত্যা করে। পরদিন ১৬ ডিসেম্বর, যুদ্ধের চূড়ান্ত বিজয়ের দিনে রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে তিন ভাইয়ের লাশ পাওয়া যায়। এই তিন ভাই হচ্ছেন শহীদ বদিউজ্জামান বদি, শহীদ শাহজাহান ও শহীদ করিমুজ্জামান ওরফে মুলুক জাহান।

'তিন শহীদ ভাইয়ের পিতা-মাতা অনেক আগেই মারা গেছেন। এখন শুধু শহীদ বদি'র বিধবা স্ত্রী ও চার ছেলেমেয়ে বেঁচে আছে। অপর দু'ভাই অবিবাহিত ছিলেন। বর্তমানে শহীদ বদি পরিবারের সার্বিক দেখা-শোনা করেন তাদের ফুপাতো ভাই মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হুদা। তিনি ২ নম্বর সেক্টরে মেজর হায়দারের অধীনে যুদ্ধ করেছেন।

'শহীদ বদি পরিবারের মুখপাত্র হয়ে মুক্তিযোদ্ধা শামসুল হুদা আওয়ামী লীগ সরকারের সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলেন, রাষ্ট্র প্রধান যে কাউকে ক্ষমা করে দিতে পারেন। কিন্তু যারা লাখ লাখ স্বাধীনতাকামী লোককে হত্যা করেছিল, তাদের ক্ষমা করে দেয়া অমার্জনীয় অপরাধ ছিল। ছিল একটি চরম ভুল সিদ্ধান্ত। তিনি বলেন, শুধু ক্ষমা নয়, ঐ সরকার শহীদ পরিবারগুলোর প্রতি ন্যূনতম কৃতজ্ঞতাও প্রদর্শন করেনি।

সাধারণ ক্ষমার কারণে ৭১-এর ঘাতকরা আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছে—এ কথা উল্লেখ করে শামসুল হুদা বলেন, এই দেশে যদি সত্যি স্বাধীন হয়ে থাকে, তাহলে এই স্বাধীন দেশে ঘাতকদের রাজনীতি করার অধিকার বন্ধ করে দিতে হবে।

দশম শ্রেণীর ছাত্র শহীদ বদির পুত্র তুরানুজ্জামানের কাছে স্বাধীনতা যুদ্ধ, আল-বদরদের হত্যাকাণ্ড সবই একটি ধোঁয়াটে ব্যাপার। কিছুটা বিভ্রান্তও সে। তবে ১৬ বছরের তুরান এ কথা বলেন যে, আমার পিতার হত্যাকারীদের বিচার না হওয়ায় আমি স্তব্ধ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল অফিসার ও প্রগতিশীল আন্দোলনের অন্যতম সৈনিক শহীদ ডাঃ মর্তুজার স্ত্রী মিসেস মর্তুজা বলেন, যাদের প্রাণ গেছে, তাদের আত্মীয়-স্বজনরাই বুঝতে পেরেছেন, শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমার মর্মান্তিক মর্মটা।

তিনি বলেন, শেখ মুজিব যেমন সাধারণ ক্ষমা করেছিলেন তেমনি তার প্রতিদানও পেয়েছেন জীবন দিয়ে। শেখ মুজিবের এই পরিণতি দুঃখজনক। কিন্তু এটা অমোঘ নিয়মেই ঘটেছে। আজ যারা মুজিবের হত্যার বিচার চাচ্ছেন, তারা কেন বিচার না চেয়ে ক্ষমা করে দিচ্ছেন না।

স্বাধীনতাযুদ্ধের প্রারম্ভে হানাদার বাহিনীর দোসরদের হাতে নিহত, 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী' গানের অমর সুরকার শহীদ আলতাফ মাহমুদের স্ত্রী সারা মাহমুদ বলেন, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা কোনভাবেই উচিত হয়নি। সেদিন সাধারণ ক্ষমা না করা হলে, অন্ততঃ আমার স্বামীকে হত্যা করে কোথায় দাফন করা হয়েছিল তা জানতে পারতাম। কিন্তু সাধারণ ক্ষমার ফলে আমার স্বামীর বধ্য ভূমির ঠিকানা পাইনি।

তিনি বলেন, ঘাতকদের অনেককে আমরা চিনি। সেদিন যদি তাদের ফাঁসি দেয়া হতো তাহলেও কিছুটা শান্তি পেতাম। অন্ততঃ বুঝতাম যে, হত্যাকারীদের বিচার হয়েছে। তবে এখনো তাদের শাস্তি দেয়া যায়। আমি আশা করবো সরকার এটা বিবেচনা করবেন।

মিসেস সারা মাহমুদ ঘাতকদের বর্তমান তৎপরতা সম্পর্কে বলেন, '৭১ সালে পাকিস্তানী সৈন্যদের সঙ্গে মিলে যারা একের পর এক হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে, তারাই আজ সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়ে একইভাবে কাজ করছে। আর এটা ঐ সাধারণ ক্ষমারই ফল।

শহীদ অধ্যাপক মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরীর স্ত্রী মিসেস মনোয়ারা চৌধুরী বলেন, ঘাতকদের সাধারণ ক্ষমা করা হবে তা আমরা ভাবতেই পারিনি। কিন্তু সরকার সাধারণ ক্ষমা করে দিলেন। আমরা ভেবেছিলাম শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকায় এসে ঘাতকদের বিচার করবেন। কিন্তু তিনি তা করলেন না। শেখ মুজিব তো ব্যক্তিগতভাবেও আমাদের চিনতেন। সে চেনা-জানাটুকুও কাজে লাগলো না।

স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে নিহত জ্যোতির্ময় গুহ ঠাকুরতার বিধবা স্ত্রী বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই প্রশ্ন তোলেন যে, ১শ' ৯৫ জন যুদ্ধ অপরাধী পাক সামরিক অফিসারদের কেন বিচার হলো না? শেখ মুজিব তো বহুবার বললেন, যুদ্ধ অপরাধী পাক সামরিক অফিসারদের বিচার করবেন। কিন্তু পারলেন না। আবার তিনি এ দেশীয় ঘাতকদেরও ক্ষমা করে দিলেন। আর এই ক্ষমাটাই সবকিছু এলোমেলো করে দিলো। সেদিন যদি ক্ষমা না করে অন্ততঃ দু'একজন ঘাতকেরও যদি সাজা হতো তাহলে অনেক শহীদ পরিবারই শান্তি পেতেন। তাছাড়া ঘাতকরাও আজ আর মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারতো না।

শহীদ অধ্যাপক সিরাজুল হকের স্ত্রী বেগম সুরাইয়া খানম বলেন, ঘাতকদের আমরা তো ক্ষমা করিনি। ক্ষমা করেছে সরকার। আমরা ন্যায় বিচার প্রত্যাশা করেছিলাম! কিন্তু তা পাইনি। এত বছর পরে বিচার চাইবোই বা কার কাছে?

শহীদ অধ্যাপক মোহাম্মদ সাদেকের স্ত্রী শামসুন্নাহার হতাশায়, ভয়ে কাতর। তিনি গভীর উদ্বেগ নিয়ে শেখ মুজিবের সাধারণ ক্ষমা সম্পর্কে বলেন, যাদের ক্ষমা করা হয়েছে তাদের আমরা ঘৃণার চোখে দেখি। সেই ক্ষমার জোরে আজ সেই সব দালাল রাজাকাররা এখন আমাদের বাড়ি থেকে উৎখাতের চেষ্টা করছে।

তিনি বলেন, সাধারণ ক্ষমা একটা গুরুতর অপরাধ ছিল। সে সব

ঘাতককে আমরা সবাই চিনি এবং জানি। তারা আমাদেরই চারপাশেই আছে। কিন্তু আমাদের করার কিছু নেই।

'এদেশের সংবাদপত্র জগতের উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এবং দৈনিক ইত্তেফাকের 'মঞ্চ নেপথ্য' কলামের লেখক সিরাজ উদ্দীন হোসেনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শাহীন রেজা বলে, শুধু সাধারণ ক্ষমা নয়, এর আগে বিচারের নামে প্রহসন করা হয়েছিল। হত্যার সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিদের সুকৌশলে রেহাই দেয়া হয়। অথচ যাদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ডের কোন প্রমাণ ছিল না তাদেরকে জেলে ঢোকানো হয়। এছাড়াও যারা হত্যার মূল পরিকল্পনা করেছিল তারাও অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় সকল দায়-দায়িত্ব থেকে মুক্ত হয়ে যায়। এ রকম প্রহসনমূলক বিচারে পর আবার আসলো সাধারণ ক্ষমা।

'শাহীন রেজা বলেন, এধরণের হত্যাকাণ্ড পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। এর সাথে একমাত্র তুলনা হয় জার্মান একনায়ক হিটলারের 'কনসেন্ট্রেশন' ক্যাম্পের হত্যাকাণ্ডের। অথচ তৎকালীন সরকার জঘন্য হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিলেন। এটা অত্যন্ত গর্হিত কাজ হয়েছিল। আর এই সিদ্ধান্তের মধ্য দিয়ে তৎকালীন সরকারের অদূরদর্শিতাই প্রমাণিত হয়েছিল।

'তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার হত্যাকারীদের ক্ষমা করে দিয়েছিল বলেই আজ তারা সমাজ ও রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়েছে।

'ইউনিট কমাণ্ডার শহীদ শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহেল বাকীর বৃদ্ধ পিতা শেখ মোহাম্মদ আবদুল্ বাকী বলেন, শহীদদের রক্তের দাগ শুকাতে না শুকাতে আওয়ামী লীগ সরকার '৭১-এর ঘাতকদের ক্ষমা করে দিল। এই ক্ষমা ছিল এক অদ্ভুত খেয়ালীপনা। পৃথিবীতে এমন ঘটনা নজিরবিহীন। খুনীদের ক্ষমা করে দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে তা মেনে নেয়া যায় না। তিনি বলেন, এটা অত্যন্ত সাধারণ বিষয় যে যারা হত্যা করে, তাদের বিচার হওয়া উচিত। কিন্তু তা হয়নি। আর এই না হওয়াটা অমার্জনীয় অপরাধ হয়েছে।' (বিচিত্রা: স্বাধীনতা দিবস'৮৭ বিশেষ সংখ্যা, পৃঃ ২৮-৩৩)

মুক্তিযোদ্ধা রাষ্ট্রপতি জিয়ার অবদান:
ঘাতক ও দালালদের রাজনৈতিক পুনর্বাসন

১৯৭৫ সালের ১৫ আগষ্ট শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হবার পর রুশ-ভারত বিদ্বেষী, মার্কিনপন্থী আওয়ামী লীগ নেতা খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় আসেন। এ'সময় বাংলাদেশের সাংবিধানিক নাম গণপ্রজাতন্ত্রী

বদলিয়ে ইসলামী প্রজাতন্ত্র করার এবং দালালীর কারণে নিষিদ্ধ ঘোষিত দলগুলি পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা চলে, তবে এই সরকার ক্ষণস্থায়ী হওয়ায় তা কার্যকর করে যেতে পারে নি। ১৯৭৫ এর ৭ই নভেম্বর আরেকটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় এসে মোশতাক সরকারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করেন। ১৯৭৬ সালের জানুয়ারী মাসে নতুন সামরিক সরকার একটি বিশেষ অধ্যাদেশ জারী করে দালাল আইন তুলে নেয়।

১৯৭৬ সালের জুন মাসে জিয়াউর রহমান যখন প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক, তখন জারী হয় 'রাজনৈতিক দলবিধি' নামে এক অভিনব অধ্যাদেশ। এতে বলা হয় কোন দল যদি রাজনীতি করতে চায় তাহলে সরকারের দেয়া কতিপয় শর্তপূরণ সাপেক্ষে তারা রাজনীতি করতে পারবে। এই শর্ত পূরণ করে রাজনীতির বৈধ লাইসেন্স সংগ্রহের জন্য দালালরা বিশেষভাবে তৎপর হয়। জামাতে ইসলামীর ঘাতকরা ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ এবং অন্যান্য দালালরা মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম সহ কয়েক ডজন পার্টিতে সংগঠিত হয়। বাংলাদেশে মৃতপ্রায় মৌলবাদী রাজনীতিতে জিয়াউর রহমান নতুন প্রাণ সঞ্চার করেন।

১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি হিসেবে ক্ষমতাসীন হন। রাষ্ট্রপতি হিসেবে তাঁর প্রথম কাজ ছিল সংবিধান থেকে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়া। ফলে '৭১ এ বাঙ্গালী হত্যায় নেতৃত্ব দেয়ার কারণে যে সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেগুলি পুনরুত্থিত হওয়ার সুযোগ পায়। যাদের রক্তে স্বাধীন হয়েছিল এই দেশ, তাদের খুনীরা এ দেশে রাজনীতি করার হারানো অধিকার ফিরে পায়। ইতিপূর্বে '৭৬ সালের প্রথম দিকে একটি বিশেষ মহল থেকে বাংলাদেশকে ইসলামী প্রজাতন্ত্র ঘোষণা এবং পাকিস্তানের সাথে কনফেডারেশন গঠনের জন্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। এই দাবীর সপক্ষে ১৯৭৬ সালের মার্চ মাসে এয়ার ভাইস মার্শাল মোহাম্মদ গোলাম তওয়াব এবং গোপনে সংগঠিত জামাতে ইসলামী এক গণজমায়েত ও বিক্ষোভের আয়োজন করে।[৪]

আওয়ামী লীগ সরকার দালালদের পুনর্বাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখলেও স্বাধীনতাবিরোধী খুনীদের সরকারী উচ্চপদে আসন দেয় নি। জিয়াউর রহমান এসে শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার, আল বদরদের

৪. বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতির পুনরুত্থান, ডঃ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৩ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ৩০ নভেম্বর '৮৪ পৃঃ—২৩

নিয়ে দল গঠন করেন। একজন মুখ্য দালাল শাহ আজিজুর রহমানকে প্রধান মন্ত্রী করা হয়। নিরপরাধ বাঙ্গালীদের বেয়নেট চার্জ করে এবং লাইন ধরে দাঁর করিয়ে গুলি করে হত্যার অভিযোগে অভিযুক্ত আবদুল আলিমের মতো খুনীসহ বহু দালালকে মন্ত্রী সভায় নেয়া হয়।

দালাল পুনর্বাসনের এই ধারা আজও চলছে। আজও মন্ত্রী সভায় স্থান পাচ্ছে অসহায় বাঙ্গালীদের হত্যাকারী খুনী দালালরা।

বিশ্বের ইতিহাসে গণহত্যা পরিচালনাকারী দালালদের এভাবে 'ক্ষমা' করে দিয়ে জনসমাজে বিচরণের জন্য ছেড়ে দেওয়ার অপর কোন নজীর রয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। আমাদের জানা নেই কোন দেশ স্বাধীনতার এক দশক অতিক্রান্ত হওয়ার আগে স্বাধীনতাবিরোধীদের দ্বারা শাসিত হয়েছে। বিশ্ব জুরী পরিষদ আজও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুদ্ধপরাধীদের বিচার করার জন্য খুঁজে বেড়াচ্ছে! নাৎসী যুদ্ধাপরাধীদের আজও তাদের দেশে ভোটদানের ক্ষমতা নেই। অনেক নাৎসী যুদ্ধাপরাধীর কঙ্কাল কিনা নিশ্চিত হওয়ার জন্য। বেঁচে থাকলে তাদের নিশ্চয়ই বিচার হত। গণহত্যাকারীদের বিচারের জন্য তাদের এই আগ্রহ ও সতর্কতা কোন বিদ্বেষ প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য নয়; বরং সমগ্র মানবসমাজের বিরুদ্ধে পরিচালিত অপরাধের সুবিচার এবং এধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি রোধের জন্যই এই ব্যবস্থা।

৩

পুনর্বাসিত শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে শুরু করে ১৬ ডিসেম্বর আত্মসমর্পনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পাক সামরিক বাহিনী এদেশে বিশ্বের নৃশংসতম গণহত্যাযজ্ঞ এতটা ভয়াবহভাবে চালাতে পারত না, যদি না তারা এদেশীয় কতিপয় দালাল ও বিশ্বাসঘাতককে দোসর হিসেবে পেতো। এই বেঈমানরা আগে থেকেই এদেশে ছিল।

পাকবাহিনী তাদের এই গণহত্যাযজ্ঞে সক্রিয় সহায়তার জন্য স্বাভাবিকভাবেই এদেশীয় জনবিচ্ছিন্ন, উগ্রপন্থী ধর্মব্যবসায়ী রাজনৈতিক দলগুলিকে দোসর করে নেয়। ২৫ মার্চের কালরাতের আগেই এসমস্ত রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ পাক সামরিক জান্তার সাথে গোপনে যোগাযোগ স্থাপন করে। ২৫ মার্চের পর রাজধানী ঢাকায় স্বাধীনতাকামী জনগণের প্রকাশ্য আন্দোলন স্তব্ধ হয়ে গেলে এই দালালারা প্রকাশ্যে মাঠে নেমে পড়ে।

৪ এপ্রিল ১৯৭১ তারিখে, সামরিক বাহিনীর 'অপারেশন সার্চলাইট' সমাধা হবার পর, 'খ' অঞ্চলের আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রসাসক 'বেলুচিস্তানের কসাই' লেঃ জেঃ টিক্কা খানের সাথে পি ডি পি প্রধান নুরুল আমিনের নেতৃত্বে ১২ জন বিশিষ্ট দক্ষিণপন্থী মৌলবাদী নেতা সাক্ষাৎ করেন। এ প্রতিনিধি দলে অন্যান্যের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আজম, মৌলভী ফরিদ আহমদ, খাজা খায়েরুদ্দীন, এ কিউ, এম, শফিকুল ইসলাম, মাওলানা নুরুজ্জামান প্রমুখ। প্রতিনিধিদল টিক্কা খানকে অবিলম্বে সমগ্র প্রদেশে সম্পুর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে

সামরিক আইন প্রশাসনকে সম্পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস এবং জনগণের মন থেকে ভিত্তিহীন ভয় দূর করার উদ্দেশ্যে ঢাকায় নাগরিক কমিটি গঠনের প্রস্তাব দেয়। (পূর্বদেশ, ৫/৪/৭১)

শান্তি কমিটি গঠন

টিক্কা খান এই প্রতিনিধিদলের সহযোগিতার প্রস্তাবকে ধন্যবাদ জানিয়ে 'দুষ্কৃতকারী ও সমাজবিরোধীদের আশ্রয় না দেওয়া এবং সামরিক আইন কর্তৃপক্ষের কাছে এদের সম্পর্কে সংবাদ পৌঁছে দেওয়ার জন্য' উপদেশ দেন। সাক্ষাৎকারে টিক্কা খান তাদেরকে 'শুধু বক্তৃতা বিবৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে দেশের অখণ্ডতা রক্ষায় ফলপ্রসূ কাজ করতে নির্দেশ দেন।' বৈঠক শেষে নেতৃবৃন্দ রেডিওতে ভাষণ দিয়ে সামরিক কর্তৃপক্ষকে সহায়তার প্রতিজ্ঞা করেন। (প্রাগুক্ত)

এই সময়ে শান্তি কমিটি গঠনের ক্ষেত্রে একটি অসুবিধা উপস্থিত হয়। টিক্কা খান চেয়েছিলেন প্রদেশের পরস্পরবিরোধ। উগ্র ডানপন্থী দলগুলো একই প্লাটফর্মে থেকে সামরিক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞে সহায়তা করবে। কিন্তু সর্বাধিক সংগঠিত এবং চরমপন্থী জামাতে ইসলামী দলের সাথে অন্যান্য মুখ্য দল মুসলিম লীগ (কাউন্সিল, কাইয়ুমপন্থী ও কনফেনশন—সকল গ্রুপ), পি ডি পি, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের নেতৃত্বের কোন্দল দেখা দেয়। বিশেষতঃ উচ্চশিক্ষিত ও অতি উচ্চাভিলাষী মৌলভী ফরিদ আহমদ ও নুরুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন একটি দল জামাতের নেতৃত্বে কাজ করতে অস্বীকৃতি জানায়। এর ফলে ৬ এপ্রিল তারিখেই গোলাম আজম পুনরায় একটি প্রতিনিধিদল নিয়ে টিক্কা খানের সাথে দেখা করেন।

এই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হামিদুল হক চৌধুরী। পরস্পরবিরোধী দলগুলোর মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টির জন্য একজন মুরুব্বী স্থানীয় নিরপেক্ষ ব্যক্তির প্রয়োজন ছিল, হামিদুল হক চৌধুরী সেই দায়িত্ব পালনে এগিয়ে আসেন।

হামিদুল হক চৌধুরীর মধ্যস্থতায় সাময়িকভাবে দালালদের অন্তর্কলহের অবসান হয় এবং সম্মিলিতভাবে নাগরিক শান্তি কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ৯ এপ্রিল টিক্কা খান ঢাকা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি বি. এ. সিদ্দিকীর কাছে প্রাদেশিক গভর্ণর হিসেবে শপথ গ্রহণের অব্যবহিত পরই ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট ঢাকা নাগরিক শান্তি কমিটি আত্মপ্রকাশ করে। সংবাদপত্রে শান্তি কমিটি গঠনের খবর প্রকাশিত হয় ৭১-এর ১০ এপ্রিলের পরিবর্তে ১১ এপ্রিল। খাজা খয়ের উদ্দিনকে

আহ্বায়ক করে গঠিত ১৪০ সদস্য বিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে শহরের সব শান্তি কমিটিগুলো কাজ করবে বলে ঘোষণা দেওয়া হয়, কমিটিকে আরও সদস্য কো-অপ্ট করার ক্ষমতা দেওয়া হয়। কমিটি প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৪ এপ্রিল বায়তুল মোকাররম থেকে চকবাজার মসজিদ পর্যন্ত একটি মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

শান্তি কমিটি গঠিত হবার পর পরই এতে নেতৃত্বের কোন্দল উপস্থিত হয়, যার ফলে পরদিন ১০ এপ্রিল তারিখেই বিরোধী অংশটি মৌলভী ফরিদ আহমদকে সভাপতি করে, নয় সদস্যের একটি স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করে মূল শান্তি কমিটি থেকে বেরিয়ে যায়। প্রাক্তন প্রাদেশিক পি পি পি প্রধান নুরুজ্জামানকে এই স্টিয়ারিং কমিটির সাধারণ সম্পাদক মনোনীত করা হয়। নুরুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কমিটির ১০ এপ্রিলের সভায় যাঁরা কার্যকরী কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন তাঁরা হচ্ছেন কোরবান আলী বার-এট ল, ওয়াজিউল্লাহ, আজিজুর রহমান, মোস্তাফিজুর রহমান, কাজী ফিরোজ সিদ্দিকী, এ কে নুরুল করিম এবং নব নির্বাচিত এম, পি, এ মাহমুদ আলী সরকার।

স্টিয়ারিং কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'এই কমিটি পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিল গঠন করে প্রতিটি জেলায় এর শাখা প্রতিষ্ঠা করবে। সংশ্লিষ্ট এলাকার শান্তি রক্ষা, জনগণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনা, ভারতীয় বেতারের মিথ্যা প্রচারণার স্বরূপ উন্মোচন করা এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের কার্যকরীভাবে মোকাবিলা করতে জনগণকে প্রস্তুত করতে এই কাউন্সিল কাজ করবে।' (পূর্বদেশ, ১১/৪/৭১)

শান্তি কমিটির তৎপরতা

মূল শান্তি কমিটির উদ্যোগে ১৪ এপ্রিলের পরিবর্তে ১৩ এপ্রিল জোহরের নামাজের পর বায়তুল মোকাররম থেকে একটি মিছিলের আয়োজন করা হয়। এই মিছিল পুরনো ঢাকার প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে চকবাজার মসজিদের সামনে দিয়ে অগ্রসর হয়ে নিউ মার্কেটের মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন শান্তি কমিটির আহ্বায়ক খাজা খয়েরুদ্দীন, গোলাম আজম, শফিকুল ইসলাম, পীর মোহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া), সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া), মাহমুদ আলী, আবদুল জব্বার খদ্দর, এ, টি সাদী প্রমুখ।

শহরের বিভিন্ন অংশ থেকে বিহারী ও দালালরা ব্যাণ্ড পার্টি, পাকিস্তানের পতাকা, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি হাতে নিয়ে বায়তুল মোকার

রমে এসে জড়ো হয়। একটি মিছিলের সামনে একজন ঘোড়ার পিঠে করে পাকিস্তানের পতাকা বয়ে নিয়ে আসে। তুমুল বর্ষণের মধ্যে মিছিলকারীরা মিছিলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নানা রকম শ্লোগান দেয় 'ভারতের দালালী চলবেনা, ওয়াতানকে গাদ্দারোসে হুঁশিয়ার, আমরিকি সমরাজোসে হুঁশিয়ার, সংগ্রাম না শান্তি—শান্তি, পাকিস্তানের উৎস কি—লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, পাকিস্তানী ফৌজ জিন্দাবাদ, কায়েদে আজম জিন্দাবাদ, ইন্দিরা গান্ধী—মুর্দাবাদ, ইয়াহিয়া খান জিন্দাবাদ, টিক্কা খান জিন্দাবাদ, আল্লাহতায়ালা—মেহেরবান ধ্বংস কর হিন্দুস্তান' ইত্যাদি ছিল মিছিলের শ্লোগান।

মিছিলে বংলা উর্দ্দু ও ইংরেজীতে লেখা অসংখ্য ফেস্টুনও ছিল। "পাক চীন—জিন্দাবাদ, দুষ্কৃতিকারীরা দূর হও, মুসলিম জাহান এক হও, ভারতকে—খতম কর, ভারতকে ধ্বংস কর, পাকিস্তানকে রক্ষা কর' ইত্যাদি ছিল ফেস্টুনের ভাষা। মিছিলকারীরা ব্যানার, ফেস্টুন ছাড়াও বহন করে ইয়াহিয়া খান, আইয়ুব খান, আল্লামা ইকবাল, লিয়াকত আলী খান, ফাতেমা জিন্নাহ, সর্দার আবদুর রব নিশতার, মির্জা গালিব, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রমুখের ছবি।

মিছিল শেষে খাজা খয়েরুদ্দীনের বক্তৃতার পর মোনাজাত পরিচালনা করেন গোলাম আজম। তিনি 'পাকিস্তানের সংহতি ও অশেষ ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত পাকিস্তানের বুনিয়াদ যেন অটুট থাকে' তার জন্য দোয়া করেন। এছাড়া 'ভারতের ঘৃন্য হামলার বিরুদ্ধে পাকিস্তান যেন উপযুক্ত জবাব দিতে পারে' সে জন্য আল্লাহতায়ালার কাছে প্রার্থনা করেন। মোনাজাতের পর সমাবেশের সমাপ্তি ঘটে। (পূর্বদেশ ১৪/৪/৭১)

সমাবেশ সমাপ্ত হবার পর মিছিলকারীরা আজিমপুর কলোনী, শান্তিনগর, শাঁখারী বাজার প্রভৃতি স্থানে বাঙ্গালীদের ঘরবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। বেশ কিছু বাঙ্গালীকে ধাওয়া করে হত্যা করে রাস্তার পাশে লাশ ফেলে রাখা হয়।

১৩ এপ্রিলে সমাবেশ এবং তার পরের ভাঙচুরের মাধ্যমে শান্তি কমিটি কাজ শুরু করে। পরদিন ১৪ এপ্রিল নাগরিক শান্তি কমিটির বৈঠক বসে। বৈঠকে কমিটির নাম পরিবর্তন করে 'পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি' নাম রাখা হয়। এর ফলে কমিটি 'সারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ চালিয়ে যেতে পারবে বলে' সভার প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়।

প্রস্তাবে বলা হয়, প্রয়োজন অনুসারে কমিটি যে কোন সময় সদস্য-সংখ্যা বাড়াতে পারবে। জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে ইউনিট গঠন করে

৩—

মিশনের কাজ, সাফল্য মণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

কোন বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তা কার্যকরী করার জন্য কমিটি ২১ সদস্যের একটি ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করে। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ছিলেন—১। খাজা খয়েরুদ্দীন, আহ্বায়ক ২। এ, কিউ এম শফিকুল ইসলাম ৩। গোলাম আজম ৪। মাহমুদ আলী ৫। আবদুল জব্বার খদ্দর ৬। মওলানা সিদ্দিক আহমদ ৭। আবুল কাশেম ৮। ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) ৯। মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম ১০। আবদুল মতিন ১১। ব্যারিষ্টার আখতার উদ্দিন ১২। অধ্যাপক গোলাম সরওয়ার ১৩। এ, এস, এম, সোলায়মান ১৪। পীর মোহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া) ১৫। এ, কে রফিকুল হোসেন ১৬। নুরুল আমিন ১৭। আতাউল হক খান ১৮। তোহা বিন হাবিব ১৯। মেজর আফসারুদ্দিন ২০। দেওয়ান ওয়ারেসাত আলী ২১। হাকিম ইরতিজায়ুর রহমান আখুনজাদা।

বর্তমানে যেখানে জামাতের কেন্দ্রীয় অফিস সেখানকার একটি বাড়ি ৫ এলিফেন্ট লেন মগবাজারে কমিটির কেন্দ্রীয় অফিস স্থাপন করা হয়।

কমিটি গঠনের পর ১৬ এপ্রিল সন্ধ্যায় নুরুল আমিনের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা গর্বণর হাউসে হত্যাযজ্ঞের সর্বোচ্চ নেতা জেনারেল টিক্কা খানের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। আলোচনা কালে কমিটির সদস্যরা টিক্কা খানকে জানান 'জনসাধারণ ভারতের ঘৃণ্য শয়তানী পুরোপুরি অনুধাবন করতে পেরেছেন এবং পাকিস্তানের সংহতি ও অখণ্ডতা রক্ষায় তারা সেনাবাহিনীকে মদদ জুগিয়ে যেতে অটল রয়েছেন। প্রত্যুত্তরে জনগণের প্রকৃত সমস্যাবলী সম্পর্কে তদন্ত করে অবিলম্বে সেগুলোর সুরাহা করা হবে বলে টিক্কা খান নিশ্চয়তা দেন। (পুর্বদেশ ১৭/৪/৭১)

শান্তি কমিটির কর্মকাণ্ড এভাবেই শুরু হয়। তারপর স্বাধীনতা সংগ্রাম চলাকালীন অবরুদ্ধ বাংলাদেশে এই কমিটি ইউনিয়ন ও গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত সুবিস্তৃত হয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সুপরিকল্পিতভাবে ইতিহাসের ভয়াবহতম গণহত্যার নেতৃত্ব দিয়েছে। বস্তুতঃ পাক সামরিক জান্তার চেয়ে এই তথাকথিত শান্তি কমিটি গণহত্যায় আরও বেশী অবদান রেখেছে। পাকসেনা যে জনপদে গেছে সেখানেই বেপরোয়াভাবে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে কিন্তু শান্তি কমিটি খুন করেছে সুনির্দিষ্ট তালিকা প্রস্তুতের মাধ্যমে অত্যন্ত নৈপুন্যের সঙ্গে। শান্তি কমিটির সদস্যরা নিজের হাতে খুন ধর্ষণ লুটতরাজ ও ধ্বংসাত্মক কাজ করে ছাড়াও এসব কাজের জন্য গড়ে তুলেছে রাজাকার, আল বদর, আল শামস প্রভৃতি বাহিনী। শান্তি কমিটি পরিচালিত গণহত্যা আরও বেশী ক্ষতিকর

ছিল এই কারণে যে, পাক সেনারা তাদের ধ্বংসাত্মক তৎপরতা চালাতে পেরেছে তাদের অবস্থানস্থলের কাছাকাছি পর্যন্ত, কিন্তু শান্তি কমিটি সুবিস্তৃত ছিল জালের মতন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সর্বত্র। এছাড়া পাক সেনা হত্যা করত কর্তৃপক্ষের নির্দেশনা অনুযায়ী, ত্রাস সৃষ্টি করা এবং জিঘাংসা ও লাম্পট্য চরিতার্থ করার জন্য, কিন্তু শান্তি কমিটির ক্ষেত্রে এর সাথে যুক্ত হয়েছিল নিহতদের সম্পত্তি দখল, প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা, সামরিক জান্তার বাহবা অর্জন, বিকৃত ধর্মীয় উন্মাদনা ইত্যাদি কারণ। এর ফলাফল তুলনামূলক ভাবে দীর্ঘস্থায়ী হতে বাধ্য।

শান্তি কমিটির মূল উদ্দেশ্য কি ছিল তার পরিচয় পাওয়া যাবে এই নব্য নাৎসী বাহিনীর মূল হোতা বর্তমানে জামাতে ইসলামীর আমীর গোলাম আজমের প্রকাশ্য জনসভায় প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃতি থেকে। ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট পাকিস্তানের 'আজাদী দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি আয়োজিত সভায় তিনি 'পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য' দেশ প্রেমিক নাগরিকদের শান্তি কমিটির সাথে সহযোগিতা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

অবরুদ্ধ বাংলাদেশে মাসের পর মাস কিভাবে অগণন মানুষকে তাদের জীবন, জীবিকা, সম্ভ্রম আর স্বস্তি বিসর্জন দিয়ে শান্তি কমিটির 'মিশনের' শিকার হতে হয়েছে। কিভাবে শান্তি কমিটির সদস্যরা স্বহস্তে নির্যাতনের মাধ্যমে হত্যাসহ অন্যান্য অপরাধ ঘটিয়েছে, তার অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যাবে বাংলাদেশে গণহত্যার যে কোন বর্ণনায় কিংবা সারা বাংলাদেশের নির্যাতিত জনগণের জবানীতে। এখানে শুধু '৭২ এর সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাদেরই সম্পাদিত দু'টি দলিল উপস্থাপন করা হবে নমুনা হিসেবে যদিও শান্তি কমিটির অপরাধমূলক তৎপরতার স্বরূপ উদঘাটনের ক্ষেত্রে এগুলো নিতান্তই অপ্রতুল।

লাকসামের কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ৬-৫-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করে :

১। সভাপতি ও সহ সভাপতির অনুপস্থিতিতে জনৈক চৌধুরীকে সর্বসম্মতিক্রমে আজকের সভার সভাপতি করা হয়।

২। জনৈক চৌধুরীর পদত্যাগপত্র পরবর্তী সভায় পেশ করার জন্য রেখে দেওয়া হল।

৩। ক) তথাকথিত মুক্তিবাহিনী এবং তাদের তহবিল সংগ্রহ, সদস্যভুক্তি ইত্যাদি গোপন কার্যক্রমের বিস্তারিত বিবরণ ও তথ্যাদি এবং ইতিমধ্যেই অন্তর্ভুক্ত সদস্যদের বিবরণ যথাশীঘ্র কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিকে

জানানো হোক। যারা মুক্তিবাহিনীর জন্য চাঁদা আদায় করছে এবং যারা চাঁদা প্রদান করছে তাদের একটি তালিকা কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কাছে পেশ করা হোক।

খ) লাইসেন্স ছাড়া সমস্ত বন্দুক, রাইফেল ও অন্যান্য সাজসরঞ্জামের খোঁজ জানানো হোক।

গ) ইউনিয়ন শান্তি কমিটি সমূহকে পুনরায় অনুরোধ করা গেল মালি, মেথর, পেশাদার 'ধোপী', জেলে এবং নাপিত ছাড়া সকল হিন্দুকে উৎখাত করা হোক। এধরনের 'কেস' সমূহের একটি তালিকা পূর্ণ বিবরণসহ পেশ করা হোক।

ঘ) পাকিস্তানে আশংকামুক্ত হয়ে ও আত্মবিশ্বাসের সাথে সকল বৌদ্ধ যাতে বাস করতে পারে সেজন্য তাদের সকল সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হোক। বিভিন্ন ইউনিয়ন কাউন্সিলে বসবাসকারী বৌদ্ধদের একটি করে তালিকা সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন শান্তি কমিটি কর্তৃক পেশ করা হোক

৪। অধুনা লুপ্তঘোষিত আওয়ামী লীগের যেসব সদস্য আওয়ামী লীগের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেছে তাদের নিম্নলিখিত কারণে একটি প্রথামত সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা দিতে বলা হোক :

ক) অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের বিভক্তির জন্য এবং কার্যত: ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যাওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতার জন্য কাজ করে।

খ) উক্ত রাজনৈতিক দল পাকিস্তানের মুসলমানদের মধ্যে শ্রেণীভিত্তিক ঘৃণা ছড়ায়, তাদের মধ্যে জাতিসত্তাগত বা প্রদেশগত সংঘর্ষে উৎসাহিত করে এবং পাকিস্তানের সর্বাত্মক ক্ষতি করার জন্য আঞ্চলিকতাকে উৎসাহিত করে।

৫। সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন সমুহের সামরিক লোকদের ও প্রাক্তন সামরিক ব্যক্তিদের তালিকা পেশ করা হোক।

৬। সরকারী ও আধাসরকারী প্রতিষ্ঠানের অফিসারবৃন্দ ও কারখানার শ্রমিকদের স্ব স্ব কাজে যোগদানের জন্য উৎসাহিত করা হোক।

৭। ১৬ নং ইউনিয়ন কাউন্সিলের মোহাম্মদপুর ও ইছাপুরে বা তার আশেপাশে লুণ্ঠন ও সমাজবিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য নিম্নলিখিত ভদ্রলোকদের নিয়ে একটি অনুসন্ধান কমিটি করা হোক। এই কমিটি ৯-৫-১৯৭১ তারিখে বা তার পরে রিপোর্ট পেশ করবেন।

---

১ 'বাংলাদেশে গণহত্যা মোহাম্মদ আবু জাফর : সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১০ বর্ষ ১ সংখ্যা ২২মে'৮১ পৃঃ-৩১ ৩৩।

লাকসামের ইউনিয়নে ইউনিয়নে যে সমস্ত নিরপরাধ হিন্দু নারী-পুরুষ-শিশু শান্তি কমিটির তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলেন তাঁরা নিশ্চয়ই রাজাকার, মুজাহিদ, আল বদর বা আল শামস বাহিনীর সদস্যদের হাতে নৃশংস হত্যার শিকার হয়েছেন। স্বাধীনতার পর হয়ত কোন গণকবরে আবিষ্কৃত তাঁদের বেওয়ারিশ বিকৃত লাশ আবারও মাটিচাপা দেওয়া হয়েছে ; এ'মাটির সাথে চিরতরে মিশে গেছেন তাঁরা।

কিন্তু ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে সংবাদপত্রে মুদ্রিত শান্তি কমিটির ওই দলিলটিতে সভায় অংশগ্রহণকারীদের নাম সযত্নে কালি দিয়ে ঢেকে দেয়া হয়েছে। নামগুলোর আয়াসসাধ্য পাঠোদ্ধারের পর খোঁজ নিয়ে দেখা গেছে এদের প্রায় সকলেই আজও লাকসামে প্রতাপের সাথে বিরাজমান।

শান্তি কমিটির নেতারা তাদের বক্তৃতায় দুষ্কৃতকারী ও ভারতের দালালদের নির্মূল করা বলতে কি বোঝাত তার একটি অপর্যপ্ত দৃষ্টান্ত হতে পারে এই দলিলটি। এই শান্তি কমিটির একটি সভার খবর বের হয় ৭১ এর ২৬ অক্টোবরের দৈনিক পত্রিকাগুলিতে। এতে বলা হয়, 'সম্প্রতি লাকসামে শান্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় দেশকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সেনাবাহিনীকে অভিনন্দন জানানো হয়। শান্তি কমিটির সভাপতি তাঁর ভাষণে দুষ্কৃতকারী ও ভারতীয় চরদের প্রতিরোধ করার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান। দশ হাজারেরও অধিক লোক সভায় যে কোন মুল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য পুনরায় শপথ গ্রহণ করে।'

অপর দলিলটি হচ্ছে ঢাকার মোহাম্মদপুরে শান্তি কমিটির শাখা সংগঠন 'পাকিস্তান অখণ্ডতা ও সংহতি সংরক্ষণ এ্যাকশন কমিটি'র ৯-৮-১৯৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্তসমূহ। ইংরেজীতে গৃহীত এই সিদ্ধান্তসমুহের বঙ্গানুবাদ হচ্ছে ঃ

গোপনে বিলি ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য খাঁটি পাকিস্তানী মুসলিম নাগরিকদের এক সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ ঃ

১। উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং বিদ্যালয়ের বাধ্যতামুলক বিষয় করা হোক। বাংলা সাইনবোর্ড, নম্বর প্লেট ও নাম অপসারণ এবং সংস্কৃত ধরনের বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে রোমান হরফ ব্যবহার করতে হবে।

২। যে কাফের কবি নজরুল ইসলামের ছেলেদের হিন্দু/বাংলা নাম রয়েছে তার রচনাসহ বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির হিন্দু প্রভাবিত অংশসমুহ বর্জন করতে হবে।

৩। পূর্ব পাকিস্তানের রেডিও টেলিভিশনের অনুষ্ঠানের শতকরা ৫০ ভাগ ব্যয় করতে হবে উর্দু অনুষ্ঠানের জন্য।

৪। আমাদের পবিত্র ভূমিতে পাকিস্তান বিরোধীদের আসতে দেওয়া হবেনা (যেমন, ইহুদীবাদী দুশ্চরিত্র ইসলামের শত্রু এডওয়ার্ড কেনেডী)।

৫। বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতির কারণে বাঙালী সরকারী কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের উপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখতে হবে, (পরে তাদের সামরিক আদালতে বিচার করে হত্যা করতে হবে)।

৬। জাতির স্বার্থে উচ্চপদ থেকে বাঙালী অফিসারদের দু'বছরের জন্য অপসারণ করতে হবে।

৭। রাজাকার বাহিনীর বেতন এবং শান্তি কমিটির ব্যয় নির্বাহের জন্য হিন্দু সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

৮। কড়া প্রতিবাদ জানিয়ে ইল, এস, আর, ইউ, কে এবং অন্যান্য শত্রু রাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

৯। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে বিতরণের জন্য বাস্তহারাদের সাহায্য দ্রব্য এবং উর্দুভাষী খাঁটি পাকিস্তানীদের মধ্যে বিতরণের জন্য বিধ্বস্তদের সাহায্য তহবিল ব্যবহার করতে হবে।

১০। বীর পাকিস্তানী ও আমাদের সত্যিকারের বন্ধুরাষ্ট্র চীনের সৈনিকদের নামে শহরগুলোর নামকরণ করতে হবে।

১১। বর্তমান জাতীয় পুনর্গঠনের সময় তিন মাসের জন্য বিদেশী সাংবাদিক ও অনভিপ্রেত ব্যক্তিদের বহিষ্কার করতে হবে।

গণহত্যাকারী পাক সেনাবাহিনীর সাথে শান্তি কমিটির যোগাযোগ কত উচ্চপর্যায় পর্যন্ত সুবিস্তৃত ছিল তার একটি দৃষ্টান্ত এক্ষেত্রে দেয়া যেতে পারে। ২৫ জুন ১৯৭১ তারিখের 'আজাদ' পত্রিকায় হেডলাইনে মোটা হরফে লেখা সংবাদটি ছিল নিম্নরূপ, 'অদ্য পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চল সফরকালে সেনাবাহিনীর চীফ অব স্টাফ জেনারেল আবদুল হামিদ খানকে বিভিন্ন শান্তি কমিটি কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন কল্যাণকর

সংস্কৃতি ধ্বংসের এই ষড়যন্ত্রের অংশ হিসাবে ১৫ জুন ১৯৭১ ঢাকা শহরে ২৪০টি রাস্তার নতুন নামকরণ করা হয়। এই নামগুলির কয়েকটি ছিল, শাঁখারি বাজার রোড—টিক্কা খান রোড, মাদারটেক-মাজারটেক-ইন্দিরা রোড—আনার-কলি রোড…এলিফেন্ট রোড—আল আরাবিয়া রোড, বেইলী রোড…বু'আলী রোড, রায়ের বাজার—সুলতান গঞ্জ। বুদ্ধিজীবী হত্যার বধ্যভূমির কাছে বসিলা গ্রামের নাম দেওয়া হয়েছিল 'ওয়াসিলা।'

২, প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩

কাজ এবং বেসামরিক জনতা ও সামরিক কর্তৃপক্ষের মধ্যেকার সৌহার্দ্যের কথা জানানো হয়। জেনারেল হামিদ অদ্য সকালে পূর্বাঞ্চলীয় কমাণ্ডের কমাণ্ডার ও জি ও সি সহ যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙা, এবং ফরিদপুর সফর করিয়া পূর্বাহ্নে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করেন। জেনারেল হামিদকে জানান হয়, এই অঞ্চলের দেশদরদী জনগণ দেশ হইতে রাষ্ট্রদ্রোহীদের উচ্ছেদে কর্তৃপক্ষকে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করিতেছে। এই সমস্ত রাষ্ট্র-দ্রোহীর মধ্যে কিছুসংখ্যক লোক আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে শান্তি প্রিয় লোকালয়ে আত্মগোপন করিলে স্থানীয় জনসাধারণ তাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া শাস্তি প্রদান করে। ইহাদের শাস্তি প্রদানের জন্য দেশে বহু রাজাকার বাহিনী গঠিত হইয়াছে।'

যে ১৪০ জন ব্যক্তির সমন্বয়ে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল তাঁদের প্রায় সবাই ছিলেন জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগ, পি ডি পি, নেজামে ইসলাম এবং কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ। এই ১৪০ জনের মধ্যে চার থেকে পাঁচ জন বিদেশে রাজনীতি করছেন, দশ বার জনের স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে, এবং বাদবাকী সবাই আজ বাংলাদেশে রাজনীতি বা অন্য ক্ষেত্রে উচ্চপদে আসীন। এদের প্রত্যেকের পরিচয় স্বল্প পরিসর এই গ্রন্থে প্রদান করা সম্ভব নয়। তবে নেতৃস্থানীয় কয়েকজনের যুদ্ধকালীন কর্যাকলাপের বিবরণ আমরা দেবো যা থেকে শান্তি কমিটির দালালী, নৃশংসতা ও ঘাতক চরিত্র উন্মোচন করা যাবে। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মূল কাজ ছিল স্বাধীনতামনা বাঙ্গালীদের হত্যা তালিকা প্রস্তুত ও তাদের হত্যা করার কাজে পাক সেনাবাহিনীকে সহায়তা প্রদান এবং রাজাকার, আলবদর, আলশামস প্রভৃতি বাহিনীকে নিয়োজিত করা। একাত্তরে এদের বক্তৃতা বিবৃতির আক্ষরিক অর্থ ছাড়াও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বুঝতে পারলেই এদের প্রকৃত অপরাধ অনুধাবন করা যাবে। আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান, আবুল হামিদ খান, টিক্কা খান বা আমীর আব্দুল্লাহ্ খান নিয়াজী নিজের হাতে বাঙ্গালী হত্যা না করলেও তারা গণহত্যার অপরাধে অপরাধী। একই অপরাধে অপরাধী শান্তি কমিটির প্রত্যেকটি সদস্য কারণ এই কমিটির পরিকল্পনা ও নির্দেশেই রাজাকার, আল বদর, আল শামস ইত্যাদির তৎপরতা পরিচালিত হত।

আজকের জামাতে ইসলামী, মুসলিম লীগের বিভিন্ন অংশ, খেলাফত আন্দোলন, আই, ডি, এল, নেজামে ইসলাম প্রভৃতি দলের নেতৃবৃন্দের প্রায় সবাই একাত্তরের মুখ্য দালাল। এ ছাড়া জাতীয় পার্টি, বি, এন, পির বিভিন্ন অংশ এবং ডান পন্থী অন্যান্য দলেও ঘটেছে কুখ্যাত দালালদের সমাবেশ।

শান্তি কমিটির ক্রমবিকাশ

এ পর্যায়ে মূল প্রসঙ্গ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি সংগঠনের ক্রমবিকাশের আলোচনায় ফিরে আসা যেতে পারে। ১৯ এপ্রিল কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা শহরের বিভিন্ন ইউনিট ও মহল্লায় শান্তি কমিটি গঠন এবং সেগুলোর আহ্বায়ক মনোনয়নের কথা ঘোষণা করে। কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় অনেক স্থানে ইতিমধ্যেই কমিটি গঠিত হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে ইউনিট ও আঞ্চলিক কমিটির তৎপরতা সম্পর্কিত রিপোর্ট ঢাকার মগবাজার এলাকাস্থিত কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিসে পৌছে দিতে বলা হয়। কেন্দ্রীয় অফিস ২৪ ঘণ্টা খোলা রেখে অফিস সেক্রেটারী এডভোকেট নুরুল হক মজুমদারকে (মুসলিম লীগ নেতা) সর্বক্ষন অফিসে মোতায়েন করা হয়।

বিভিন্ন স্থানে ইউনিট শান্তি কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি বিভিন্ন জেলায় ও মহকুমায় নেতৃবৃন্দ ও কর্মিদের পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

'জনগনের অসুবিধাদি সম্পর্কে তথ্যাদি গ্রহণ এবং যথাযথ কতৃপক্ষ ও আর্মি সেকটরের সাহায্যে তার প্রতিকার করার জন্য কমিটির সদস্যদের মধ্য থেকে বেশ কিছু সংখ্যক লিয়াজো অফিসার নিয়োগ করা হয় এবং তারা ইতিমধ্যেই তাদের কর্তব্য সম্পাদন করতে শুরু করেছেন বলে' বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়। লিয়াজো অফিসারদের প্রতিদিন তাদের কর্ম-তৎপরতার রিপোর্ট কেন্দ্রীয় কমিটিতে দাখিল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

(এই লিয়াজো অফিসারদের তালিকা পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে) লিয়েজো অফিসগুলো ছিল ঢাকা শহর শান্তি কমিটির কার্যকলাপের মুল ঘাটি। লিয়াজো অফিসারদের তাদের নিজ নিজ এলাকার রাজাকার-দের উপর কর্তৃত্ব ছিল।

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় স্বাধীনতামনা বাঙ্গালীদেরকে চিহ্নিত করে ক্যান্টনমেন্টে পাকবাহিনীর কাছে তাদের নামের তালিকা পৌছে দেয়া ছিল লিয়াজো অফিসগুলির মুল কাজ। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে ঢাকা কোন মুক্তিযোদ্ধা থাকা সম্ভব ছিল না। বস্তুতঃ আর্মি সেকটরের সাহায্যে প্রতিকার করার একটি মাত্র অর্থ হতে পারে আর তা হচ্ছে প্রাণ ভয়ে লুকিয়ে থাকা অসহায় বাঙ্গালীদের হত্যা করার জন্য পাক বাহিনীকে ডেকে আনা। এপ্রিলের সেই ভয়াবহ দিনগুলিতে ঢাকা শহর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সবাই জানেন, এই সমস্ত লিয়াজো অফিসে প্রতিদিন সামরিক জীপে করে পাকিস্তানী সেনা এসেছে, লিয়াজো

অফিসাররা তাদেরকে সাথে করে নিয়ে গেছে অসহায় বাঙ্গালীদের বাড়ীতে বাড়িতে। তারপর পাক বাহিনী যে নির্বিচার হত্যা, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগ চালিয়েছে—সে সময়ে ঢাকায় আটকে পড়া বাঙ্গালীদের অজানা নয়।

রাতদিন ২৪ ঘন্টা খোলা রেখে সে সময় লিয়াজোঁ অফিসগুলি বন্দী বাঙ্গালীদের নির্যাতন কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। একটি দৃষ্টান্ত এ প্রসঙ্গে দেওয়া যেতে পারে। তেজগাঁ থানার লিয়াজোঁ অফিসার মাহবুবুর রহমান গুরহা স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে আত্মগোপন করেন। দালাল আইনের প্রহসনমূলক বিচারে তাঁর অনুপস্থিতেই তাঁকে কারাদণ্ড দেয়া হয়। সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর তিনি নাখাল পাড়ায় তাঁর বাড়িতে চলে আসেন। এখন তিনি পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড চেয়ারম্যান এবং জাতীয় পার্টির স্থানীয় নেতা।

১৬ ডিসেম্বর বিকেল বেলায় নাখাল পাড়ায় অবস্থিত এই তথাকথিত লিয়াজোঁ অফিসে স্থানীয় বাসিন্দারা প্রবেশ করেন। সেখানে চাপ চাপ রক্তের মধ্যে মেঝেতে ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায় মৃতদেহ।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান জল্লাদ আলবদর বাহিনী আশরাফুজ্জামান খান এই লিয়াজোঁ অফিস থেকে কয়েকশত গজ দূরে ৩৫০ নাখাল পাড়ায় বাস করত। এই লিয়াজোঁ অফিসে তারও যাতায়াত ছিল। রাজধানীর প্রত্যেকটি লিয়াজোঁ অফিস সম্পর্কে একই কথা প্রযোজ্য।

২২ এপ্রিল কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির এক আবেদনে 'সমস্ত দেশপ্রেমিক পূর্ব পাকিস্তানীর প্রতি রাষ্ট্রদ্রোহীদের সব রকম ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ প্রতিহত করার এবং সশস্ত্র বাহিনীকে সাম্ভাব্য সকল উপায়ে সহায়তা করার জন্য আহ্বান জানান হয়। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষে আহ্বায়ক খাজা খয়েরুদ্দীন কর্তৃক ইস্যুকৃত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় 'রাষ্ট্র দ্রোহীরা সম্পূর্ণভাবে হতাশ হয়ে এখন পোড়ামাটি নীতি অবলম্বন করেছে এবং তারা যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের হয়রানি করেছে।' আবেদনে আরও বলা হয়, সশস্ত্র বাহিনী জনগণেরই অন্তর্গত এবং নাগরিকদের জীবন ও ধনসম্পত্তি রক্ষাই তাদের উদ্দেশ্য।'

২৫ এপ্রিল কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, 'কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির মিশন সফল করার উদ্দেশ্যে জেলা ও মহকুমা সদরে শান্তি কমিটি গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতিনিধিদের পাঠানো হচ্ছে। তবে ইতিমধ্যে যদি কোন জেলা বা মহকুমার দেশপ্রেমিক লোকদের উদ্যোগে শান্তি কমিটি গঠিত হয়ে থাকে তবে সে সব কমিটির নাম অনুমোদনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে পাঠাতে বলা হয়েছে। কেন্দ্রীয় কমিটি সংশ্লিষ্ট প্রশাসন কর্তৃপক্ষের কাছে অনুমোদিত ইউনিট সম্পর্কে

রিপোর্ট দেবেন।

'শহরে পুর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির পক্ষ থেকে ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় শান্তি স্কোয়াড যাতায়াত করেছেন।'

মাথায় সাদা বা লাল পট্টি বাঁধা শান্তি কমিটির এই শান্তি স্কোয়াডের সদস্যরা ঢাকা শহরের বিভিন্ন এলাকায় নির্বিচারে বাঙ্গালী হত্যা সহ তাদের বাড়িতে লুটতরাজ এবং অগ্নি সংযোগ করে। বাঙ্গালী, বিশেষতঃ তরুণ ও যুবকদের দেখামাত্র পিটিয়ে, বেয়নেট চার্জ করে বা গুলি করে হত্যা করে। শহরের বিভিন্ন এলাকায় বাঙ্গালীদের বাড়িঘর পেট্রোল ছিটিয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়। সে সময় পর্যন্ত ঢাকা শহরে আটকে পড়া বাঙ্গালী মাত্রই এই স্কোয়াডের অত্যাচার সম্পর্কে জ্ঞাত আছেন। এপ্রিল মাসের শেষ থেকে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ জেলা ও মহকুমা পর্যায়ে শান্তি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সারা বাংলাদেশে সাংগঠনিক সফর করেন। ইতিমধ্যে অধিকাংশ এলাকায় শান্তি কমিটি গঠিত হয়ে গিয়েছিল ; যে সমস্ত এলাকায় হয় নি, সে সব এলাকায় মোটামুটিভাবে মে মাসের মাঝামাঝির দিকে শান্তি কমিটি গঠনের কাজ শেষ হয়ে যায়।

বিভিন্ন জেলা ও মহাকুমা শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলের বিরুদ্ধে রয়েছে সরাসরি নির্বিচার গণহত্যার অভিযোগ। এই হত্যাকারীদের প্রায় সকলেই আজ পুনর্বাসিত, কেউ কেউ মন্ত্রী এবং সংসদ সদস ও হয়েছেন। আমরা এই গ্রন্থে জেলা পর্যায়ের তিনটি ০মুনা দেব।

জিয়াউর রহমানের আমলে রেলমন্ত্রী হয়েছিলেন আবদুল আলীম। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তিনি ছিলেন জয়পুরহাট শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান। নিরপরাধ বাঙ্গালীদের সম্পর্কে সে সময় তাঁর কি মনোভাব ছিল তা বুঝবার জন্য এখানে ১৮ জানুয়ারী ১৯৭২ সালের দৈনিক বাংলায় একটি বক্স আইটেম—'হানাদার বাহিনীর বর্বরতা মধ্যযুগীয় নরঘাতকদেরও হার মানিয়েছে' শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল--

'জয়পুরহাট শান্তি কমিটির নেতা জয়পুরহাট ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মুসলিম লীগের আবদুল আলীমকে একদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল প্রেসিডেন্ট সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর সংখ্যালঘুদের দেশে ফেরার নিশ্চয়ই আর কোন বাধা নেই। উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে, ওদের ক্ষমা নেই। ওরা দেশে ফিরলেই ওদের সামরিক বাহিনীর হাতে

---

০ জেলা মহকুমা পর্যায়ে দালাল ও ঘাতকদের তৎপরতা এই গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হবে।

তুলে দেয়া হবে। শুনে স্তম্ভিত হতে হয়েছে। একজন উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি যদি এরকম ধারণা পোষণ করে তবে সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত দালালদের কি রকম মনোভাব ছিল তা অতি সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ ইয়াহিয়া খানের লোক দেখানো ক্ষমা ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে যেসব মুষ্টিমেয় সংখ্যালঘু ফিরে এসেছিল তাদের আর পৃথিবীর আলো-বাতাস দেখতে হয়নি।'

আবদুল্ল আলীম সেই সময় নিজের হাতে বাঙ্গালীদের লাইন ধরে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিলেন। এছাড়া বেয়নেট চার্জ করে বহু বাঙ্গালীকে মারার অভিযোগও তাঁর বিরুদ্ধে রয়েছে।

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের মুসলিম লীগ দলীয় সদস্য আয়েন উদ্দিন ছিলেন রাজশাহী জেলা শান্তি কমিটি প্রধান। ১৯৭১ সালের ৩১ মে দৈনিক আজাদ পত্রিকার সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি পাক সেনাবাহিনীর বিশেষ তৎপরতার ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন তারা অসীম ধৈর্য্যের সাথে শত্রুর মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছে। রাজশাহী জেলার সর্বত্র স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। প্রতি মহকুমা থানা ও ইউনিয়নে শান্তি কমিটি গঠন করা হয়েছে।

ইয়াহিয়া খানের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের ফিরে আসা সংক্রান্ত প্রতারণামুলক সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন প্রেসিডেন্টের এই বীরোচিত আবানকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। একটি মুসলিম রাষ্টের একজন নিভীক রাষ্ট্র প্রধানের এই আহ্বান বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের মনে সাড়া জাগাতে সক্ষম হবে।

৪ আগষ্ট দৈনিক সংগ্রামের খবরে বলা হয় রাজাকার বাহিনীর প্রথম গ্রুপের ট্রেনিং সমাপ্তি উপলক্ষে আজ স্থানীয় জিন্নাহ ইসলামিক ইনস্টিটিউটে এক সমাপনী উৎসব অনুষ্টিত হয়। অনুষ্ঠানে পবিত্র কোরান স্পর্শ করে শপথ গ্রহন করা হয়। অনুষ্ঠানে শান্তি কমিটির সভাপতি জনাব আয়েন উদ্দিন রাজাকার বাহিনীকে যথাযথ কর্তব্য পালনে সক্রিয় থাকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি রাজাকারদের বিশ্বস্থতার সাথে পাকিস্তানের আদর্শ সংহতি ও অখণ্ডত্ব রক্ষার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার উপদেশ দেন। অনুষ্ঠানে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ও সামরিক অফিসারবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

২৮ আগষ্ট রাজশাহী কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন আয়েনুদ্দিন। এই সভায় শহীদ রাজাকারদের শোক সন্তপ্ত পরিবারবর্গকে খাস জমি অথবা দুষ্কৃতকারীদের পরিত্যক্ত জমি থেকে ১০ বিঘা করে জমি দেবার প্রস্তাব করা হয়। এছাড়া সামরিক

আর্থিক সংকট উতরানোর জন্য কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি কর্তৃক রাজাকারদের শোক সন্তপ্ত পরিবারকে পাঁচশ টাকা ও এক বস্তা করে চাউল দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।'

তৃতীয় দৃষ্টান্ত হচ্ছেন কুষ্টিয়া জেলা জামাতে ইসলামী ও শান্তি কমিটির সভাপতি সাদ আহমেদ। স্বাধীনতার পর তাঁর বাড়ির কাছে একটি কূপ থেকে ২৫টি মাথার খুলি ও নরকঙ্কাল আবিষ্কার করা হয়। দালালীর অভিযোগে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয় কিন্তু অত্যন্ত লঘু শাস্তি দিয়ে তাঁকে নিষ্কৃতি দেওয়া হয়। এখন তিনি কুষ্টিয়ার একজন সিনিয়র এডভোকেট এবং একটি রাজনৈতিক দলের নেতা।

আজকের ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রী—মাঈদুল ইসলাম আসাদগেট নার্সারির পেছনে বৃক্ষবেষ্টিত যে প্রাসাদোপম বাড়িটিতে বাস করেন, সেটি ছিল মোহাম্মদপুর শান্তি কমিটির অফিস, মন্ত্রী মহোদয়ের পিতা মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য আবুল কাসেম ছিলেন এই কমিটির প্রধান। মোহাম্মদপুরের স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতার মূল কেন্দ্র ছিল এই বাড়িটি।

১৭ মে তারিখে এই বাড়িতে জামাত নেতা কুখ্যাত অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ওমরাও খানের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির একসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভার গৃহীত একটি প্রস্তাবে 'নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগ পরিচালিত রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক সংকট থেকে দেশকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী কর্তৃক সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করা হয়।

'পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে সশস্ত্র বাহিনীকে তাদের মহান কাজে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের ইসলামী শক্তি-সমূদের মধ্যে গভীর ও অচ্ছেদ্য মতৈক্য প্রতিষ্ঠা করা উচিত বলে মত প্রকাশ করা হয়। দুষ্কৃতকারীদের তন্ন তন্ন করে খুঁজে বের করা এবং দেশে পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিকের দৃঢ় প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার ওপরও গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

এই সভায় 'শান্তি কমিটির কার্যাবলী সম্প্রসারিত হওয়ার প্রেক্ষিতে এর নাম পরিবর্তন করে পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও সংহতি কমিটি রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জনগণকে তাদের চূড়ান্ত ভাগ্য হিসেবে পাকিস্তান সম্পর্কে বৃহত্তর আস্থাবোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্য কেবলমাত্র শান্তি কমিটি নাম যথেষ্ট নয় বলে এই পরিবর্তন আনয়নের সুপারিশ' করা হয়।

সভাপতির ভাষণে জেনারেল ওমরাও খান পাকিস্তানের শত্রুদের ধরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে সামরিক বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আহবান জানিয়ে বলেন পাকিস্তানের শত্রুদের ধরিয়ে না দিলে বা নিশ্চিহ্ন না করলে শান্তিতে বসবাস করা যাবে না।

এই সভাতেই কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকরী পরিষদে নতুন ৫ জন সদস্য কো-অপ্ট করা হয় এবং কেন্দ্রীয় কমিটির মূল ২৫ জন সদস্যকে নিয়ে প্রাদেশিক শান্তি কমিটির সাধারণ পরিষদ গঠন করা হয়।

১ আগস্ট তারিখে বিভিন্ন ইউনিয়ন শান্তি কমিটিসমূহের এক সভায় ঢাকা সহর শান্তি কমিটি গঠন করা হয়। এই সভায় বর্তমান মুসলিম লীগের ঢাকা শহর সভাপতি মোঃ সিরাজুদ্দিনকে ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। তেজগাঁ থানার লিয়াজো অফিসার জামাত নেতা মাহবুবুর রহমান গুরহা সহসভাপতি এবং মোঃ মনসুর আলী সাধারন সম্পাদক নির্বাচিত হন।

ঢাকা শহরের শান্তি কমিটির সদস্যদের কার্যকলাপের নমুনা হিসেবে এখানে রায়ের বাজার শান্তি কমিটির সাধারন সম্পাদক হেদায়েতুল্লাহ চৌধুরীর দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।

১৯৭১ সালে তিনি রায়ের বাজার মুসলিম লীগেরও সাধারন সম্পাদক ছিলেন হেদায়েতুল্লাহ চৌধুরী জাতীয় লোক প্রশাসন ইনস্টি-টিউটের (নিপা) কৃতি গবেষক প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক আবদুর রউফ সর্দারের অপহরণ ও হত্যা মামলার প্রধান আসামী ছিলেন। এই মামলার রায়ে উল্লেখ করা হয় ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর পাকসেনা সমেত একদল রাজাকার ও আলবদর রায়ের বাজার থেকে অধ্যাপক আবদুর রউফ সর্দার এবং আরও কয়েক জনকে ধরে নিয়ে যায়। এই অপহরণকারীদের মধ্যে আসামী হেদায়েতুল্লাহও ছিল। অপহৃত-দের কয়েকজন পরে ফিরে এলেও অধ্যাপক আর ফিরে আসেন নি। ৭১ এর ডিসেম্বরের পর রায়ের বাজার বিলে রউফ সর্দারের বিকৃত ও গলিত মৃতদেহ খুঁজে পাওয়া যায়। এই মামলার বাদিনী ছিলেন প্রত্যক্ষদর্শিনী অধ্যাপকের স্ত্রী আনিসা খাতুন। তাঁর এজাহারক্রমেই পুলিশ হেদায়েতুল্লাহ চৌধুরীর বিরুদ্ধে চার্জশীট দিয়েছিল। কিন্তু তবুও হেদায়েতুল্লাহ চৌধুরীর সন্দেহের অবকাশে অপহরনের অভিযোগে থেকে নিষ্কৃতি দিয়ে শুধুমাত্র দালালীর অভিযোগে ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ও ২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। দণ্ডপ্রাপ্তির ৬ মাসের মধ্যেই হেদায়েতুল্লাহ ছাড়া পেয়ে যান। ঢাকার সেনট্রাল রোডে বসবাসরত হেদায়েতুল্লাহ এখন একজন ধনাঢ্য ব্যবসায়ী। রাজনৈতিকভাবে মুসলিম

লীগের একটি অংশের সাথে যুক্ত। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির বেশীর-ভাগ নেতা স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত পাকিস্তান রক্ষার চেষ্টা চালিয়েছিল ২৯ নভেম্বর কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি ঢাকা শহরে একটি গণমিছিল বের করে। ঠিক যেভাবে শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছিল দালালদের একটি বৃহদাকার মিছিলের মধ্য দিয়ে তেমনিভাবে সাড়ে আটমাস ধ.র সারাদেশে গণহত্যা চালানোর পর একটি মিছিলের মধ্যে দিয়েই শান্তি কমিটির কার্যকলাপের অবসান হয়। বেলা ১-৪০ মিনিটের দিকে গুলিস্তানের কামানের কাছ থেকে মিছিলের যাত্রা শুরু হয়। খাজা খয়েরুদ্দীন ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন, অধ্যাপক গোলাম সার-ওয়ার, মাওলানা আশরাফ আলী, মেজর আফসার উদ্দিন, নুরুজ্জামান প্রমুখ কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি গঠনকারী সমস্ত নেতাই এই মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন। ছিলেন না শুধু অতি বুদ্ধিমান গোলাম আজম, মওলানা আবদুর রহিম প্রমুখ।

এগিয়ে চলার পথে পথে এই মিছিলে শ্লোগান দেয়া হয় পাকিস্তানের উৎস কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, হাতে লও মেশিনগান—দখল কর হিন্দুস্থান, বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর-আসাম বাংলা দখল কর, পাক ফৌজ অস্ত্র ধর-হিন্দুস্তান দখল কর। ভারতের দালালদের খতম কর খতম কর, আমাদের রক্তে—পাকিস্তান টিকবে, কুটনিবুড়ি ইন্দিরা হুশিয়ার হুশিয়ার অফিস আদালতের মীরজাফররা—হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার ঢাকা বেতারের মীরজাফররা—হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার ভারতের দালালী—চলবে না চলবে ন ইত্যাদি। মিছিলে ইন্দিরা, জগজীবন রাম, শরণ সিং প্রভৃতি বহু প্রতিকৃতি বহন করা হয় এবং সমগ্র রাস্তায় প্রতিকৃতিগুলোকে জুতোপেটা করতে করতে মিছিল এগিয়ে যায়।

এরপর কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যক্রমের প্রকাশ্য কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ এর নেতৃবৃন্দ আসন্ন পরাজয় সম্পর্কে আঁচ করতে পেরে আত্মগোপনের প্রস্তুতি নিতে থাকে। এর মধ্যে জামাতে ইসলামীর সদস্যরা বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য বিশিষ্ট নাগরিকদের হত্যা-কাণ্ডের গোপন কার্যক্রমের পরিচালনা করতে যেয়ে অন্যান্য কার্যাবলী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

৭ ডিসেম্বর খান এ সবুরের নেতৃত্বে শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ গঠন করেন। ১০ ডিসেম্বর এই পরিষদ সাফল্যের সাথে ভারতীয় হামলা প্রতিহত করার জন্য সেনাবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করে। এরপর কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকলাপের আর কোন উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় নি।

ফরিদ আহমদ ও নুরুজ্জামানের নেতৃত্বাধীন শান্তি কমিটির দলছুট অংশটি ১৫ এপ্রিল তারিখে বৈঠকে মিলিত হয়ে জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে শান্তি ও কল্যাণ ইউনিট গঠন করে 'সারা পূর্ব পাকিস্তানে কাজ চালিয়ে যাওয়ার' সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভায় স্টিয়ারিং বডির পূর্ব পাকিস্তান শান্তি কল্যাণ কাউন্সিল' নামে পুনঃ নামকরণ করা হয়।

প্রয়োজন হলে 'জেহাদের জন্য প্রস্তুত এবং পাকিস্তান ও ইসলামের দুশমনদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রস্তুত থাকার উদ্দেশ্যে পবিত্র কুরান ও সুন্নাহ্ মোতাবেক জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্যে বার সদস্য, মসজিদের ইমাম, মাদ্রাসার শিক্ষকসহ সকল দেশপ্রেমিক নাগরিকের প্রতি আহ্বান' জানিয়ে পরিষদ সদস্যদের সংস্থার কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য জেলাসমূহ সফরের জন্য নিদেশ দেয়া হয়। জেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে পরিষদের সংগঠন সম্পর্কে ১৫ দিনের মধ্যে সাধারণ সম্পাদক, পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কউন্সিল, ১২ ধানমণ্ডি, রোড নং ৫ এই ঠিকানায় প্রেরণের নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৭ এপ্রিল কল্যাণ পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নুরুজ্জামান খান এক ঘোষণায় জানান জনসাধারণ দুষ্কৃতকারী, বা রাষ্ট্রবিরোধী ব্যক্তিদের হাতে কোন প্রকার অসুবিধা ভোগ করলে সে সম্পর্কে খবরাদি সংগ্রহের জন্য কল্যাণ পরিষদ কতগুলো তথ্য কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছে। এই কেন্দ্র-গুলোর কাজ মোটামুটিভাবে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিস-গুলোর মতই ছিল। (পরিশিষ্টে কেন্দ্রসমূহের ঠিকানা ও ভারপ্রাপ্ত সদস্যদের নাম সংযোজিত হয়েছে।)

এই শান্তি কাউন্সিলের কাজও মোটামুটি মূল শান্তি কমিটির মতই ছিল। দেশের বিভিন্নস্থানে এই কাউন্সিলের নেতৃবৃন্দের অধীনে রাজা-কাররা বাঙ্গালী হত্যা করেছে। তবে সমস্ত মুখ্য রাজনৈতিক দল কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতেই যোগ দেওয়ায় এদের তৎপরতা বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল।

শান্তি কমিটির কয়েকজন প্রধান নেতা

শান্তি কমিটি গঠনের পর্যায়ে পাকিস্তানের সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং অবজার্ভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্সের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী নির্ধারক ভুমিকা পালন করেছিলেন। ৬ এপ্রিল তারিখে টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাতের অব্যবহিত পরে দেওয়া একটি বিবৃতিতে হামিদুল হক চৌধুরী বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানীরা আর যা কিছু চাক না কেন কিছুতেই

মালেক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

১৯৭১ সালের ১৯ জুন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের যে প্রতিনিধিদলটি রাওয়ালপিণ্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করে তারও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন হামিদুল হক চৌধুরী। এছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রামের পুরো ন'মাস তিনি দেশের ভেতরে ও বাইরে পাকবাহিনীর পক্ষে সমর্থন আদায় এবং শান্তি কমিটি সংগঠনের জন্য ভ্রমণ করে বেড়িয়েছেন, এজন্যে পাক সরকারের কাছ থেকে তিনি দৈনিক ভাতাও পেতেন।

স্বাধীনতার অব্যবহিত আগে অন্যান্য মুখ্য দালালের মত হামিদুল হক চৌধুরী দেশত্যাগ করে চলে যান। ১৯৭১ সালে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানী বাহিনীর পরাজয়ের কারণ অনুসন্ধানের জন্য যে তদন্ত কমিশন গঠন করেন হামিদুল হক চৌধুরী তাতে অন্যতম প্রধান সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্য দেন।

'৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর দেশে ফিরে এসে হামিদুল হক চৌধুরী তাঁর বাজেয়াপ্তকৃত সমস্ত সম্পত্তি ফেরত পান।

কুখ্যাত জামাত নেতা গোলাম আজম

স্বাধীন বাংলাদেশে পুনর্বাসিত মানবেতিহাসের জঘন্যতম হত্যাযজ্ঞের হোতা বিশ্বাসঘাতক দালালদের মধ্যে অনিবার্যভাবে সবচেয়ে ঘৃণার্হ ব্যক্তিটি হচ্ছেন জামাতে ইসলামীর অঘোষিত আমির পাকিস্তানী নাগরিক গোলাম আজম। হত্যাযজ্ঞের সেই ভয়াবহ দু'শো ছেষট্টি দিনে তিনি বাংলাদেশ ও তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশে ছুটে বেড়িয়ে অসংখ্যবার যে সমস্ত বক্তৃতা বিবৃতি দিয়েছেন তার পূর্ণ বর্ণনা দিতে হলে একটি বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করতে হবে। স্বীয় নেতৃত্বাধীন জামাতে ইসলামী এবং ইসলামী ছাত্রসংঘ ছাড়াও স্বাধীনতা বিরোধী খুনীদের তিনি যেভাবে বাঙ্গালী নিধনের কাজে সুসংগঠিত করেছিলেন, যোগ্য হাতে তার সাহসী সুচারু গবেষণা হওয়া উচিৎ আমাদের জাতীয় স্বার্থেই। এখানে '৭১ এ তাঁর কর্মকাণ্ড ও বক্তৃতা বিবৃতির উল্লেখযোগ্য কয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা হবে। (দৈনিক বাংলা, পূর্ব ও সংগ্রাম থেকে নেয়া)

৮ এপ্রিল ১৯৭১ সালে জামাতে ইসলামীর প্রচার সম্পাদক মাওলানা নুরুজ্জামান ও জামাতের অপর নেতা গোলাম সারওয়ারের সাথে প্রদত্ত এক যুক্ত বিবৃতিতে তিনি বলেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। ভারতীয় বা পাকিস্তান বিরোধী এজেন্টদের বা অনুপ্রবেশকারীদের যেখানেই দেখা

দেশের ঐক্য বিনষ্ট করতে চায় না। পূর্ব পাকিস্তানীরা কি চায়—একশ বিশদিন পূর্বে একটি জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচন করে পূর্ব পাকিস্তানের সকল বয়স্ক জনসাধারণ তা ঘোষণা করেছেন। ভারতীয় প্রচারণার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করা এবং তার দ্বারা একটি সাবভৌম রাষ্ট্র হিসেবে এদেশের অস্তিত্ব বিলোপ করে নিজস্ব সম্প্রসারণবাদী মনোভাব চরিতার্থ করা। এই উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এবং বিশ্বকে বিভ্রান্ত করার জন্য তারা তাদের সকল প্রচার মাধ্যমের দ্বারা বিশ্ববাসীর নিকট হাজার হাজার নরহত্যা এবং বোমাবর্ষণের ফলে শহর ধ্বংসের ভিত্তিহীন অভিযোগ প্রচার করছে। প্রকৃত প্রস্তাবে ভারতীয় বেতার তার (সময়) সূচীর শতকরা ৫০ ভাগ সময় এই উদ্দেশ্যে নিয়োজিত করেছে। কিন্তু কতদিন যাবত এই মিথ্যার বেসাতী চলবে?'...

'ভারতীয়প্রচারণবিদরা কি করে দাবী করেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় এবং এই ভিত্তিহীন তত্ত্বের ভিত্তিতে কি করে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আর্থিক ও কার্যকরী সমর্থন দিতে শুরু করেছেন? প্রকৃত পক্ষে এই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদীগোষ্ঠি পাকিস্তানের চাইতে ভারতেই বেশী লক্ষ্য করা যাবে।'

বিবৃতিতে হামিদুল হক চৌধুরী আরও বলেন, 'স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার জন্য এই মুহূর্তে চতুর্গুণ অধ্যবসায় নিয়ে কাজে আত্মনিয়োগ করা সকল শ্রেণীর মানুষের কর্তব্য। মার্চের তিন সপ্তাহব্যাপী হরতালে স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টি হয়েছে তা সরিয়ে ফেলতে হবে। প্রত্যেক নাগরিক প্রত্যেক সরকারের কাছে জীবন জীবিকা ও অধিকারের নিরাপত্তা আশা করে। যত শিগগীর সম্ভব বেসামরিক জনপ্রিয় সরকার কায়েমের জন্য উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। এ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে বিবৃতি দিয়েছেন তা অভিনন্দন যোগ্য।'

শান্তি কমিটি গঠণ থেকে শুরু করে স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ দিকে বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার একটি বিরাট অংশ সম্পাদিত হয় হামিদুল হক চৌধুরীর মালিকানাধীন অবজার্ভার পত্রিকা ভবনে, তাঁর নিজস্ব কক্ষটিতে। বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রধান নায়ক মইনুদ্দীন এই প্রতিষ্ঠানেরই একজন কর্মচারী। ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর যখন বেশ কয়েকটি পত্রিকা অফিস ট্যাঙ্ক দিয়ে ধ্বংস করে দেয়া হয়, তখন এই ভবনটি ছিল অক্ষত।

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস তাঁর বাসভবনটিও ছিল উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তাদের মিলনস্থল। এই সামরিক অফিসারদের মধ্যে মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার কাসেম, ব্রিগেডিয়ার সিদ্দিকী, মেজর

বিশৃংখলাপূর্ণ পরিস্থিতি অব্যাহত রাখাই তাদের উদ্দেশ্য। দুষ্কৃতিকারীরা নকশাল-পন্থী ও বামপন্থী শক্তি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে।'

তিনি আরও বলেন, 'জনগণ পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা দানে ইচ্ছুক, কিন্তু জীবন নাশের জন্য দুষ্কৃতকারীরা হুমকী দেওয়ায় তারা এ ব্যাপারে পূর্ণ সাহায্য দান করতে পারছে না। প্রকৃত অপরাধীকে ধরতে পারলেই পরিস্থিতি সম্পূর্ণ করায়ত্ত করা সম্ভব হত।'

ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাতের পর ২০ জুন লাহোর জামাতে ইসলামীর অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'দুষ্কৃতকারীরা এখনো পূর্ব পাকিস্তানে তৎপর রয়েছে এবং তাদের মোকাবিলা করার জন্য জনগণকে অস্ত্র দেওয়া উচিত।'

সাংবাদিক সম্মেলনের আগে জামাত কর্মীদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'দেশকে খণ্ড বিখণ্ডিত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ ছাড়া আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা ছিল না।' তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে সাম্প্রতিক গোলযোগ ১৮৫৭ সালে বাংলায় বিদ্রোহী আন্দোলন দশগুণ বেশী শক্তিশালী ছিল।'

টিক্কা খান ঘোষিত কুখ্যাত পাঠ্যসূচী সংস্কারের সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানিয়ে ৩০ জুলাই প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বাংলাদেশমনা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি বলেন, 'শিক্ষকদের উপরেই সঠিক শিক্ষাদান নির্ভর করছে, শিক্ষকরা পাকিস্তানের আদর্শের খাঁটি বিশ্বাসী না হলে তাদের কাছ থেকে গঠন-মুলক কিছুই আশা করা যায় না।'

১৪ আগস্ট 'আজাদী দিবস' উপলক্ষে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে গোলাম আজম বলেন 'আমাদের আদর্শের প্রতি অপরাধীমূলক চরম বিশ্বাসঘাতকতাই আজকের জাতীয় সংকটাবস্থার আসল কারণ।' পাকিস্তানকে রক্ষার আহ্বান জানিয়ে এই বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে আমরা ধ্বংসপ্রাপ্ত হব এবং যতদিন আমরা বাঁচব, পঙ্গু জাতি হিসেবে বেঁচে থাকব।'

ওই দিন কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি আয়োজিত কার্জন হলের সভায় গোলাম আজমের বক্তব্য ছিল, 'আল্লাহ না করুন, যদি পাকিস্তান না থাকে, তা হলে বাঙ্গালী মুসলমানদের অপমানের মৃত্যু বরণ করতে হবে।' এ সভায় তিনি, 'পাকিস্তানের দুশমনদের মহল্লায় মহল্লায় তন্ন তন্ন করে খুঁজে তাদের অস্তিত্ব বিলোপ করার জন্য দেশপ্রেমিক নাগরিকদের শান্তি কমিটির সাথে সহায়তা করার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি, 'শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের

যাবে, সেখানেই পূর্ব পাকিস্তানের দেশ প্রেমিকরা তাদের নির্মুল করবে।'

৯ এপ্রিল তারিখে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্র থেকে প্রদত্ত বেতার ভাষণে তিনি স্বীয় প্রচেষ্টায় নিজেদের ভাগ্য প্রণয়নের জন্য' জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। এটি সহজবোধ্য ব্যাপার যে, ভাগ্য প্রণয়ন বলতে বাঙ্গালীদের সম্পত্তি লুট করাকে তিনি বুঝিয়েছিলেন। শান্তি কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ ছিল বাঙ্গালীদের হত্যা করে তাদের সম্পত্তি দালালদের মধ্যে বন্টন করে দেয়া। ৫, এলিফেন্ট রোড থেকে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অফিস ২২ এপ্রিল তারিখে সঙ্কীর্ণ গলির মধ্যে গোলাম আজমের বাড়ির দুটি বাড়ির পরে তার চাচা এ, কিউ, এম, শফিকুল ইসলামের বাড়িতে সরিয়ে আনা হয়। সেই থেকে আজও এই গলিটি বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিরোধী চক্রান্তের প্রধান ঘাঁটি। এখানে অফিস সরিয়ে আনার পর কমিটির বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় 'ইতি পূর্বেকার বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী প্রত্যেক দিনই সকাল ৮টা থেকে ১২টা এবং বিকাল ৩টা থেকে ৬টা পর্যন্ত অফিস চলাকালীন সময়ে অফিস থেকে দোকান ও গৃহ বরাদ্দের জন্য ফরম বিলি ও দরখাস্ত পেশের মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে।'

ভারতীয় লোকসভায় বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যদান সংক্রান্ত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা প্রসঙ্গে বেতার ভাষণে তিনি বলেন; 'ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মত দায়িত্বশীল ব্যক্তি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে সমর্থন ও সমবেদনা জানিয়েছেন, তাতে আমি বিস্মিত হয়েছি।'

মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে ভারত প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশপ্রেমের মূলে আঘাত হেনেছে। এ ধরনের অনুপ্রবেশ এ' প্রদেশের কোন কাজেই আসবে না।

১৭ জুন তারিখে রাওয়ালপিণ্ডিতে ইয়াহিয়া খানের সভাপতিত্বে পাকিস্তানের গভর্ণর সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯ জুন টিক্কা খান ঢাকা ফিরে আসার আগে গোলাম আজম ঐই দিন সকালে ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। ইতিপূর্বে ১৮ জুন লাহোর বিমান বন্দরে অবতরনের পর সাংবাদিকদের তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থার আরও উন্নতির জন্য তিনি প্রেসিডেণ্টের কাছে আরও কতকগুলো পরামর্শ পেশ করবেন। তিনি কি ধরনের পরামর্শ প্রদান করবেন, তা উল্লেখ করতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। এখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে তিনি বলেন 'দুষ্কৃতিকারীরা ৷ এখনও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত রয়েছে। ত্রাস সৃষ্টি এব

সাথে পরামর্শ ক্রমেই সরকারের দেশের সংহতির খাতিরে পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে বক্তৃতা শেষ করেন।

এই দিন জমিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়ার ইসলামিক একাডেমী হলের সভায় তিনি বলেন, 'বাংলাদেশ বাঙ্গালীদের দ্বারা শাসিত হবে এই মতবাদ শেখ মুজিব বা শ্রী তাজুদ্দিনের। এ জন্যেই তথাকথিত বাঙ্গালী বীরেরা পশ্চিম বঙ্গে গিয়ে বাংলাদেশ কায়েম করেছে। কিন্তু মুসলমান আল্লাহর হুকুম পালন করার সুযোগ লাভকেই সত্যিকারের আজাদী মনে করে। এ ভিত্তিতে শাসক নিজের দেশের হোক বা বিদেশী হোকে তা মোটেও লক্ষ্যণীয় নয়।'

২৩ আগস্ট লাহোরে জামাতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরার সম্মেলন উপলক্ষে আয়োজিত এক সম্বর্ধনা সভায় গোলাম আজম বলেন, 'জামায়াতে ইসলামীকে যারা অদেশপ্রেমিক দল হিসেবে আখ্যায়িত করেন, তারা হয় এ সত্য জানেন না বা স্বীকার করার মত সৎ সাহস নেই যে, বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিষদাঁত ও নখ ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তান জামাতের বহু সংখ্যক কর্মী দুষ্কৃতকারীদের হাতে প্রাণ দিয়েছেন।'

২৬ আগস্ট পেশোয়ারের সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীদের মীরজাফরী ও ভারতের দুরভিসন্ধি হতে সশস্ত্র বাহিনী দেশকে রক্ষা করেছে। দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের ধ্বংস করার কাজে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ সেনাবাহিনীকে পূর্ণ সহযোগিতা করছে।'

২৯ আগষ্ট করাচীতে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানী জনগণের মনে আস্থার ভাব সৃষ্টি করার জন্য আরও পদক্ষেপ নেওয়া দরকার।'

এই সফরের সময় লাহোরের 'সাপ্তাহিক জিন্দেগী'তে প্রদত্ত সাক্ষাতকারে তিনি প্রশ্ন করেন, '২৫ মার্চের পর পাকিস্তান সেনাবাহিনী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করে তা ছিল এদেশের মাটি রক্ষা করার জন্য, এর আগেই অনুরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল না কি?' জামাত প্রার্থীদের উপনির্বাচনে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, 'আমি আশংকা করছি, যেখানে সেনাবাহিনী ও রাজাকার বাহিনী নেই, সেখানে অংশগ্রহণকারীদের দুষ্কৃতকারীরা হত্যা করবে, তাদের বাড়িঘর লুট করবে ও জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। এ পরিস্থিতি থেকে উপকৃত হয়ে তারা আবার বলতে শুরু করেছে যে, তথাকথিত 'বাংলাদেশ' নাকি শিগগিরই একটি বাস্তব সত্যে পরিণত হবে।

জামাতের মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা সম্পর্কে প্রশ্নকর্তাকে তিনি বলেন,

'বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামাতকে মনে করত পহেলা নম্বরের দুশমন। তারা তালিকা তৈরী করেছে এবং জামাতের লোকদের বেছে বেছে হত্যা করেছে। তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং এখনও দিচ্ছে। এতদসত্ত্বেও জামাত কর্মীরা রাজাকারে দলে দলে ভর্তি হয়ে দেশের প্রতিরক্ষায় বাধ্য, কারণ তারা জানে 'বাংলাদেশে' ইসলাম ও মুসলমানের কোন জায়গা হতে পারে না। জামাত কর্মীরা শহীদ হতে পারে কিন্তু পরিবর্তিত হতে পারে না। আপনি জেনে বিস্মিত হবেন, শান্তি কমিটি সমূহে যোগদানকারী অন্যান্য দেশপ্রেমিক রাজনৈতিক দলের নেতৃস্থানীয় লোকদেরই শুধু হত্যার লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু জামাতের সাধারণ কর্মীদেরও ক্ষমা করা হয় না।' ৩

'আমি চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, কুষ্টিয়া প্রভৃতি স্থানে সফর করেছি। আল্লাহর অপার মহিমায় জামাত কর্মীদের মনোবল অটুট রয়েছে। দুষ্কৃতকারীদের তৎপরতাও অব্যাহত রয়েছে।'

১১ সেপ্টেম্বর মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষে কার্জন হলে ইসলামী ছাত্র সংঘের স্মৃতি প্রদর্শনীতে ইসলামী ছাত্র সংঘকে অভিনন্দন জানিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান আন্দোলনের সময়ের মত আজকে আবার পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য নতুন বাহিনীর প্রয়োজন। ইসলামী ছাত্রসংঘের কর্মী বাহিনীই কায়েদে আজমের মহা দান পাকিস্তানকে চিরস্থায়ী করতে সক্ষম হবে।

ইতিপূর্বে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সফর শেষে দৈনিক সংগ্রামের সাথে এক সাক্ষাৎকারে ৪ মাসের মধ্যে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সংক্রান্ত ইয়াহিয়া খানের ঘোষণা প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করলে 'অক্টোবরের শেষে বন্যার পানি চলে যাবার পর পরই গ্রামাঞ্চলে ব্যাপকভাবে দুষ্কৃতকারীদের দমন করার কাজ শুরু হবে। তাদেরকে পরিপূর্ণভাবে নির্মূল করার পরই নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব। দুষ্কৃতকারী সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না হলে নির্বাচন অনুষ্ঠানে অসুবিধা বৈকি। কারণ দুষ্কৃতকারীদের সম্পূর্ণভাবে নির্মূল না করা পর্যন্ত জনগণ নিরাপদ বোধ করবে না এবং প্রার্থীদেরও নিরাপত্তা সম্ভব নয়।'

এর আগে ১৭ সেপ্টেম্বর গোলাম আজম জামাতের শ্রম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক শফিকুল্লাহ ও তেজগাঁও থানা শান্তি কমিটির লিয়াজো অফিসার মাহবুবুর রহমান গুরহা এবং রাজাকার বাহিনীর কমাণ্ডার ইন-চীফ মোহাম্মদ ইউনুস সহ ঢাকার মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেইনিং কলেজে আলবদর হেড কোয়ার্টার এবং রাজাকার বাহিনীর প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন। প্রশিক্ষণ

---

৩. দৈনিক সংগ্রাম ৮ সেপ্টেম্বর '৭১

গ্রহণরত রাজাকার এবং আলবদরদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দান প্রসঙ্গে তিনি বলেন 'ইসলাম ও পাকিস্তানের দুশমনরা আলেম ওলামা, মাদ্রাসার ছাত্র ও ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে ব্যাপকভাবে হত্যা করে এ কথাই প্রমাণ করেছেন যে, এসব লোককে খতম করলেই পাকিস্তানকে ধ্বংস করা যাবে। আলেম ও দীনদারদের ওপর এই হামলা আল্লাহরই রহমত, কারণ এই হামলা না হলে তারা আত্মরক্ষা ও পাকিস্তানের হেফাজতের জন্য রাজাকার, আলবদর, আল শামস, মুজাহিদ ও পুলিশ বাহিনীতে ভর্তি হবার প্রয়োজন বোধ করত না।'

প্রশিক্ষণরত রাজাকারদের লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'রাজাকার বাহিনী কোন দলের নয়, তারা পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলের সম্পদ। কোন দলের লোক কম বা কোন দলের বেশী লোক রাজাকার বাহিনীতে থাকতে পারে, কিন্তু তোমরা দল মতের উর্দ্ধে উঠে পাকিস্তানে বিশ্বাসী সকল দলকে আপন মনে করবে। ইসলামী দলসমুহের মধ্যে যে ঐক্য সৃষ্টি হয়েছে তাও আল্লাহ্‌রই রহমত। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা জামাতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেনি, এবং তারা ঢালাও ভাবে আলেম ও ইসলামী দলের লোকদের খতম করেছে। সুতরাং আমরা নিজেরা এক না হলেও দুশমনরা সমানভাবে আঘাত হেনে আমাদের এক হতে বাধ্য করেছে। এর পরও যদি কেউ বিভিন্নতা সৃষ্টির পূর্বের অভ্যাস ত্যাগ না করে তবে আল্লাহ স্বয়ং তাদের 'মেরামত' করবেন, তোমরা তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না।'

স্বাধীনতামনা বাঙ্গালীদের প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাইরের শত্রুর চেয়ে ঘরের শত্রু বেশী ক্ষতিকর। আমাদের ঘরেই এখন অসংখ্য শত্রু তৈরী হয়েছে। এই শত্রু সৃষ্টির কারণ যা'ই হোক সে দিকে এখন নজর দেওয়ার সুযোগ নেই। এখন ঘরে আগুন লেগেছে, কাজেই আগুন নেভানোই তোমাদের প্রথম দায়িত্ব। এ' ব্যাপারে সেনাবাহিনী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং রাজাকাররাও তাদের পেছনে এগিয়ে এসেছে।'

স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে পাকিস্তানের খাতিরে এগিয়ে আসার জন্য রাজাকারদের ভূয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'বিপদের মধ্যেও তোমাদের দৃঢ় শপথে অবিচল থাকতে হবে, তবেই আল্লাহর কাছে সত্যিকারের 'মুজাহিদের' মর্যাদা লাভ সম্ভব হবে।'

রাজাকারদের ভালভাবে ট্রেনিং গ্রহণ করে যতশীঘ্র সম্ভব 'আভ্যন্তরীণ শত্রুকে দমন করার কাজে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে পড়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, 'তোমরা অভ্যন্তরীণ দুশমনদের দমন করার কাজে যত তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসতে পারবে, ততই তাড়াতাড়ি সেনাবহিনী দেশকে শত্রমুক্ত করার কাজে ফিরে যেতে পারবে।'

উল্লেখ্য গোলাম আজমের সঙ্গে এই সভায় উপস্থিত রাজাকার প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস আজ জামাতের কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য, কোটিপতি ব্যবসায়ী এবং ইসলামী ব্যাংকের অন্যতম পরিচালক, শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিসার মাহবুবুর রহমান গুরহা জাতীয় পার্টি'র স্থানীয় নেতা এবং পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড চেয়ারম্যান। ১৮ সেপ্টেম্বর গভর্ণর মালেক মন্ত্রীসভার সদস্যদের অভিনন্দন জানিয়ে গোলাম আজম বলেন, 'সশস্ত্র বাহিনীর অভিযানের পর থেকেই কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় শান্তি কমিটিগুলো স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনতে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছে। শান্তি কমিটি এতদিন এ ব্যাপারে যা করতে পেরেছে, মন্ত্রীগণ তার চেয়েও অধিক কাজ করতে পারে বলে আমি আশা করি।'

২ অক্টোবর ঢাকায় প্রাদেশিক জামাতের মজলিশে শূরার বৈঠক উদ্বোধনকালে তিনি বলেন, 'খোদা না খাস্তা, পাকিস্তানকে রক্ষা করতে আমরা যদি ব্যর্থ হই, তবে, আমরা আমাদের নিজেদেরকে এবং আমাদের আদর্শকেও রক্ষা করতে পারব না।' দেশের প্রতিরক্ষায় জামায়াত কর্মী ও সমর্থকদের অংশগ্রহণের পেছনে এই বিশ্বাসই চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করছে। এ কারণেই দেশের শত্রুরা জামায়াত কর্মীদের তাদের শিকারে পরিণত করেছে, কারণ তারা উপলব্ধি করেছে, জামায়াত কর্মীরাই তাদের পথের সবচেয়ে বড় বাধা এবং এসব জামায়াত কর্মীকে খতম করা ব্যতীত তাদের (দুশমনদের) হীন উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত করা সম্ভব হবে না।'

১৬ অক্টোবর বায়তুল মোকাররমে জামাতে ইসলামীর জনসভায় তিনি বলেন, 'জামাতে ইসলামী গোটা দেশে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনার জন্য নিরলস ভাবে শান্তি কমিটির মাধ্যমে কাজ করে যাচ্ছে।'

ইতিমধ্যে বাংলাদেশে রাজাকার, আল বদর ও আল শামস বাহিনীর নৃশংস গণহত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্য নেতৃবৃন্দ, পি পি পির মিয়া মাহমুদ আলী কাসুরী, মওলানা কাওসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ প্রমুখ বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই সমস্ত বাহিনীকে সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে উল্লেখ করে তাঁরা অবিলম্বে এগুলো বিলুপ্তি করার দাবী জানান।

১২ নভেম্বর এ প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে গোলাম আজম 'পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য বামপন্থী দলগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ খণ্ডন না করে বরং তারই (গোলাম আজম) বিরুদ্ধে আল বদর সম্পর্কে বিবৃতি দেওয়ায়' মাহমুদ আলী কাসুরীর সমালোচনা করেন।

এরপর, মুক্তিযোদ্ধারা যখন ঢাকার উপকণ্ঠে এসে পৌঁছেছে, গোলাম আজম এবং জামাতের অন্যান্য মুখ্য নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারেন, পলায়নের সময় হয়েছে। যে নজীরবিহীন নৃশংসতা তাঁরা এতদিন পরিচালনা করে এলেন, তার জন্য তারা যে কখনই ক্ষমা পেতে পারে না, এই বোধ তাদের ছিল। 'পাকিস্তান রক্ষায়' রাজাকার, আল বদর ও আল শামসদের যখন তাদের নেতৃত্ব সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তখন এদেরকে ফেলে তারা প্রাণ নিয়ে পাকিস্তানে চলে যান। জামাতের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহক কমিটির বৈঠকে যোগদানের নামে জামাতের সহকারী প্রধান মওলানা আবদুর রহিম এবং প্রাদেশিক রাজস্ব মন্ত্রী এ, কে, এম ইউসুফকে নিয়ে এ সময় তিনি পাকিস্তানে পালিয়ে যান। পাকিস্তানে যাবার পর সেখান থেকেই গোলাম আজম মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যেতে থাকেন।

এক সমুদ্র রক্তে স্নাত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সূর্য উদিত হবার যখন আর মাত্র কয়েকদিন বাকী, পাকবাহিনী ও দালালরা যখন মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড আঘাত বেসামাল, ইয়াহিয়া খান তখন সারদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে ১৯৭১ সালের ২৩শে নভেম্বর। এই ঘোষণার পর লাহোরে সাংবাদিকদের গোলাম আজম বলেন, বর্তমান মুহূর্তে সর্বাধিক আক্রমনাত্মক ভূমিকা গ্রহণ করাই হবে দেশের জন্য আত্মরক্ষার সর্বোত্তম ব্যবস্থা।'

'পূর্ব পাকিস্তানে' শান্তি রক্ষার উদ্দেশ্যে সকল দেশপ্রেমিক, শান্তি কমিটির সদস্য, রাজাকার এবং আল বদর ও আলশামসদের উন্নতমানের ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রে সজ্জিত করার জন্য গোলাম আজম জোর দাবী জানান।

২৭ নভেম্বর রাওয়ালপিণ্ডিতে এক সমাবেশে বলেন, 'কোন জাতি যুদ্ধকালে প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা ছাড়াই টিকতে পেরেছে, এমন কোন নজীর ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। আত্মরক্ষা নয় আক্রমণই এখন সর্বোত্তম পন্থা।'

৩ ডিসেম্বর করাচীতে পৌঁছে তিনি বলেন, 'পররাষ্ট্র দফতরের ভার কোন পূর্ব পাকিস্তানীকে দিতে হবে, কারণ, এ দফতরের ভারপ্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানীই তথাকথিত 'বাংলাদেশ তামাসা' ভালভাবে মোকাবিলা করতে পারবেন।'

জামাত কর্মী ও অন্যান্য দলের দালালদের দিয়ে রাজাকার আল বদর আল শামস গঠন করে ন' মাস ধরে নির্মম বাঙ্গালী হত্যার নেতৃত্ব দেওয়ার পর 'পৃষ্ঠ' প্রদর্শনের আগে গোলাম আজম স্বাধীনতার ইতিহাসের করুণতম অধ্যায় বুদ্ধিজীবী

হত্যাকাণ্ডেও নিজ ভূমিকাটুকু পালন করে যান। গোলাম আজমের কমাণ্ডের এই অংশটুকুর পরিচয় দেবার জন্য সাপ্তাহিক বিচিত্রার ১৭ এপ্রল ৮১ সংখ্যার 'একাত্তরে ভুল করিনি—গোলাম আজম ও জামাতের রাজনীতি' শীর্ষক আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রচ্ছদ কাহিনীর অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—'অধ্যাপক গোলাম আজম বুদ্ধিজীবী হত্যারও অন্যতম নায়ক। ৭১-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে রাও ফরমান আলীর সাথে এক বৈঠকে অধ্যাপক আজম বুদ্ধিজীবী নিধনের একটা নীল নকশা পেশ করেন। সে নীল নকশা অনুযায়ীই পরবর্তীকালে, অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে বুদ্ধিজীবিদের নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। নীল নকশা প্রণয়নে আবদুল খালেক, ব্যারিষ্টার কোরবান আলী, অধ্যাপক ইউসুফ আলী, আব্বাস আলী খাণ প্রমুখ জামাত নেতারা জড়িত ছিলেন। স্বাধীনতার পর বুদ্ধিজীবী হত্যা সংক্রান্ত যে দলিলপত্র পাওয়া যায় তাতে স্পষ্ট করে নির্দেশ ছিল; পূর্ব পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখা হয়ত সম্ভব হবে না। তবে একটা কাজ করতে হবে, এখানকার বুদ্ধিজীবী· ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, ডাক্তারকে চিরতরে 'শেষ' করে দিতে হবে, যাতে পাকিস্তান হারালেও তারা দেশ চালাতে না পারে। অধ্যাপক আজম এই নীল নকশা বাস্তবায়নের জন্য তার দলীয় ক্যাডার অর্থাৎ আল বদর ও আল শামসকে নির্দেশ দেন। এলাকাও ভাগ করে দেওয়া হয় ১৯৭২ সালের জানুয়ারী মাসে যে কয়জন আল বদর নেতাকে গ্রেফতার করা হয় তাদের কাছ থেকে নীল নকশার বেশ কিছু দলিলপত্র উদ্ধার করা হয়। সে দলিলের একটি অংশ নিম্নরূপ :—নিম্নলিখিত ব্যাক্তিদেরকে ধরে এনে হত্যা করতে হবে। প্রয়োজনে সেনাবাহিনীর সহায়তা নেওয়া যেতে পারে। যদি কেউ আত্মগোপন করে থাকে তাহলে তার পরিবারের কাউকে ধরে এনে এমন অত্যাচার চালাতে হবে যাতে করে পলাতক ব্যাক্তির সন্ধান মেলে।' আরবীতে লেখা একটা নির্দেশনামায় ছিল : 'মনে রাখবেন—দুষ্কৃতকারী যদি দেশে ঢুকে পড়ে তাহলে রেহাই পাবেন না। তাই নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য জীবন বাজী রেখে লড়াই চালিয়ে যান।' নভেম্বর মাসে জামাতে ইসলামীর পক্ষ থেকে এক প্রচার পত্রে বলা হয়েছিল : 'শত্রু আশে পাশেই রয়েছে; তাই খুব সতর্কতার সাথে কাজ চালাতে হবে। আল বদরের এক সমাবেশে জনৈক জামাত নেতা বলেন, আপনারা পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার জন্য কেবল যুদ্ধ করছেন না,—এ যুদ্ধ ইসলামের। নমরুদের হাত থেকে মাতৃভূমিকে রক্ষার জন্য আমাদের আমীরের (গোলাম আজমের) নির্দেশ পালন করুন।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে গোলাম আজমের নেতৃত্বাধীন জামাত ও আল বদর

তথা ইসলামী ছাত্রসংঘের ভূমিকা সম্পর্কে বিচিত্রা যে তথ্য দিয়েছে এর কোন জবাব প্রতিবেদনের প্রতিবাদলিপিতে জামাত নেতারা দিতে পারেন নি। সেপ্টেম্বরে নীল নকশা পেশের পর পরই গোলাম আজম মোহাম্মদপুর ফিজিক্যাল টেনিং কলেজে আল বদর হেড কোয়ার্টার এবং বুদ্ধিজীবীদের বন্দী ও নির্যাতন কেন্দ্রে আল বদর ও রাজাকারদের প্রশিক্ষণ শিবির পরিদর্শন করেন সদলবলে। প্রশিক্ষণরত এই সমস্ত আল বদর ও বাছাই করা রাজাকাররাই পরবর্তীতে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করে। ইতিপূর্বে গোলাম আজম বহুবার বাংলাদেশমনা বুদ্ধিজীবীদের হুশিয়ার করে দিয়েছিলেন।

২৫ সপ্টেম্বরে ঢাকার হোটেল এম্পায়ারে ঢাকা শহর জামায়াত প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় গোলাম আজম বলেন, 'দেশের সাম্প্রতিক সংকট ও দুস্কৃতকারীদের ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের ফলে যেসব পাকিস্তানী প্রাণ হারিয়েছেন তাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী লোকই জামাতে ইসলামীর সাথে জড়িত। জামাতে ইসলামী পাকিস্তান ও ইসলামকে এক ও অভিন্ন মনে করে। পাকিস্তান সারা বিশ্ব মুসলিমের ঘর। কাজেই পাকিস্তান যদি না থাকে, তাহলে জামাত কর্মীরা দুনিয়ায় বেঁচে থাকার কোন স্বার্থকতা মনে করে না। তাই জামাতের কর্মীরা জীবন বিপন্ন করে পাকিস্তানের অস্তিত্ব ও অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করে যাচ্ছে। শান্তি কমিটির মাধ্যমে, রাজাকার ও আল বদরে লোক পাঠিয়ে এবং অন্যান্য উপায়ে জনসাধারণের মনে আস্থা ও নিরাপত্তাবোধ সৃষ্টির কাজ করে যাচ্ছে এবং একই উদ্দেশ্যে দুজন সিনিয়র নেতাকে মন্ত্রীত্ব গ্রহণে বাধ্য করেছে। এই মন্ত্রীরা যেন জনগণের মনে আস্থা ফিরিয়ে আনতে সব কিছু করেন।' প্রত্যুত্তরে আব্বাস আলী খান দলীয় প্রধানের নির্দেশ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বলেন, 'প্রতিটি কারবালার পরই ইসলাম জীবন্ত হয়ে ওঠে। আমাদের সামনে আরও কারবালা আছে। তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এই অগ্নিপরীক্ষায় দমে না গিয়ে নতুন করে উদ্দীপনা নিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে শান্তি ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে কাজ করতে হবে।'

জামাতের আব্বাস আলী খান

শান্তি কমিটির অন্যতম প্রধান সংগঠক জামাতে ইসলামীর বর্তমান ভারপ্রাপ্ত আমীর মওলানা আববাস আলী খান স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় মুলতঃ রাজাকার বাহিনীর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতেন।

২৫ জুনের পূর্বদেশ পত্রিকার একটি সংবাদে বলা হয় বগুড়া জেলার জয়পুরহাট মহকুমায় জনাব আব্বাস আলীর নেতৃত্বে পনের সদস্য বিশিষ্ট শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে এছাড়া মহকুমার সকল ইউনিয়নে অনুরূপ শান্তি কমিটি রয়েছে বলে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

১৪ আগস্ট 'আজাদী দিবসে' জয়পুরহাটে রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীর সম্মিলিত কুচকাওয়াজে সভাপতির ভাসণে তিনি বলেন, রাজাকাররা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে ধ্বংস করে দিতে জান কোরবান করতে বদ্ধপরিকর।'

২২ সেপ্টেম্বর, মালেক মন্ত্রীসভার জামাতী সদস্যদের দেওয়া আলীয়া মাদ্রাসার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন হবে যা বিজ্ঞানী, দার্শনিক, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, অর্থনীতিবিদ ও একই সাথে খাঁটি মুসলমান হিসেবে তৈরী করবে, এর অন্যথা আমরা মেনে নেব না।'

২৪ সেপ্টেম্বর তেজগাঁ থানা শান্তি কমিটি প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় থানা শান্তি কমিটি প্রধান মাহবুবুর রহমান গুরহা গঠিত মানপত্রের জবাবে বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদের শ্লোগানে বাঙ্গালীদের কি ফায়দা হয়েছে? পাকিস্তানকে অস্ত্রবলে ধ্বংশ করার তাদের ঘৃণ্য চরদের মধ্যে আঞ্চলিক ও ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার শ্লোগান তুলেছে। এই সংকট মুহূর্তে প্রত্যেকটি পাকিস্তানী নাগরিককে পাকিস্তানী ও মুসলমান হিসেবে চিন্তা করতে হবে।' স্বাধীনতামনা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ইঙ্গিত করে এই সভায় তিনি বলেন, 'সামাজিক' অর্থনৈতিক ও আবাসিক পূনর্বাসনের যেমন প্রয়োজন তেমনি আজ প্রয়োজন মানসিক পুনর্বাসনের।'

১০ অক্টোবর বগুড়া জেলা শান্তি কমিটি ও জামাতে ইসলামী প্রদত্ত সম্বর্ধনার জবাবে আব্বাস আলী 'পাকিস্থানের মাটি থেকে দুস্কৃতকারী ও ভারতীয় চরদের সম্পূর্ণভাবে উৎখাতের কাজে সহযোগিতা করার জন্য' সমবেত রাজাকারদের আহ্বান জানান।

১১ অক্টোবর ঢাকা বেতারে ছাত্রদের উদ্দেশে এক ভাষণে তিনি বলেন, 'পাঠ্যাভাসের সাথে সাথে তোমাদের এ চেতনাটি সদাজাগ্রত রাখতে হবে যে, যে কোন অবস্থায় তোমরা পূর্বাসূরী ছাত্রদের আমানত এ পাকিস্তানের হেফাজত করবে এবং কিছুতেই তার খেয়ানত হতে দেবে না।'

৮ নভেম্বর লাহরে তিনি জামাতে ইসলামীর সম্বর্ধনা সভায় বলেন, 'ভারত যদি আমাদের যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তবে আমরা কোলকাতা ও দিল্লিতে

ঈদের নামাজ পড়ব। পূর্ব পাকিস্তানের রাজাকার বাহিনী ও আলবদর বাহিনী প্রমাণ করে দিয়েছে যে মুসলমান মৃত্যুকে ভয় করে না বরং আল্লাহ্‌কে ভয় করে।'

১৬ নভেম্বর চাদপুরের শান্তি কমিটির সভায় আব্বাস আলী খান শান্তি কমিটির সদস্য ও রাজাকারদের ভূয়সী প্রশংসা করে বলেন, 'পাকিস্তান চির অক্ষয় হয়ে টিকে থাকবেই। এর শত্রুদের সমূলে চিরতরে ধ্বংস করা আপনাদের দায়িত্ব।'

পাকবাহিনীর চূড়ান্ত পরাজয়ের প্রাকলগ্নে ২৫ নভেম্বর এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'এতে আর কোন সন্দেহই নাই যে, তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানকে গ্রাস করার হীন মতলবে ভারতীয় সেনাবাহিনী কয়েকটি ফ্রন্টে নির্লজ্জ হামলা শুরু করেছে। সশস্ত্র বাহিনী একাই কোন যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারে না। প্রিয় পাকিস্থানের মর্যাদা রক্ষার জন্য আমাদের জওয়ানদের হাতকে শক্তিশালী করা এ সময়ে প্রতিটি নাগরিকের দায়িত্ব।' স্বাধীনতামনা বুদ্ধিজীবী ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে বিবৃতেতে তিনি বলেন, 'রাষ্ট্র বিরোধী ও ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের কার্যকলাপের ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক থাকতে হবে। এদেরকে নির্মূল করার ব্যাপারে আপনারা সেনাবাহিনী ও শান্তি কমিটি সমূহকে সহায়তা করুন।'

বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার মাত্র ৪ দিন আগে ৬ ডিসেম্বর ঢাকা বেতার কেন্দ্র থেকে এক ভাষণে আব্বাস আলী খান বলেন, 'বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল মাত্র ৩১৩ জন। বিপক্ষ কুরাইশদের সংখ্যা ছিল ১ হাজার।...তেরো কোটি মানুষ এই পুণ্যভূমি রক্ষার জন্য প্রতি মুহূর্তে প্রস্তুত আছে।... গুজব রটনাকারী, বিশৃংখলা সৃষ্টিকারী, হিন্দুস্থান অথবা কল্পনা রাজ্যের তথাকথিত বাংলাদেশের সপক্ষে প্রচারনাকারীরা আমাদের দুশমন। তাদের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখুন। প্রথম সুযোগেই তাদের বিষদাঁত ভেঙ্গে দিন। আমাদের রাজাকার, বদর, সামশ, প্রভৃতি বাহিনীগুলির সাথে কাঁদে কাদ মিলিয়ে দেশরক্ষার কাজে নেমে পরুন।... আল্লাহ্‌তায়ালা আমাদের মদত করুন। আমিণ আল্লাহু আকবার। পাকিস্তান পায়েন্দাবাদ।'

ঘাতক আব্বাস আলী খান যে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় নিজ তৎপরতায় বিন্দুমাত্র অনুতপ্ত নন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭৬ সালে প্রকাশিত তার আত্মজীবনী 'স্মৃতি সাগরের ঢেউ' পড়লে। গ্রন্থের ভূমিকার প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি লিখেছেন—'দুর্ভাগ্যই, বলুন আর সৌভাগ্যই, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের

সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে ছ'শ উনআশি দিন কাটিয়েছিলুম। এটাকে আমি আলবৎ সৌভাগ্যই বলব। সুধীজন তা অবশ্যি বুঝে ফেলবেন।' [তিনি কিন্তু কোথাও উল্লেখ করেন নি কেন তাকে জেলে নেওয়া হয়েছিল]।

তারপর লিখেছিল—'সারা দেশে তখন রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলছে। ঢাকা পতনোম্মুখ। দিবালোকে রাশিয়ান মিগ-২১ এর উপর্যুপরি হামলায় ঢাকা বাসীদের এক প্রাণান্তকর অবস্থা।' তিনি বোঝাতে চেয়েছেন এর আগে ঢাকাবাসীরা বেশ প্রাণবন্ত অবস্থায় ছিল।

আরো লিখেছেন—'বহু অনুরোধ সত্ত্বেও আমাদেরকে আর ঘরে ফিরে যেতে দেয়া হলো না। প্রত্যেকের ঘরে ছেলেপুলে মায়ের কোলে নির্বিঘ্নে ঘুমুচ্ছে। পুরুষ মানুষ বলতে কারো ঘরে কেউ নেই। আমাদেরকে যেন টোপ দিয়ে ডেকে এনে বেঁধে ফেলা হলো। এমনটি অতীতে কাউকে করা হয়েছে বলে জানা নেই।' অথচ আব্বাস আলীরা জেলের আশ্রয়ে নিশ্চিন্তে ছিলেন। কারণ তিনি নিজেই লিখেছেন—'আমাদের সুখ সুবিধের জন্যে রেডক্রসের কর্মচারীগণ অত্যন্ত ব্যস্ত ও তৎপর।'

রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা মওলানা ইউসুফ

জামাতের বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মওলানা এ, কে, এম, ইউসুফের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি রাজাকার বাহিনীর প্রতিষ্টাতা। '৭১ এর মে মাসে খুলনার খান জাহান আলী রোডের একটি আনসার ক্যাম্পে ৯৬ জন জামাত কর্মী সমন্বয়ে তিনি সর্ব প্রথম রাজাকার বাহিনী গড়ে তোলেন। এই বাহিনীর নামকরণও করেছিলেন তিনি।

মালেক মন্ত্রীসভায় সদস্য পদ লাভের পর আলীয়া মদ্রাসার সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেন, 'আমাদের শত্রুরা আমাদের সকল ভাষাভাষী ও সকল অঞ্চলের মুসলমানদের এক জাতি মনে করেই আঘাত হানে। আর শত্রুদেরকেও আমরা যতই বন্ধু মনে করি না কেন, শত্রুরা আমাদের শত্রুই মনে করে।'

১০ অক্টোবর খুলনার জনসভায় ভাষণদানকালে শান্তি কমিটি রাজাকারদের ভুয়সী প্রশংসা করে তিনি বলেন, 'প্রত্যন্ত অঞ্চলে সফর করে জনগণকে ভারত কর্তৃক সৃষ্ট তথাকথিত 'বাংলাদেশে'র অসারতা বোঝাতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী, দুস্কৃতকারী এবং নকশালীরা দেশের এই অংশে বিপর্যয় সৃষ্টিতে তৎপর রয়েছে, আপনাদের তাদেরকে সমুলে উৎখাত করতে হবে।'

১২ অক্টোবর খুলনায় শান্তি কমিটি ও চাষী কল্যাণ সমিতির সম্বর্ধনা সভায় তিনি বলেন, 'নদীপথে চলাচল নির্বিঘ্নে করার জন্য রাজাকার নিয়োগের বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে।' কোরানের আয়াত উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, 'যারা মানুষের শান্তির ব্যাঘাত ঘটায় আল্লাহ্ তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছেন।'

২৬ অক্টোবর সিলেটের জনসভায় মওলানা ইউসুফ বলেন, 'পাকিস্তান সৃষ্টির ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ আমাদের কিছু সংখ্যক তরুণ ভারতীয় মিথ্যা প্রচারণায় বিভ্রান্ত হয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে ওপার গিয়েছে এবং ভারতীয় চরদের যোগ-সাজসে আমাদের ভু-খণ্ডের অভ্যান্তরে ঘৃণ্য নাশকতামূলক তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। এসব নাশকতামূলক কার্যকলাপ সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে আমাদের ভু-খণ্ড থেকে বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদকে সমুলে উৎখাত করতে আপনারা গ্রামে-গঞ্জে আনাচে কানাচে ছড়িয়ে পড়ুন।' মিত্রবাহিনীকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে মওলানা ইউসুফ বলেন, 'আমাদের ওপর যদি কোন যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তবে বীর সেনাবাহিনী ও বীর রাজাকাররা অবশ্যই তার পাল্টা আঘাত করবে।'

৯ নভেম্বর ঝিনাইদহতে আলবদরদের সভায় ভাষণদান প্রসঙ্গে তিনি আল বদরদের 'ঘরের শত্রু সম্পর্কে সাবধান' করে দেন।

১২ নভেম্বর সাতক্ষীরার রাজাকার শিবির পরিদর্শনকালে এ, কে, এম ইউসুফ রাজাকারদের 'ভুয়সী প্রশংসা করেন। 'ভারতীয় চর ও অনুপ্রবেশকারীদের নির্মুল করার কাজ সাতক্ষীরার রাজাকাররা মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছে' বলে উল্লেখ করে তিনি আশ্বাস দেন যে রাজাকারদের চাকুরীর ব্যবস্থা করা হবে।

২৮ নভেম্বর করাচীতে সাংবাদিকদের সাথে আলোচনাকালে এ, কে, এম ইউসুফ বলেন, 'রাজাকাররা আমাদের বীর সেনাবাহিনীর সাথে কাঁধে কাধ মিলিয়ে ভারতীয় হামলার মোকাবিলা করছেন।' তিনি দুস্কৃতকারীদের দমনের জন্য রাজাকারদের হাতে আরও আধুনিক অস্ত্র-শস্ত্র দেবার দাবী জানান। তিনি বলেন, 'বর্তমানে আলবদর ও আল্‌শামস বাহিনীর সদস্যসংখ্যা প্রায় একলাখে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া মুজাহিদ বাহিনীও তো রয়েছে। এরা সকলেই আমাদের সেনাবাহিনীর সহায়তায় সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। দুস্কৃতকারী দমনে রাজাকাররা বিশেষ সাফল্যের পরিচয় দিচ্ছে এবং এ' জন্যেই বর্তমানে দুস্কৃতকারীদের কার্যকলাপে ভাটা পড়েছে।'

৪ ডিসেম্বর মওলানা ইউসুভ ঢাকায় বলেন, 'সশস্ত্রবাহিনীর সাথে জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা অপরিহার্য। আমাদেরকে রক্তের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত শত্রুর

বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে হবে।'

৯ ডিসেম্বর ঢাকা কালেক্টরেট বিল্ডিংয়ে ঢাকা শহর শান্তি কমিটির সদস্য ও কর্মচারীদের এক সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে এ, কে, এম, ইউসুফ 'গুজব ও গুজব রটনাকারীদের কথায় বিশ্বাস না করে মাতৃভুমিকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার' আবেদন জানান। তিনি আরও বলেন, 'বর্তমানে আমাদের সকল বিভেদ ভুলে গিয়ে শত্রুকে বিধ্বংস করে দেবার জন্য এক কাতারে দাঁড়াতে হবে।' বিমান আক্রমণের সময় ঢাকা শহরের জনগণ যে অসম সাহসিকতা প্রদর্শন করেছেন তার জন্য তিনি তাদের ভুয়সী প্রশংসা করেন এবং শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার জন্য তাদেরকে স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতার আহ্বান জানান।

বিমান আক্রমনের অজুহাতে ঢাকায় বেলা দুটো থেকে সারারাত কর্ফু জারী করে এবং ব্ল্যাকআউট করে যখন মানবজাতির লিখিত ইতিহাসের সবচাইতে জঘন্য হত্যাকাণ্ডের জন্য জামাতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের আল বদর নামধারী উম্মাদরা দেশের শ্রেষ্ঠ বুদ্ধিজীবিদের ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন তাদের প্রশংসা করে মওলানা ইউসুফ পৃষ্ঠ প্রদর্শনের প্রস্তুতি নেন। ১১ ডিসেম্বর মালেক সরকার নিজেদের গা বাঁচানোর জন্য হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল এবং হলিফ্যামিলি হাসপাতালকে নিরপেক্ষ জোন হিসেবে ঘোষণা করে এখানে আশ্রয় গ্রহণকারী লোকদের অনিষ্ট করা জেনেভা কনভেনষনের পরিপন্থি হবে বলে যুদ্ধরত উভয় পক্ষকে স্মরণ করিয়ে দেন। 'বীর রাজাকার[4] 'বীর আল বদর' এবং 'বীর আল শামসদের নিশ্চিত ধ্বংসের মুখে ছেড়ে দিয়ে ১৪ তারিখ মালেক মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে এবং এই দুই নিরপেক্ষ জোনে আশ্রয় নেয়। পরবর্তীতে হোটেল ইন্টারকন কর্তৃপক্ষ এই বীর দলপতিদের বিরুদ্ধে হোটেলের বিল পরিশোধ না করার জন্য মামলা দায়ের করার উদ্যোগ নিয়েছিল।

জামাতে ইসলামীর অকল্পনীয় নৃশংসতা

জামাতে ইসলামী বিশেষতঃ এর তৎকালীন ছাত্রসংগঠন ইসলামী ছাত্র সংঘ যা আলবদর নাম গ্রহণ করে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা করেছিল, তাদের নিষ্ঠুরতার তুলনা সারা পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই আছে। বধ্যভূমীগুলোর ছবিগুলো দেখলে এবং বর্ণনা পড়লে মনে হয়, সে সময় এরা মানসিক সুস্থতা হারিয়ে উম্মাদ হয়ে গিয়েছিল। তাদের সেই বর্বরতার বিবরণ সুস্থ মানুষের না পড়াই উচিত, কারণ তাতে যে কোন স্বাভাবিক ব্যক্তি নিজেকে মানুষ হিসেবে চিন্তা করতে ঘৃণা

বোধ করবে। একারণে এই গ্রন্থেও তার বিশদ বর্ণনা দেওয়া হল না, তবে তাদের নিষ্ঠুরতার নমুনা প্রদর্শনের জন্য সে সময়কার সংবাদপত্র থেকে কয়েকটি প্রতিবেদন এখানে পত্রস্থ হল।

সেপ্টেম্বর মাসের ১৭ তারিখে রাজাকার বাহিনী প্রধান ও শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিসারকে নিয়ে গোলাম আজম মোহাম্মদপুরে ফিজিক্যাল ট্রেনিং সেণ্টারে যে রাজাকার ও আলবদর শিবির পরিদর্শন করেছিলেন, সেটি ছিল আল বদরদের হেডকোয়ার্টার। স্বাধীনতামনা বুদ্ধিজীবীদের বেশীরভাগকে আল বদররা প্রথমে চোখ বেঁধে এখানেই নিয়ে আসে। নির্যাতনের পরে এখান থেকেই তাঁদেরকে রায়ের বাজার ও মীরপুরের শিয়ালবাড়িসহ অন্যান্য বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে হত্যা করা হয়। এই নির্যাতন কেন্দ্রে বন্দী ছিলেন ঢাকার গ্রীণল্যাণ্ড মার্কেণ্টাইল কোম্পানী লিমিটেডের চীফ একাউনটেণ্ট মোহাম্মদ দেলওয়ার হোসেন। একমাত্র তিনিই রায়ের বাজার বিলের বধ্যভূমি থেকে প্রাণ নিয়ে পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিলেন। ৭১ সালের ২৯ ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'বধ্যভূমির অভিজ্ঞতা' শীর্ষক তাঁর জবানীটি এখানে হুবহু উদ্ধৃত করা হল:

'১৪ ডিসেম্বর সকাল নয়টা। শান্তিবাগে আমার বাসায় আমি শুয়েছিলাম। হঠাৎ বাইরে ভারী পায়ের শব্দ পেলাম। বেড়ার ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে দেখি কয়েকজন রাইফেলধারী লোক আসছে। রাস্তার দরজায় এসে তারা জোরে জোরে ধাক্কা দিতে লাগল। কর্কশ স্বরে তারা বলছিল—'ঘরে কে আছ, দরজা খোল।'

'তারপর নানা কথাবার্তার পর তারা আমাকে ঘর থেকে বের করে নিয়ে গেল। বাসার পাশের একটি ছেলেকেও তারা ধরে নিয়ে এলো। আমাদের তারা মালিবাগের মোড়ে দাঁড় করানো একটি বাসে নিয়ে তুললো। বাসে তুলেই তারা আমার গায়ের জামা খুলে ফেললো এবং একটি কাপড় দিয়ে কষে চোখ বেঁধে ফেললো। এছাড়া হাত দুটো নিয়েও পেছনের দিকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। তারপর বাস ছেড়ে দিলো। পথে আরও কয়েক জায়গায়ও তারা বাসটি থামালো। মনে হলো আরও কিছু লোককে বাসে ওঠানো হচ্ছে। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলাম না যে, আমরা কোথায় যাচ্ছি। অনুমানে মনে হল, বাসটি মোহাম্মদপুর, দ্বিতীয় রাজধানী বা ক্যাণ্টনমেণ্টের দিকে যাচ্ছে।

'এমনিভাবে ঘণ্টাখানেক চলার পর বাস এক জায়গায় এসে থামলো। তারপর আমাদের হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো। ততক্ষণে কথাবার্তায় আমি টের পেয়েছি যে, আমি বদর বাহিনীর হাতে পড়েছি।

খানিক্ষণ পর আমাকে ও অপর আরেকজনকে সিঁড়ি দিয়ে নিয়ে এলো উপর তলায়। দরজা খুলে একটি রুমের মধ্যে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিল। হুমড়ি খেয়ে পড়লাম মেঝের ওপর। ঠিক পাকা মেঝের ওপর নয়। গিয়ে পড়লাম কিছু লোকের ওপর। অনেক কষ্টে সোজা হয়ে বসলাম। আমি ঠিক বুঝতে পারছিলামনা, কক্ষের আর সব লোকেরও আমার মতো হাত ও চোখ বাঁধা কি'না, শুধু বুঝতে পারছিলাম আমার মতো আরো বেশ কয়েকজন লোক রয়েছে। এদিকে কষে বাঁধার দরুণ আমার চোখ ও কানে দারুণ যন্ত্রণা হচ্ছে। আমি যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে কাঁদতে শুরু করেছি। মাথায় শুধু একটি চিন্তা—কি করে এই বর্বর পশুদের হাত থেকে আমি বাঁচতে পারি। আমি কি সত্যি বাঁচতে পারবো?

'আল্লা আল্লা বলে, আমি উচ্চস্বরে কাঁদতে লাগলাম। ভাবছিলাম বদরবাহিনীর লোকরা তো শুনেছি মাদ্রাসা ও ইসলামী ছাত্র শিক্ষা লাইনের ছেলে। আমার আহাজারিতে যদি বদরবাহীনীর লোকদের কিছু দয়া হয়। যদি দয়া পরবশ হয়ে চোখের ও হাতের বাঁধন একটু খুলে দেয়। নিদেনপক্ষে ইকটু ঢিলে করে দেয়। অনেক্ষণ কাঁদার পর কে যেন আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল। ফিস ফিস করে সে বললো—'সাবধান'। হাত খোলা দেখলে কিন্তু আপনাকে পিটিয়ে মেরে ফেলবে।' কচি কণ্ঠ। বুঝলাম অল্প বয়সী কোন ছেলে এবং সে বদর বাহিনীর কেউ নয়। আমি তাড়াতাড়ি চোখের বাঁধন ঢিলে করে দিলাম। বাঁধন এমনিভাবে রাখলাম, যাতে—আবছা আবছা দেখা যায়। এর মধ্যেই দেখে নিয়েছি, যে আমার হাতের বাঁধন খুলে দিল সে আট নয় বছর বয়সী একটি ছেলে। তার দুহাতের চামড়া কাটা। হাত ফোলা। সারা কক্ষে শুধু রক্ত আর রক্ত। এখানে সেখনে ইতস্তত ভাবে ছড়িয়ে রয়েছে রক্তে রঞ্জিত জামা ও গেঞ্জি। আমার মতো প্রত্যেকের গায়েই গেঞ্জি। আমার মত প্রত্যেকের গায়েই গেঞ্জি। তাদের দেহের বিভিন্ন অংশে কাটা ছেঁড়ারার দাগ। হাতের বা পায়ের আঙ্গুল কাটা, কারো দেহে দীর্ঘ ও গভীর ক্ষত, কারো হাত পায়ের নখ বপড়ে ফেলা হয়েছে।

ছেলেটিই আমার হাতে আবার কাপড় জড়িয়ে বাঁধনের মত করে দিল। আমি ভাবছিলাম—আমি কি করে এই জল্লাদের হাত থেকে বাঁচব। কক্ষটিতে শুধু একটি কাঁচের জানালা, তহে মনে হল বেশ মজবুত। এল টাইপের ত্রিতল অথবা চারতলা বাড়ি। বিরাট এলাকা দেয়াল দিয়ে ঘেরা। বাড়িটি সম্ভবতঃ মোহাম্মপুরের নিকটবর্তী এলাকায় কোথাও হবে।

'এমনিভাবে সারাদিন কেটে গেল। সন্ধ্যার দিকে বদরবাহিনী বা রাজাকারের

দলের লোকজন আরও কিছু লোককে ধরে নিয়ে এল। সন্ধ্যার পর তিন চারজন লোক আমাদের কক্ষে এল জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য। এক এক করে সবাইকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করল। শুনলাম, কেউ বলছে—আমি থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক কেউ বলল—আমি ডাক্তার, আমি সাংবাদিক, আমি চীফ একাউনটেন্ট, আমি কম্বাইণ্ড মিলিটারী হাসপাতালের সার্জনের ছেলে। লোকগুলোর একজন বলে উঠলো, 'শালারা সব ইণ্ডিয়ান স্পাই।' একজন আবার বলল,—'শালা' তুমি ইউনিভার্সিটির প্রফেসর হয়ে এদ্দিন মন্ত্র পড়িয়েছ, আজ আমি তোমাকে পড়াব। তুমি তো গভর্ণমেণ্ট অফিসার, সরকারের টাকা খেয়েছ আর গাদ্দারী করেছ। এবার টের পাবে।

'জিজ্ঞাসাবাদেরপর শুরু হল প্রহার, এমনি ধুম ধাম মার দেওয়া শুরু হল যেন নিশ্বাস ফেলার ও জো নেই। সবাই চিৎকার করে কাঁদছে। কেউ জোরে জোরে দোয়া দরূদ পরছে, আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাচ্ছে, কিন্তু পশুগুলোর সেদিকে ভ্রুক্ষেপও নেই। মারধোর করে প্রায় আধ ঘণ্টা পরে লোকগুলো চলে গেল। মার খেয়ে অনেকেই অচেতন হয়ে পড়েছে। রাত তখন অনুমান দশটা। এক অধ্যাপক সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ালেন। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে তিনি বললেন,—ভাই আপনার হাত কি খোলা? আমার হাতের বাঁধনটা একটু ঢিলে করে দেন, লুঙ্গিটা হাঁটু থেকে নিচে নামিয়ে দেন, খানিক পরে কোন ক্রমে দেয়াল ঘেঁষে বসে তিনি আচ্ছন্ন অচৈতন্য হয়ে পড়লেন।

'রাত দশটা থেকে অনুমান একটা পর্যন্ত বেশ কয়েকবার বদর বাহিনীর জল্লাদেরা এসে আমাদের খানিক পর পর দেখে গেল। রাত প্রায় সারে ১২ টায় আমাদের উপরতলা থেকে কয়েকজন মহিলার আর্তনাদ ভেসে এল। সেই আর্তনাদের বর্ণনা দেয়া আমার পক্ষে দুঃসাধ্য। মাঝে মাঝে রাস্তায় গাড়ির শব্দ শুনতে পেলাম। মারের চোটে প্রায় সবাই অচেতন হয়ে পড়ে রয়েছে। আমি জ্ঞান হারাই নি। আল্লাহ্‌কে ডেকে যাচ্ছি—শেষবারের মতো আল্লাহ্‌র কাছে আমার যদি গুনাহ হয়ে থাকে তার জন্য পানাহ্ চাইছি।

'রাত প্রায় একটার সময় পাশের ঘরে রাইফেলের গুলি লোড করার শব্দ এবং লোকজনের ফিস ফিস করে আলাপের শব্দ শুনতে পেলাম। সারা শরীরে আমার ভয়ের হিম স্রোত চকিতে ভরে উটলো। খানিক পর একটা লোক এসে আবার আমাদের ঘরে ঢুকলো। তারাই আমাদের ঘরের বাইরে নিয়ে এল।

'এরপর বদরবাহিনীর একেকটি পশু আমাদের দুজন দুজন করে ধরে সিড়ি দিয়ে নীচে নামিয়ে আনল। তিনটি বাসে তারা আমাদের সবাইকে নিয়ে তুলল। তাদের হাব-ভাব. ফিস-ফিস করে কথাবার্তা শুনে মনে হল—আর রক্ষা নেই। বাস ছেড়ে দিল, বাসের সবকটি জানালা উঠানো। বুঝতে পারলাম, আমাদের কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিছুক্ষণ পর বাস এসে থামল কতকগুলো ঘরের পাশে। ঘরের দরজা বেশ বড় বড় এবং কোনাকুনি লাঠি দিয়ে আটকানো। কিন্তু তারা আমাদেরকে ঘরে না ঢুকিয়ে ধরে নিয়ে চলল। কৌশলে চোখের বাঁধন আলগা রাখার সুযোগ হলো বলে দেখতে পেলাম সামনে বিরাট এক বটগাছ, তার সমুখে একটা বিরাট বিল; মাঝে মাঝে কোথাও পুকুরের মত রয়েছে। বট-গাছের আরো কাছে গিয়ে দেখতে পেলাম ১২০ থেকে ১৪০ জন লোককে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এর মাঝে এক ফাঁকে সুযোগ বুঝে আমি আমার পরণের লুঙ্গি হাঁটুর ওপর উঠিয়ে রেখেছি। চোখ বাঁধা অবস্থায়ও যে আমি দেখতে পাচ্ছি তা বদরবাহিনীর লোকেরা বুঝতে পারেনি। বদরবাহিনীর লোকজানর হাবভাব স্থিরনিশ্চিত হলাম, আমাদের হত্যা করার জন্য এখানে নিয়ে এসেছে। আমি তখন আমার সমগ্র চেতনা কেন্দ্রীভূত করে ভাবছি—কি করে বাঁচা যায়।

দেখতে পেলাম—বদরবাহিনীর পশুরা আমার সামনের লোকদের হাত দড়ি দিয়ে বাঁধছে। আমাদের মত বন্দী একজন চিৎকার করে বলে উঠলেন—'আপনারা বাঙালী হয়ে আমাদের মারছেন। কোন পাঞ্জাবী যদি মারত তাহলেও না হয় বুঝতাম, কেন আমাদেরকে হত্যা করতে যাচ্ছেন? আমরা কি অন্যায় করেছি?' ভদ্রলোকের গায়ে রাইফেলের এক ঘা দিয়ে বদরবাহিনীর এক জল্লাদ গর্জে উঠল' 'চুপ কর শালা।' কে যেন একজন বলে উঠলো—'আমাকে ছেড়ে দিন, দশ হাজার টাকা দেব।' কোন একজন মহিলা চিৎকার করে বলে উঠলেন—'আপনারা আমার বাপ, ভাই। আমাকে মারবেন না।' চারিদিকে মাতম, আহাজারি, তা বর্ণনার ভাষা আমার নেই। সামনের লোকদের দলে দলে ভাগ করে তারা সামনের ফাঁকা মাঠে নিয়ে যাওয়া শুরু করল। আমার সারা শরীর যেন ভয়ে জমে যাচ্ছে। কিন্তু এরই মধ্যে আমি বাঁচার আশায় পালাবার সম্ভাব্য সব উপায় ভাবতে শুরু করে দিয়েছি। মনে হচ্ছে—কোন উপায় আর নেই।

'আবার মনে হচ্ছে—বাঁচার কি কোন উপায় নেই; জল্লাদদের একজন আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমার পেছনের লোকের গেঞ্জির সাথে আমার গেঞ্জি সে ভাল করে বেঁধে দিল হঠাৎ সে সময় পেছনের লোকটি বলে উঠল—আজিজ ভাই: তুমি! তুমি আমাকে মারতে নিয়ে এসেছ। তুমি থাকতে মেরে ফেলবে।

আপসোস · রাইফেলধারী লোকটি কোন কথা না বলে চলে গেলো।

'বেয়নেট দিয়ে জল্লাদের দল তাদের হত্যালীলা শুরু করে দিয়েছে, ছুঁড়ছে গুলী।—চারিদিকে আর্তচিৎকার, মাঝে মাঝে জল্লাদের দলের কেউ কেউ চিৎকার করে বলে উঠছে—শালাদের খতম করে ফেল। সব ব্যাটাদের খতম করে ফেলবো। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে আর্ত চিৎকারের সাথে পৈশাচিক হাসি। এমন নারকীয় তাণ্ডবলীলার মধ্যে আমি জীবনপণ করে আমার হাতের বাঁধন খুলে ফেললাম। আমার সম্মুখের প্রায় তিনশজনকে ততক্ষণে সামনের ফাঁকা মাঠের মধ্যে নিয়ে খতম করে ফেলেছে বদরবাহিনীর পশুরা। ত্রস্তহস্তে আমি গেঞ্জির গিঁট খুলে ফেললাম। (বামহাতের দড়ির বাঁধন খুলে দড়িটা হাতের নীচে চাপা দিয়ে রাখলাম)। হাত আমার পেছনে দিয়ে রাখলাম। বদরবাহিনীর এক দস্যু আমার সামনের কয়েকজন লোক নিয়ে তখন ব্যস্ত। কে যেন বলে উঠলেন—আমার কাছে তোরা দায়ী থাকবী। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মদুর রাসুলুল্লাহ। মাগো—আমি চোখের বাঁধনের কপড়টি সরিয়ে ফেলে খুব জোরে দৌড় দিলাম। প্রায় হাত কুড়ি যাবার পর 'এই' 'এই' বলে হাঁকডাক শুনতে পেলাম। আমার তখন কোন দিকে খেয়াল ,নই। শুনতে পেলাম—গুড়ুম গুড়ুম করে দুটি আওয়াজ। অন্ধকারে প্রায় ৪০ গজ যাওয়ার পর সামনে পরলো কাদা। কর্দমাক্ত জায়গাটি পার হওয়ার সময় আবার দুটিগুলীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। কিন্তু অন্ধকারে তাদের লক্ষ্য ভ্রষ্ট হল। আমি কাদার মধ্যে পড়ে গেলাম। প্রায় ৩ ফুট গভীর পানি। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে আমি পানি ঠেলে সামনে এগিয়ে যেয়ে লাগলাম। খানিক্ষণ চেষ্টার পর শুকনো জায়গা পেলাম। উঠে আবার দৌড়ানো শুরু করলাম। দূর থেকে আমার দিকে টর্চের এক ঝলক আলো ভেসে এলো। আবার দুটি গুলীর শব্দ। সাথে সাথে আমি কাত হয়ে পড়ে গেলাম। গড়াতে গড়াতে গেলাম আবার পানির মধ্যে। প্রাণপণে সাঁতার কেটে এগিয়ে চললাম। এরপর শুকনো বিল আর নদী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। গায়ে শক্তি নেই, কিন্তু আমি তখন দিকভ্রান্ত। নিরাপত্তার জন্য নদীর পাড়ে না উঠে উজানে এগিয়ে চললাম। রাতের তখন বেশী দেরী নেই। খানিক পর উঠে পড়লাম নদী থেকে। বাকী রাত কাটিয়ে দিলাম নদীর তীরে এক ঝুপড়ির মধ্যে। সকালে রোদ ওঠার পর চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। বুঝতে পারলাম না—কোথায় এসেছি। গ্রামের আভাস যেদিকে পেলাম সেদিক পানে চললাম এগিয়ে। খানিক চলার পর শুনতে পেলাম—কারা যেন আমায় ডাকছে। প্রথমে ভয় পেয়ে গেলাম। পরে

বুঝতে পারলাম—এরা গ্রামবাসী। তাদের কাছে সব কথা বললাম। বটগাছের বিবরণ দিতে তারা বলল—ওটা হলো রায়ের বাজারের ঘাটের বটগাছ। সেখান থেকে পরে আমি আটির বাজারে মুক্তিফৌজের কমাণ্ডারের সাথে দেখা করি। তিনি আমার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। দুদিন পর ফিরে এলাম স্বাধীন বাংলার রাজধানীতে। তখনও বুঝিনি, এখনও বুঝতে কষ্ট হচ্ছে যে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে সত্যি কি বেঁচে গেছি আল্লাহ শেষ পর্যন্ত বাঁচিয়েছেন।'

ঘাতকদের পুনর্গঠন ও পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

স্বাধীনতার পর থেকে এদেশে জামাতে ইসলামীর পুনর্বাসন হয়েছে দু'টি ধারায়। ১৬ ডিসেম্বরের পর জামাতের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেই ধরা পড়েন, অন্যরা আত্মগোপন করে থাকেন। ১৯৭৩ সালে সধারণ ক্ষমা ঘষনার সময় পর্যন্ত।

গোলাম আজম ও মওলানা আব্দুর রহিমসহ জামাতে ইসলামীর যে সমস্ত নেতা ১৬ ডিসেম্বরের আগেই দেশছেড়ে পালাতে পেরেছিলেন, তারা প্রথমতঃ পাকিস্তানে গিয়ে মিলিত হন। সেখানে প্রথমে গোলাম আজমের নেতৃত্বে 'পূর্ব পাকিস্তান পুনরুদ্ধার সপ্তাহ' পালন করা হয়। বাংলাদেশে পাকবাহিনীর শোচনীয় পরাজয়ে পাকিস্তানে সে সময় ব্যাপোক গণ অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল। গোলাম আজমের কার্যকলাপ তখন সেখানে প্রচণ্ড প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

এ সময় জামাতে ইসলামী দলের মূল নেতা মওলানা মওদুদী গোলাম আজম আব্দুর রহিম প্রমুখকে হজ্জ প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে সৌদি আরবে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। বিমানে আরোহণ করার আগে মওলানা কাওসার নিয়াজী, মিয়া মমতাজ দৌলতানা প্রমুখ পাকিস্তানী নেতা গণহত্যার নায়ক এই সমস্ত ব্যক্তিদের পালিয়ে যাওয়ায় বাধ সাধেন। করাচী বিমান বন্দরে এদেরকে বিমান থেকে নামিয়ে আটক করা হয়। মওলানা মওদুদীর হস্তক্ষেপে এদেরকে পরে সৌদী আরব যাবার অনুমতি দেয়া হয়।

গোলাম আজম কতিপয় অনুসারীকে নিয়ে সৌদী আরব যাবার পর মধ্য-প্রাচ্যের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় একটি ভূয়া প্রতিষ্ঠানের নামে বিজ্ঞাপন দেন। এই বিজ্ঞাপনে 'পূর্ব পাকিস্তানে' 'মসজিদ জালিয়ে দেয়া হচ্ছে,' 'হিন্দুরা মুসলমানদের হত্যা করে বাড়ীঘর জালিয়ে দিচ্ছে' ইত্যাদি ধরনের বক্তব্য উপস্থাপন করে ইসলাম রক্ষার জন্য অর্থ সাহায্য প্রদানের আবেদন জানানো হয়। এ সময় জামাতীরা

বিপুল অর্থ সংগ্রহ করে ? আজও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতে জামাতে ইসলামীর বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ সংগ্রহ করে দেয়ার জন্য জাতীয় তহবিল সংগ্রহ কমিটি রয়েছে। গোলাম আজম অর্থ সংগ্রহ এবং বাংলাদেশ বিরোধী প্রচার চালানোর জন্য এসময় দুবাই, আবুধাবী, কুয়েত, বৈরুত সফর শেষে ১৯৭৩ সালের এপ্রিল মাসে লণ্ডন চলে যান।

এদিকে ১৬ ডিসেম্বরের পর জামাতের অন্যান্য যেসব নেতা ও কর্মী বাংলাদেশ ছেড়ে পালিয়েছিলে তাদের বেশির ভাগ মিলিত হন লণ্ডনে। ১৭ মে ১৯৭২ তারিখের দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'জামাতীরা এখন লণ্ডনে শিরোনামে যে প্রতিবেদনটি বের হয় তা থেকে এ সময়ে লণ্ডনে অবস্থানরত জামাতীতের কার্যকলাপের একটি ধারণা পাওয়া যেতে পারে। প্রতিবেদনটিতে লেখা হয়—'বাংলাদেশে তাড়া খেয়ে মওদুদী জামতীরা এবার গিয়ে উঠেছে লণ্ডনে। তারা নাকি বেশ জেঁকে বসেছে সাত সাগরের ওপারে। আর তথাকথিত ইসলামী আন্দোলনের দফতর খোলা হয়েছে বিচিত্র নগরী লণ্ডনে। সেখান থেকেই আবার প্রকাশিত হচ্ছে। 'সংগ্রাম'।

'দৈনিক সংগ্রাম ছিল এখানকার জামাতে ইসলামের মুখপত্র। ইয়াহিয়ার আমলে ঢাকা থেকে বের করা' হয় এই কুখ্যাত পত্রিকাট। লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয়ে রাতারাতি 'সংগ্রাম' বের হওয়ায় জনমনে দেখা দেয় বিরাট জিজ্ঞাসা। জামাতীরা এত টাকা পেল কোথাথেকে ? কিন্তু এই প্রশ্নের জবাব পেতেও দেরী হল না। পত্রিকাটির গণবিরোধী ও বাংলাদেশের স্বাধীনতারবিরোথী ভূমিকা দেখেই জনগণ বুঝে নিলেন এদের মুরুব্বী কারা। দুনিয়ার দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতা সংগ্রামকে নসৎ করার জন্য যে গোরী সেনরা কোটি কোটি ডলার খরচ করে, 'সংগ্রাম গুষ্ঠীর' টাকা আসে সেই একই সূত্র থেকে। লণ্ডনে 'সংগ্রাম' প্রকাশের এবং জামাতীদের ইসলামী দফতরের অর্থও যোগায় নাকি এই ডলার সাম্রাজ্যবাদীরা।

'গত কিছুদিন থেকে বাংলাদেশে 'সংগ্রামের কপি আসছে। বিমানযোগে আসা এসব কপিতে প্রাপকের নাম থাকে না। শুধু থাকে স্কুল, কলেজ বা কোন প্রতিষ্ঠানের নাম। অবশ্য সুদূর লণ্ডন থেকে আসলেও 'সংগ্রাম'-এর কপিগুলো বিলি করা হয়না। কর্তৃপক্ষ সেগুলো আটক রেখেছেন। এছাড়া ভবিষ্যতে যাতে বিমানে এসব না আনা হয় তার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।'

গোলাম আজম লণ্ডনে আসার পর থেকে শুরু করেন ফেলে যাওয়া দলের সংগঠন প্রক্রিয়া। এ দিকে হজজ পালনের পর' ৭৩ সালেই মওলানা আব্দুর রহিম প্রত্যাগমন ফ্লাইটে দেশে ফিরে আসেন গোলাম আজমের

অবর্তমানে তিনি বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীকে পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেন। গোপনে কাজ চলতে থাকে।

১৯৭৩ সালেই পাকিস্তানের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলির কাছে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে মতামত আহ্বান করেন। এ উপলক্ষে পাকিস্তান জামাতে ইসলামীর মসলিসে শূরার বৈঠকে দুজন সদস্য ছাড়া সবই স্বীকৃতিদানের বিরোধিতা করেন।

এ সময় দেশের ভেতরে জামাতীদের গোপন সাংগঠনিক কাজ জোরেশোরে চলতে থাকে। কিছু সংখ্যক নেতা মওলানা এবং আলেম সেজে বিভিন্ন ধর্মীয় জলসায় ওয়াজ করে জনসংযোগের কাজ করতে থাকেন।

১০৭৬ সালের ১৮ জনুয়ারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক প্রেসনোটে নাগরিকত্ব ফেরত পাবার জন্য ইচ্ছুক ব্যক্তিদের আবেদন জানাতে বলা হয়। সঙ্গে সঙ্গে গোলাম আজম লণ্ডন থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পাবার দরখাস্ত করেন।১৯৭৭ ও ১৯৭৮ সালে তিনি আবার দরখাস্ত করেন। ২০ মার্চ ১৯৭৮ সরকার তাঁকে নাগরিকত্ব দানে অস্বীকার করে। ১১ জুলাই ১৯৭৮ তিনি পাকিস্তানী পাসপোর্ট নিয়ে ঢাকায় ফিরে আসেন ; অসুস্থ মাতাকে দেখার জন্য 'মানবিক কারণে' তাঁকে তিন মাসের ভিসা দেওয় হয়।

সেই থেকে তিনি ঢাকায় মগবাজারের বাড়িতে বসবাস করছেন। ভিষার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়ার পরও সরকার তাঁকে দেশ থেকে বের করে দিতে পারে নি।

গোলাম আজম দেশে ফিরে আসার সাথে সাথে জামাতের পুনর্গঠনের কাজ ত্বরিৎ গতি লাভ করে। ক্ষেত্র প্রস্তুতের জন্য প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী আল বদর বাহিনীর হাই কম্যাণ্ডের নেতৃত্বে ইসলামী ছাত্র শিবির নামে অঘোষিত ছাত্র অঙ্গদল গঠন করা হয়।

এর পর ঘটে সেই অবিশ্বাস্য ঘটনা। লক্ষ লক্ষ শহীদের আত্মদানকে লাঞ্ছিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে জামাতে ইসলামীর পুনরুত্থান ঘটে।

২৫, ২৬, ২৭ মে ১০৭৯ ঢাকায় তথাকথিত একটি কনভেনশনের মাধ্যমে জামাতে ইসলামীর পুনরাবির্ভাব ঘটে। গোলাম আজমকে গোপনে আমীর নির্বাচিত করে আব্বাস আলী খানকে ভারপ্রাপ্ত আমীর বানানো হয়।

১০ ফেব্রুয়ারী ১৯৮০ প্রথমবারের মত বায়তুল মোকাররমে জামাতের জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ৭ ডিসেম্বর ১৯৮০ সালে দলের পক্ষে প্রথম সাংবাদিক সম্মেলনে আব্বাস আলী খান বলেন, ১৯৭১ সালে দেশ ও জাতীর মঙ্গলের জন্য যা করেছি, ঠিকই করেছি ভারতীয় আগ্রাসনের হাত থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য।'

২৯ মার্চ ৮১ তারিখে আব্বাস আলী খান এক সাংবাদিক সম্মেলনে '৭১ এ আমরা যা করেছি ঠিকই করছি এবং একাত্তরে বাংলাদেশের 'কনসেপ্ট' ঠিক ছিল না বলে মন্তব্য করেন।

অন্যান্য স্বাধীনতা বিরোধী দলগুলো স্বাধীনতার বাস্তবতাকে মেনে নিলেও জামাতে ইসলামী নিশ্চিতভাবেই আজও বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে পারেনি। একাত্তরের শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের সম্পর্কে তাদের কি ধারনা তা বোজবার জন্য এখানে সাপ্তাহিক বিচিত্রর ১৭ এপ্রিল ১৯৮১ সংখ্যার 'একাত্তরে আমরা ভুল করিনি, গোলাম আজম ও জামাতের রাজনীতি' শীর্ষক প্রচ্ছদ কাহিনীর অংশবিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে।

'১৯৭৭ সনের শেষ দিকে জামাতে ইসলামী বাংলাদেশ ব্যাপী এক জরীপ কাজ চালায়। জরীপের উদ্দেশ্য ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়ে তাদের কতজন মুত্তাফিক কর্মী ও রোকন মারা গেছে তা জানা।

'রিপোর্টের একস্থানে বলা হয়: 'আমাদের বীর সাথীরা জীবন দিয়েছে তবুও তথাকথিত মুক্তিযোদ্ধাদের (জারজ সন্তান) কাছে আত্মসমর্পণ করে নি। কুষ্টিয়ার এক গ্রামে তথাকথিত এক রোকনের মৃত্যু সম্পর্কে রিপোর্টে বলা হয়: 'আমাদের দুজন সাথীর বিশ্বাস ঘাতকতার দরুন জারজ সন্তানরা হত্যা করতে পেরেছে, না হলে সেটা সম্ভব হতো না।'

বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং একাত্তরের নিযুন শহীদানের আত্মদানকে জামাত আজও কি চোখে ভাবে তা বোঝা যাবে দলের ভারপ্রাপ্ত আমীর আব্বাস আলী খানের একটি বক্তব্যে। ১৯৮৬ সালের ১৪ জানুয়ারী সংখ্যা পাকিস্তানের 'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়, আব্বাস আলী খান করাচী সফরকালে বলেছেন, 'বাংলাদেশের জনগণ এখন পাকিস্তানের সঙ্গে তাদের বিচ্ছেদ কারণে অনুতপ্ত।'

১৯৭১ সালের জামাতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ স্বাধীনতার পর নিজেদের মধ্যে অন্তর্কলহে লিপ্ত হয়। ১৯৭৩ সালে সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার পর পাকিস্তান জামাতের নায়েবে আমীর (সহসভাপতি) মওলানা আবদুর রহিম বাংলাদেশে ফিরে আসেন। এ'সময় তিনি মোটামুটিভাবে বাংলাদেশকে যে আর পাকিস্তানের অধীন করা যাবে না সে বিষয়ে সুনিশ্চিত হন। অন্যদিকে গোলাম আজম তখনও পাকিস্তান, যুক্তরাজ্য এবং মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশসমূহে প্রচার করে বেড়াতে থাকেন 'পূর্ব পাকিস্তানে মসজিদ দখল করে হিন্দুদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে' ইত্যাদি। পাকিস্তানে থাকাকালীন

১৯৭২ সালেই গোলাম আজম এবং মওলানা আব্দুর রহিমের মধ্যে দ্বন্দ তীব্রতর হয়। '৭৩ এ দেশে ফিরে আব্দুর রহিম গোপনে জামাত কর্মীদের সংগঠিত করতে থাকেন। তখন ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর শাসনতান্ত্রীক বিধিনিষেধ থাকায় তিনি দলকে প্রকাশ্যভাবে অনুষ্ঠানিক রুপ দিতে পারছিলেন না। ১৯৭৬ সালে শাসনতন্ত্র থেকে ধর্মনিরপেক্ষতাকে বাদ দেয়া হয়। ধর্মভিত্তিক রাজনীতির উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। ২৪ আগষ্ট ১৯৭৬ সালে ছয়টি 'ইসলাম পছন্দ' ঘোরতর স্বাধীনতা বিরোধী দলের সমন্বয়ে মওলানা রহিম গড়ে তোলেন ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ। প্রাক্তন নিজামে ইসলাম প্রধান ও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য মওলানা সিদ্দিক আহমদ হন দলের সভাপতি, মওলানা রহিম প্রথম সহসভাপ্রতি। এই দলে আব্দুর রহিমের নেতৃত্ব স্বীকারকারী প্রাক্তন জামাত কর্মীরা প্রবল হলেও নিসিদ্ধ ঘোষিত পি ডি পি, খেলাফতে রাব্বানী, ডেমোক্রেটিক পার্টি ইত্যাদি দলত্যাগকারী কর্মীরাও একত্রিত হয়। সুতরাং একথা নিশ্চিত, অন্যান্য প্রায় সমস্ত ইসলাম পছন্দ দলগুলোর মতই এই দলেরও তিরিশোর্দ্ধ কর্মীদের বেশীরভাগই একাত্তরের শান্তি কমিটির সদস্য রাজাকার ও আল শামস; অবশ্য আল বদর নয়, কারণ মওদুদী গোলাম আজমের অন্ধ অনুগত আল বদর অর্থাৎ ইসলামী ছাত্র সংঘের প্রত্যেক নেতা ও কর্মী পুরনো নাম থেকে শুধু সংঘ বাদ দিয়ে সমবেত হয় ইসলামী ছাত্র শিবিরে।

মওলানা আব্দুর রহিম

একাত্তরের দালালীতে মওলানা রহিম, আব্বাস আলী খান, এ, কে এম ইউসুফ প্রমুখের সাথে এক কাতারেই ছিলেন, অথচ তিনি এখন একাত্তরে জামাতের সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করতে চান। আমরা এখানে তাঁর দুয়েকটি বক্তৃতা ববিতির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করব।

১৮ আগস্ট লাহরে জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ছয়দিন ব্যাপী বৈঠকের উদ্বোধনী ভাষণে মওলানা রহিম বলেন, 'দলের (জামাতের) একজন সদস্যও পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ আন্দোলনের সাথে নিজেকে কোনক্রমেই জড়িত করেনি। এর ফলে এটাই প্রমাণিত হয়েছে, সকল প্রকার তুচ্ছ মত বিরোধ বর্জিত আদর্শিক আন্দোলনের সাথেই জামায়াত জড়িত।'

১৯ আগস্ট মওলানা রহিমের নেতৃত্বে কেন্দ্রীয় মজলিসে শুরার

প্রস্তাবে 'ভারতীয় যুদ্ধবাজ কর্তৃক পুর্ব পাকিস্তানে অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে লুটতরাজ ধ্বংশ সাধন, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করা ও দেশে আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটিয়ে বিশ্ব শান্তির চরম লংঘনের দায়ে নিন্দা করা হয়, প্রস্তাবে পাকিস্তানের জনগণকে বর্তমান সংকটজনক পরিস্থিতির সম্পর্কে সচেতন হওয়ার এবং যুগে যুগে মুসলমানেরা যে কোরবানীর নমুনা দেখিয়েছেন তা পুনরুজ্জীবিত করার আহ্বান' জানান হয়।

২০ আগস্ট মওলানা রহিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মওলানা মওদুদী, গোলাম আজম, আব্দুল খালেক প্রমুখ বক্তৃতা করেন। এই অধিবেশনের প্রস্তাবে বলা হয়, 'ভারতীয় যুদ্ধবাজ ও তাদের চরদের যোগসাজশে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ব্যক্তিদের দমন করার কাজে সরকার যে সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন, মজলিশে শূরা তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।'

২১ আগস্টের প্রস্তাবে সামরিক বিধসমূহ কঠোর ভাবে জারী করার জন্য সরকারের আইন প্রয়োগকারী সকল এজেন্সীকে আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, 'আইন ও শৃংখলা পরিস্থির নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার ৬০ ও ৭৮ নং বিধি জারী করেন সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রশসানিক কর্তৃপক্ষ উক্ত বিধিগুলো কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে না পারায় সেগুলো অকার্যকারী হয়ে পড়েছে। পরিস্থিতির উন্নতির জন্য সরকার কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে তা জনগণকে তাদের ভবিষৎ সম্পর্কে নিরাশ করবে এবং দেশের সংকট তাতে অব্যাহত থাকবে।'

এই ৬০ ও ৭৮ নং সামরিক বিধিই ছিল গণহত্যার সপক্ষে পাকবাহিনীর ,আইন। এই বিধি দুটি অনুযায়ী পাকবাহিনী সন্দেহভাজন যে কাউকে আটক ও নির্যাতনের অনুমতি দিয়ে সব ধরণের জবাবদিহি করা থেকে নিস্কৃতি দেয়া হয়। ইতিমধ্যে শূরার বৈঠককালে মওলানা রহিম করাচীতে বাংলাদেশে জামাতীদের কার্যক্রম সম্পর্কে বিভিন্ন বক্তব্য রাখেন। দৈনিক জাসারত পত্রিকায় 'মওলানা অব্দুর রহিমের পরামর্শ শীর্ষক উপসম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'পাকিস্তানে জামাতে ইলামীর সহকারী আমীর মওলানা আব্দুর রহিম বলেছে, 'দুস্কৃতকারী ও ধ্বংসত্মক কাজে লিপ্ত ব্যক্তিদের গেরিলা যুদ্ধের মোকাবিলা করা সেনাবাহিনীর দ্বারা সম্ভব নয়। দুস্কৃতকারীর গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ায় ও আস্তানা গাড়ে, কিন্তু সেনাবাহিনীর আগমন সংবাদ পেতেই পালিয়ে যায়। সেনাবাহিনী পৌঁছুলে তাদের সামনে জনবসতি ছাড়া আর কিছুই থাকেনা। সেনাবাহিনীও বর্তমানে এ প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন যে, স্থানীয় অধীবাসীদের

সহায়তা ছাড়া দুষ্কৃতকারীদের মুকাবিলা করা সম্ভব নয়। এ কারণেই রাজাকার ও মুজাহিদ বাহিনী গঠনের প্রতি মনোনিবেশ করা হয়েছে। একারণেই অধ্যাপক গোলাম আজম তাঁর বিগত পশ্চিম পকিস্তান সফরকালে বার বার দাবী করেছিলেন যে, দেশপ্রেমিকদের সশস্ত্র করা হোক অন্যথায় পরিস্থিতির মারাত্মক অবনতি ঘটবে। সুখের বিষয় সরকার এ সঠিক পরামর্শ গ্রহণ করে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় দেশ-প্রেমিকদেরও শামিল করেছেন।....

'...এ পর্যায়ে মওলানা আব্দুর রহিম আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। দুষ্কৃতকারীদের নির্মূল করার দায়িত্ব যেন স্থানীয় জনগণের সাথে পরিচিত মুজাহিদ বাহিনীর হাতে দেয়া হয়। মওলানা আব্দুর রহিম আরও বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের পুরাতন কোন কোন পুলিশের ওপর কিছুতেই নির্ভর করা যায় না, কেননা তারা বিভিন্নস্থানে ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণ করছে। রাজাকার দের নিরুৎসাহিত করে এদের রিপোর্টের ওপর নির্ভর করা আত্মহত্যার শামিল। মওলানা আব্দুর রহিম পূর্ব পাকিস্তানী একশ্রেণীর পুলিশের ওপর অনাস্থা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে এ'ও বলেছেন, এখন পর্যন্ত সরকারী দফতরসমূহে এক শ্রেণীর লোকের দ্বারা 'বাংলাদেশের' প্রোপাপাণ্ডা অব্যহত রয়েছে। যতদিন পর্যন্ত এরা সরকারী দফতরসমূহে এরূপ করতে থাকবে ততদিন পাকিস্তানকে রক্ষা করার সরকারী প্রচেষ্টায় সফলতা লাভ অসম্ভব হয়ে পড়বে।'

মুসলিম লীগের দালাল নেতৃবৃন্দ

স্বাধীনতা সংগ্রামকালে দালালীর ক্ষেত্রে জামাতে ইসলামীর পরেই সবচেয়ে সুগঠিত ভূমিকা পালন করেছিল খাজা খয়েরুদ্দীনের নেতৃত্বাধীন কাউন্সিল মুসলিম লীগ, ফজলুল কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন কনভেনশন মুসলীম লীগ এবং কাজী কাদেরের নেতৃত্বাধীন কাইয়ুম পন্থী মুসলিম লীগ। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে জামাতে ইসলামীর প্রভাব বলয়ের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল এই তিন দল। বাংলাদেশে আজ যে সমস্ত স্বাধীনতা বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি তৎপর তাদের মধ্যে জামাতে ইসলা-মীর পরই মুসলীম লীগের বিভিন্ন অংশের নাম আসতে পারে। আল শামস বাহিনীতে এই দলের ছাত্র কর্মীদের প্রাধান্য ছিল। আই, ডি, এল এর পুরানে কর্মীদের প্রায় প্রত্যেকে যেমন রাজাকার ও আল শামস মুসলিম লীগের ক্ষেত্রেও একই

৪· দৈনিক সংগ্রাম—২ সেপ্টেম্বর '৭১

কথা খাটে। জাতীয় সংসদেও এই দলে এমন কয়েকজন সদস্য রয়েছেন যারা একাত্তরে শান্তি-কমিটি ও রাজাকারের মূল নেতৃত্বে ছিলেন। আমরা মুসলীম লীগের কয়েকজন নেতার একাত্তরের বক্তৃতা অংশবিশেষ উদ্ধৃত করব।

৭১, এ কাইয়ুমপন্থী মুসলীম লীগের প্রাদেশিক প্রধান, বর্তমানে মুসলীম লীগ সভাপতি কাজী আব্দুল কাদের শান্তি কমিটি গঠনের সময় করাচীতে ছিলেন বলে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটিতে প্রথম থেকে যোগ দিতে পারেন নি। তবে তিনি করাচী থেকেই পাক বাহিনীর গনহত্যাকে সমর্থন দান করেন। করাচীতে ৮ এপ্রিল এক সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনীর সাম্প্রতিক ব্যবস্থা গ্রহণ সঠিক ও সময়োচিত হয়েছে। রাষ্ট্রপতি হিসেবে প্রেসিডেণ্ট ইয়াহিয়া খান সঠিক পদক্ষেপই গ্রহণ করেছেন।' পরবর্তীতে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্থানে ফিরে এসে কাজী কাদের স্বাধীনতা বিরোধিতায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে, যে কারণে স্বাধীনতার পর তাঁর নাগরিকত্ব বাতিল হয়ে যায়।

বর্তমানে বাংলাদেশে পুনর্বাসিত মুসলিম লীগের স্বাধীনতাবিরোধী নেতৃবৃন্দের মধ্যে কাজী কাদের পরের নামটি হতে পারে মুসলীম লীগের সহসভাপতি এ, এন, এম ইউসুফ। দালালীর ক্ষেত্রে জামাতী নেতাদের চেয়ে তাঁর ভূমিকা কোন ক্রমেই কম ছিল না। ৭ এপ্রিল তারিখেই পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে 'বাংলাদেশ' সরকারের কোন অস্তিত্ব নেই। বেতারে নগ্ন প্রচারণা, পাকিস্তানে আক্রমণ পরিচালনার জন্য সেখানকার জনগণের তৎপরতা, পাকিস্তানের শান্তি প্রিয় জনগণকে বিঘ্নিত করার জন্য লোক, অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের দ্বারা আন্তর্জাতিক সনদের বরখেলাপ করে পাকিস্তানর অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য আমরা ভারতের তৎপরতার নিন্দা করছি।'

১২ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান মুসলীম লীগ (কনভেনশন) প্রেসিডেণ্ট শামসুল হুদা ও সাধারণ সম্পাদক এ, এন, এম, ইউসুফ যুক্ত বিবৃতিতে 'প্রদেশে সকল পার্টি ইউনিটকে শান্তি প্রিয় জনসাধারণকে নিয়ে কমিটি গঠনের জন্য স্ব স্ব অঞ্চলে সক্রিয়ভাবে প্রচেষ্টা চালানোর' নির্দেশ দেন। দলীয় ইউনিটগুলোকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে কমিটি গঠনের' নির্দেশ দিয়ে তাঁরা বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণকে মিথ্যা প্রচারণা ও উত্তেজনপূর্ণ কাহিনী শুনিয়ে বিভ্রান্ত করা সম্ভব হবে না।'

মে মাসে এ, এন, এম, ইউসুফ প্রথমে দলীয় নেতৃবৃন্দসহ টিক্কা খানের সাথে সাক্ষাৎ করেন, তারপর শান্তি কমিটি গঠনের জন্য বিভিন্ন জেলায় সংগঠনিক সফর শুরু করেন। এ'সময় এ পি পি পরিবেশিত এক খবরে বলা হয়, 'মোমেনশাহী জেলায় বিভিন্ন স্থানে দুস্কৃতকারীদের সমাজ থেকে উৎখাতের জন্য সেনা বাহিনীকে সাহায্য করার উদ্দেশ্যে শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে।, পূর্ব পাকিস্তান কনভেনশন মুসলীম লীগের সাধাণর সম্পাদক এ, এন, এম, ইউসুফ মোমেনশাহী জেলার সকল মহকুমা সদর দপ্তরসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলো সফর করেন। অধিকাংশ জায়গাতে তার উপস্থিতিতেই শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে।'

ময়মনসিংহ সফরেয় পর তিনি উত্তরবঙ্গে শান্তি কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে সংগঠনিক সফর করেন। মানিকগঞ্জ পাবনা, শাহাজাদপুর ও বগুরা সফর করে তিনি এসমস্ত এলাকায় শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে আলোচনা করেন। ২৫ মে বগুড়ায় এ পি পির সাথে সাক্ষাতে তিনি দুস্কৃতকারীদের উচ্ছেদের জন্য ঐক্যবদ্ধ হওয়ার' আহ্বান জানান।

১ জুন রাজশাহী ও নবাবগঞ্জ সফর কালে তিনি শান্তি কমিটির সদস্যদের সাথে বৈঠক করেন। এখানে তিনি বলেন, 'পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য রাজশাহীবাসীরা মনে প্রানে কাজ করে যাচ্ছে এবং সর্বত্র আমাদের সশাস্ত্রবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কার্যক্রম অভিনন্দিত হচ্ছে।' এর পর কুষ্টিয়ার ভেরামারায় শান্তি কমিটি বিশিষ্ট নাগরিক ও বি ডি সদস্যদের সাথে দেখা করে তিনি বলেন, 'জনগনের সহায়তায় সশাস্ত্র বাহিনী ভেড়ামায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে এনেছে বলে আমি জানতে পেরেছি।' এসময়ে তিনি দৌলতপুর ও মীরপুর থানার অন্তভূক্ত এলাকাসমূহ সফর করেন। এ, এন, এম ইউসুফ স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত এভাবে শান্তি কমিটির সাংগঠনিক সফর করে বেড়িয়েছেন অবরুদ্ধ বাংলাদেশের সর্বত্র।

বর্তমানে মুসলিম লীগের একটি অংশের মহাসচীব আব্দুল মতিনও শান্তি কমিটি গঠনের অন্যতম প্রধান উদ্যেক্তা। ১০ মে ঢাকা বেতারে প্রচারিত এক কথিকায় আব্দুল মতিন বলেন, 'ভারত অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেছে। ভারতের এ জঘন্য দুরভিসন্ধি নস্যাৎ করতে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ কিছুতেই পেছ পা হবে না।'

কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য জনাব আব্দুল মতিন মহকুমার বিভিন্ন সফর শেষে ঢাকা ফিরে জানিয়েছেন যে, গত ২৬ এপ্রিল থেকে উক্ত এলাকা রাষ্ট্রদ্রোহী এবং ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের কবল মুক্ত হয়েছে। শান্তি কমিটিগুলো সেনা-

বাহিনী ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে পূর্ণ সহযোগিতা করছে। জয়পুরহাটে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আগমনের পর ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা ও রাষ্ট্রদ্রোহীরা পালিয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে কয়েকজন নিহত হয়। বর্তমানে এলাকায় পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে।'

পরদিন ২৬ জুন তারিখের খবরে বলা হয় 'আজ ঢাকা জেলা পরিষদ হলে ঢাকা সদর দক্ষিণ শান্তি কমিটির এক বৈঠক হয়েছে। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য জনাব এম, এ, মতিন এই সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভাপতির ভাষণে তিনি সমাজ বিরোধীদের নির্মূলে আমাদের সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য সবাই-কে আহ্বান জানান।'

কৃষক শ্রমিক পার্টির এ, এস, এম সোলায়মান

রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে পাকবাহিনীর গণহত্যায় সহায়তাকারী প্রথম সারির নেতাদের নাম করতে হলে কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি এ, এস' এম, সোলায়মানের নাম আসবে। স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাস তাঁর কার্যকলাপের পরিচয় দানের উদ্দেশ্যে সে সময় তাঁর দেয়া অসংখ্য বিবৃতির কয়েকটি এখানে দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরা হচ্ছে।

৮ এপ্রিল প্রদত্ত বিবৃতিতে সোলায়মান পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সমাজ ও রাষ্ট্রবিরোধীদের নির্মূল করে দেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার কাজে সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার আহ্বান জানান।'

৭ মে বৈদ্যের বাজারে শান্তি কমিটির সভায় 'সকল সমাজ বিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহী ব্যক্তিদের ভালভাবে পরীক্ষা করার আহ্বান জানান।'

মালেক মন্ত্রীসভার সদস্য হবার পর ১৯ সেপ্টেম্বর এক সভায় তিনি বলেন 'যারা পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল তাদেরকেই সমূলে ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে।'

১৫ নভেম্বর করাচীতে তিনি বলেন, 'রাজাকাররা অত্যন্ত প্রশংসামূলক কাজ করছে এবং তাদেরকে জাতীয় বীর বলা উচিত।' তিনি পশ্চিমাঞ্চলের দলগুলিকে পূর্বাঞ্চলে রাজাকার জোয়ান পাঠানোর আহ্বান জানান।

৮ ডিসেম্বর এ, এস, এম, সোলায়মান শ্রম, সমাজ কল্যাণ ও পরিবার পরিকল্পনা দফতরের মন্ত্রী ও জেলা সমন্বয় কমিটির সভাপতি হিসেবে ঢাকা ডেপুটি কমিশনার অফিসে উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা পুলিশ অফিসার ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় আইন ও শৃংখলা বজায়

আখার ব্যাপারে দৃঢ় হবার সংকল্প ঘোষণা করে কতিপয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

এ, এস এম, সোলায়মান আজ যে দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের পুরাতন কর্মীদের বেশীর ভাগই শান্তি কমিটি ও রাজাকারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

খেলাফত আন্দোলনের হাফেজ্জী হুজুর ও অন্যান্য দালালরা

বাংলাদেশে স্বাধীনতা বিরোধীদের চতুর্থ প্লাটফর্মটি হচ্ছে হাফেজী হুজুর নামে পরিচিত মওলানা মোহাম্মদ উল্লার নেতৃত্বাধীন খেলাফত আন্দোলন। এই দলেরও বয়োজ্যেষ্ঠ কর্মীদের প্রায় সকলেই হয় শান্তি কমিটির সদস্য নতুবা রাজাকার। স্বাধীনতার পর অন্যান্য দালালদের মত হাফেজ্জীও একাত্তরে নিজের ভূমিকা ঢেকে ফেলতে তৎপর হয়েছেন, কিন্তু তিনিও পাক সেনাবাহিনীর হত্যাযোজ্ঞে মদদ জুগিয়েছেন। ৩ জুন আরও কয়েকজন ওলামার সাথে দেয়া এক যুক্ত বিবৃতিতে হাফেজী 'পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ইসলাম প্রিয় লোকদের সামরিক ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা করার জন্য' সামরিক সরকারের প্রতি আবেদন জানান। বিবৃতিতে বলা হয়, 'যাতে ভারতীয় হামলা মোকাবিলা করা যায়, সেজন্য সরকারের উচিত তার অনুগত নাগরিকদের মুজাহিদ হিসেবে গড়ে তোলা।' মওলানারা আরো বলেন লক্ষ প্রাণ, অমানুষিক দুঃখকষ্ট ও বিরাট আত্মত্যাগের বিনিময়ে এবং মুসলমানদের অক্লান্ত ও অতুলনীয় প্রচেষ্টার ফলে পাকিস্তান একটা সুস্পষ্ট রাজনৈতিক সত্তা হিসাবে মাথা উচু করতে পেরেছে। কিন্তু মুসলিম বিরোধী শক্তিগুলো তাদের ষড়যন্ত্র ত্যাগ করেনি।...গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ছদ্মবরনে পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক বিচ্ছিন্নতাবাদী অভ্যুত্থান ছিল পাকিস্তানকে ধ্বংস করার অপর একটি ভারতীয় চক্রান্ত।' এই যুক্ত বিবৃতি প্রকাশের কিছুদিনের মধ্যেই রাজাকার বাহিনী অনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করে।

মওলানা মোহাম্মদ উল্লাহ ছাড়া উক্ত বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁদের মধ্যে রয়েছেন '(১) মওলানা মুফতি দীন মোহাম্মদ খান, সেক্রেটারী জামিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া, ঢাকা, (২) মওলানা সিদ্দিক আহমদ, প্রেসিডেন্ট, জমিয়াতুল ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, পূর্ব পাকিস্তান, (৩) মওলানা মোহাম্মদ ইউনুস, প্রিন্সিপাল, কাসেমুল উলুম, পটিয়া, চট্টগ্রাম, (৪) মওলানা মোস্তফা আল মাদানী, ভাইস প্রেসিডেন্ট, জমিয়াতুল ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, (৫) মওলানা আজিজুর রহমান, সেক্রেটারী হিজবুল্লাহ, শর্ষিণা, বরিশাল (৬) আলহাজ আবদুল

ওহার, কোষাধ্যক্ষ জমিয়া কোরাণিয়া আরাবিয়া, ঢাকা, (৭) মওলানা আশরাফ আলী, সেক্রেটারী জেনারেল, জমিয়াতুল ওলামায়ে ইসলাম ও নেজামে ইসলাম, (৮) মওলানা আজিজুল হক, মোহাদ্দেস, লালবাগ জমিয়া কোরানিয়া আরাবিয়া (৯) মওলানা নূর আহমদ সেক্রেটারী, দাওয়াতুল হক, পূর্ব পাকিস্তান।' (দৈনিক পাকিস্তান ৪-৬.৭১)

খেলাফত আন্দোলনের বর্তমান ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের প্রায় সকলেই স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে কুখ্যাত দুজন হচ্ছেন তোয়াহা বিন হাবীব এবং আক্তার ফারুক। দুজনেই কেন্দ্রিয় শান্তি কমিটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। টিক্কা খানের ঘনিষ্টতম দোসরদের অন্যতম ছিলেন তোয়াহা বিন হাবিব। এমনকি টিক্কা খানের গাড়িতে তাঁকে সে সময় চলাফেরা করতে দেখা যেত। ১৬ ডিসেম্বরের বন্দী পাক সেনাদের সাথে তোয়াহা বিন হাবিব বন্দী হয়ে ভারতে যান। ভারত থেকে পাক যুদ্ধবন্দীরা মুক্তি পেল তিনিও তাদের সাথে পাকিস্তানে চলে যান। সেখান থেকে সৌদী আরবে গিয়ে সৌদী রাজ পরিবারের আশ্রয়ে বাস করতে থাকেন। ৮ বছর সৌদী আরবে থাকার পর কোটিপতি হয়ে দেশে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশের সবচেয়ে ধনী লোকদের একজন, গুলশানে তাঁর প্রাসাদোপম বাড়িতে ২৪ ঘণ্টা সশস্ত্র প্রহরী থাকে।

আখতার ফারুক স্বাধীনতা সময় ছিলেন জামাতে ইসলামীর মজলিসে শুরার সদস্য এবং দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার সম্পাদক। সে সময় দৈনিক সংগ্রামে গণহত্যার সমর্থনে তাঁর লেখা অসংখ্য সম্পাদকীয় এবং নিবন্ধের মধ্যে একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখিত হতে পারে। হানাদার এবং দালালদের 'পাকিস্তান ও ইসলাম বিরোধী চর' হিসেবে চালাও নির্মূল অভিযানের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে ইত্তেফাক শহীদ সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেন 'ঠক বাছতে গাঁ উজাড়' নামে একটি নিবন্ধ লেখেন। এর প্রত্যুত্তরে আখতার ফারুক ১৬ সেপ্টেম্বর সংগ্রামের প্রথম পাতায় 'অতএব ঠগ বাছিও না' শিরোনামে একটি দীর্ঘ নিবন্ধ লিখে স্বাধীনতামনা বুদ্ধিজীবীদের নির্মূলের জন্য খোলাখুলি আহ্বান জানান।

যাবতীয় ইসলাম পছন্দ সাম্প্রদায়িক দলের নেতৃবৃন্দ এবং তাদের পুরানো কর্মীদের প্রায় সকলেই সরাসরি শান্তি কমিটি রাজাকার ইত্যাদির অন্তর্ভুক্ত ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এর

৫· 'ইসলামী দলসমূহের অন্তর্বিরোধ—এলাহী নেওয়াজ খান, সাপ্তাহিক বিচিত্রা ১৩ বর্ষ ২৫ সংখ্যা ১০ নভেম্বর '৮৫ পৃঃ২৯।

পর স্বাধীনতা উত্তরকালে যে তিনটি মুখ্যদল ক্ষমতারোহরণ করেছে—আওয়ামী লীগ, বি, এন, পি ও জাতীয় পার্টি—এদের বিষয় আলোচনা করা যেতে পারে।

এদের মধ্যে আওয়ামী লীগে স্বাভাবিকভাবেই পাক বাহিনীর সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত ব্যক্তিদের অনুপ্রবেশ ঘটেনি। তবে একাত্তরে তৎকালীন আওয়ামী লীগেরও কিছু নেতা বিশ্বাসঘাতকতা করে পাকবাহিনীর সাথে হাত মিলিয়েছিল। এই দলের সবচেয়ে বড় দোষ, এদেরই শাসনামলে গণহত্যাকারী দালালরা জনরোষ ও প্রকৃত বিচার থেকে মুক্তি পেয়েছে, যার ফলে পরবর্তীকালে দালালরা জাতীয় জীবনে তাদের পুরনো ভূমিকায় ফিরে যেতে সক্ষম হয়েছে।

বি এন পি ও জাতীয় পার্টি উভয় দলে রয়েছে বাঙ্গালী হত্যাকারী খুনী দালালরা। স্বাধীনতা সংগ্রামকালে এ সমস্ত দালাল তৎকালীন উগ্র পন্থী দলগুলোর সদস্য ছিল বিধায় এদের কার্যকলাপ ছিল অন্যান্য দালালদের মতই। এখানে তার বিস্তৃত উল্লেখ করা হবে না, শুধু নমুনা হিসেবে জাতীয় পার্টির দুজন নেতা মাহবুবুল হক দোলন এবং কে জি করিমের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হচ্ছে।

৬০ এর দশকের শেষ দিকে কুখ্যাত এন, এস, এফের নেতা হিসেবে মাহবুবুল হক দোলন ত্রাসের সৃষ্টি করেছিলেন। ২৫ মার্চ পাক বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের পর তিনি পুনরায় মঞ্চে অবতীর্ণ হন। এপ্রিল মাস থেকে তিনি কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির অপরাপর সদস্যের মতই দালালদের সংগঠিত করা শুরু করেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত তা অব্যাহত রাখেন। পাকিস্তান মুসলিম লীগের (কাইয়ুম গ্রুপ) যুগ্ম সম্পাদক হিসেবে প্রদত্ত তাঁর বিভিন্ন বিবৃতির মধ্যে ৯ এপ্রিল তারিখের বিবৃতির অংশ বিশেষ ছিল এরকম, 'পাকিস্তান যারা সৃষ্টি করেছে পাকিস্তান খন্ড বিখন্ডিত করার প্রচেষ্টায় তারা কোন রকমের সাড়া দিতে পারেনা। সীমান্তের অপর পার থেকে সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশের ফলে পরিস্থিতি অত্যন্ত জটিল হয়ে উঠেছে এবং সমস্যা আরও গুরুতর হয়ে উঠেছে। এই সমস্ত অনুপ্রবেশকারী ও তাদের সহযোগিতাকারী দালালদের উৎখাত করার জন্য আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড়াতে হবে।'

'৭১ এ ঢাকা শহরে মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কে জি করিম ১২ এপ্রিল এক বিবৃতিতে 'খাজা খয়েরুদ্দীনের নেতৃত্বে যে শান্তি কমিটি গঠিত হয়েছে তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন, জানিয়ে বলেন, 'আমার লীগ এই শান্তি কমিটিতে যোগ দিয়ে এর মিছিলে অংশ নেবে।'

১৭ এপ্রিল কে জি করিম 'সৈয়দ খাজা খয়েরুদ্দীনের নেতৃত্বে গঠিত

শান্তি কমিটির উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশংসা করে বলেন যে, এর ফলে ঢাকাসহ অন্যান্য স্থানে সর্বস্তরে শান্তি পুনরুদ্ধারের কাজ ফলবতী হবে।'

এরপর থেকে শান্তি কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতই তিনি গণহত্যায় নেতৃত্ব দেবার কাজ চালিয়ে যান।

উগ্রপন্থী সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দলগুলি ছাড়াও কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির কার্যকলাপে আলেম ও মওলানা শ্রেণীর লোকের অধিকাংশই যোগ দিয়েছিল। এদের মধ্যে মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী, মওলানা জুলফিকার আহমদ কিসমতি, লালবাগ শাহী মসজিদের ইমাম এবং তৎকালীন পাকিস্তান সিরাত কমিটির সভাপতি মওলানা আমিনুল ইসলাম, মওলানা মুফতি দীন মুহম্মদ, বায়তুল মোকাররম মসজিদের তৎকালীন ইমাম মওলানা আমিনুল এহসান, মৌলবী ওবায়দুল্লাহ, মওলানা আজিজুর রহমান নেসারাবাদী, মওলানা আবদুর জব্বার প্রমুখ সর্বাধিক তৎপরতা প্রদর্শন করেছিলেন।

বাংলাদেশে গণহত্যাকারী দালালদের পুনর্বাসনের প্রক্রিয়ার সূচনাও হয়েছিল এই সমস্ত তথাকথিত মওলানাদের তবলিগ, ওয়াজ মাহফিল, সিরাত সম্মেলন ইত্যাদি কার্যকলাপের মাধ্যমে। তবলিগ জামাতের মূল কেন্দ্র কাকরাইল মসজিদ '৭১ এ ছিল বুদ্ধিজীবী নির্যাতনের জন্য আল বদরের অন্যতম কেন্দ্র। '৭১ এর প্রথম ভাগে এই কাকরাইল মসজিদই হয়ে দাঁড়িয়েছিল শান্তি কমিটির সদস্য ও আল বদরসহ মুখ্য দালালদের নিরাপদ আশ্রয় স্থল। এ সময় পাকিস্তান থেকে এসে এই মসজিদের তবলিগে যোগদানকারী কিছু 'মওলানা' বলে বসেন, 'যেন বেহেশত থেকে এলাম।' এই বক্তব্য দারুণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল। একাত্তরের দালাল মওলানারা এখনো তবলীগ করার নামে যত্রতত্র ওয়াজ করতে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী কথাবার্তা জোরগলায় প্রচার করছে। এদের ভেতর সবচেয়ে সোচ্চার মওলানা দেলোয়ার হোসেন সাঈদী।

৪

আরও কিছু মুখ্য স্বাধীনতা বিরোধী

শান্তি কমিটির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের তালিকা পুস্তকের পরিশিষ্টে সংযোজিত হয়েছে। কিন্তু সমস্ত নেতৃস্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধীদের নামই শান্তি কমিটি বা অন্য কোন বিশেষ সংগঠন বা সভার সদস্যদের নামের তালিকায় পাওয়া যেতে পারে না। এ কারণেই এই অধ্যায়টি রচনা করা হয়েছে।

এটা ঠিক যে, নেতৃস্থানীয় স্বাধীনতা বিরোধী খুনীরা আজ দেশের সর্বত্র সমাজের উচ্চতম আসনে আসীন। এদের সবার পরিচয় ও কার্যকলাপের বিবরণ দান ক্ষুদ্র পরিসর এই পুস্তকে সম্ভব নয়। নমুনা হিসেবে শুধু এমন কয়েকজনের প্রসঙ্গ উল্লেখিত হবে, যারা জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং নেতৃস্থানীয় ভূমিকা পালন করছেন।

৭১ এর ১৭ জুন রাওয়ালপিন্ডিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে প্রাদেশিক গভর্ণর ও সামরিক আইন প্রশাসকদের সভার প্রাক্কালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে নেতৃস্থানীয় দালালরা সেখানে একত্রিত হয়। ইয়াহিয়া খান ও টিক্কা খানের মুখোমুখি আলোচনার সময় উপস্থিত থেকে আত্মস্বার্থ সিদ্ধি এবং এ প্রদেশে সামরিক বাহিনীর গণহত্যা অভিযানে বেসামরিক সংস্থাসমূহের সহযোগিতার ব্যাপারে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক এবং আঞ্চলিক সামরিক আইন প্রশাসকের সিদ্ধান্তসমূহকে প্রভাবিত করাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। এ সময় হামিদুল হক চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি উচ্চ পর্যায়ের প্রতিনিধিদল ইয়াহিয়া খানের সাথে দেখা করে এই প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য ছিলেন বাংলাদেশের বর্তমান

উপরাষ্ট্রপতি বিচারপতি নুরুল ইসলাম। বুদ্ধিজীবী হত্যা তালিকা প্রণয়নকারী রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, মাহমুদ আলী সহ কিছু কুখ্যাত স্বাধীনতা বিরোধীর সমন্বয়ে গঠিত এই প্রতিনিধিদল ইয়াহিয়া খানকে 'পূর্ব' পাকিস্তানের উন্নয়নশীল পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ করে।

১৬ ডিসেম্বর বিজয়ের পর থেকে আত্মগোপনকারী স্বাধীনতা বিরোধীদের মধ্যে যারা মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে ধরা পড়ে, তাদের তালিকা বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় 'আরও বহু দালাল গ্রেফতার', 'গতকাল যে সমস্ত মীরজাফর ধরা পড়েছে' ইত্যাদি শিরোনামে প্রত্যেক দিন প্রকাশিত হতে থাকে। এ সময় এত অধিকসংখ্যক দালাল ধরা পড়ে যে, নেতৃস্থানীয়দের গ্রেফতারের কাহিনী আলাদা আলাদা সংবাদ হিসেবে প্রকাশিত না হয়ে এক তালিকাতেই সবার নাম ছাপা হত। কিন্তু ২৭ ডিসেম্বর তারিখের দৈনিকগুলোর প্রথম পৃষ্ঠায় 'আরেকটি দালাল ধরা পড়েছে' শিরোনামে নুরুল ইসলামের গ্রেফতার হবার কথা পৃথকভাবে মুদ্রিত হয়।

অথচ উপরাষ্ট্রপতি হবার পর বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত এ, কে, এম, নুরুল ইসলামের সংক্ষিপ্ত জীবনীতে উল্লেখ করা হয়, 'তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামেও সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।'

ফজলুল কাদের চৌধুরী ও তাঁর পুত্র সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সারা বাংলাদেশে একক পরিবার হিসেবে সবচেয়ে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছে কনভেনশন মুসলিম লীগের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরীর পরিবার। তাঁর বাড়ি ও স্ব-উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত জেলখানাটি ছিল বাঙ্গালী নিধনের কসাইখানা। এখানে অসংখ্য নিরপরাধ বাঙ্গালীকে অকল্পনীয় অত্যাচার করে হত্যা করা হয়েছে। সারা চট্টগ্রামে ফকা চৌধুরী ভয়াবহ ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিলেন। স্বাধীনতার পরপরই ফকা চৌধুরী তাঁর দুই ছেলে ও অন্যান্য সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে ৭ লক্ষ টাকা ও দেড় মণ সোনাসহ একটি ট্রলারে করে সপরিবারে বার্মা পালানোর সময় চালক কৌশলে মুক্তিযোদ্ধা দিয়ে ট্রলারটি আটক করান। ফকা চৌধুরী বিচারাধীন অবস্থায় কারাগারে হার্টফেল করে মারা যান। ফজলুল কাদের চৌধুরী পালিয়ে যাবার সময় ধরা পড়ার পর ৮ জানুয়ারী '৭২ দৈনিক বাংলায় প্রকাশিত 'ফকা চৌধুরী দেড় মণ

সোনাসহ পালাচ্ছিল' শিরোনামযুক্ত প্রতিবেদনটির অংশ বিশেষ উদ্ধৃত হল—

'......জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী ২৫শে মার্চের পর থেকে চাটগাঁয়ে অত্যাচারের যে স্টীমরোলার চালিয়েছিলেন, আইকম্যান বেঁচে থাকলে এই অত্যাচার দেখে নিশ্চয়ই তাকে স্যালুট দিতেন। ২৬শে মার্চের পর থেকে আত্মসমর্পণের কয়েকদিন আগে পর্যন্ত তার বাসায় সবসময় মোতায়েন থাকত পাকবাহিনীর এক প্লাটুন সৈন্য। ফজলুল কাদের চৌধুরীর অনুচরেরা চাটগাঁর বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনত নিরপরাধ লোকজন আর ছাত্রদের। তারপর এদের হাত পা বেঁধে গিরায় গিরায় লোহার ডান্ডা দিয়ে পিটানো হত। তার বাসায় নির্মম অত্যাচারের এতসব কায়দা ও ব্যবস্থা ছিল যে নীরোর যুগে জন্মগ্রহণ করলে তিনি নিশ্চয়ই প্রভোস্ট মার্শালের পদ পেতেন। তাঁর বাসায় এনে নির্মমভাবে পিটানো হয়েছে মরহুম ডক্টর সানাউল্লার এক ছেলেসহ চাটগাঁর কয়েকশ' ছাত্রকে। জুলাই মাসের ১৭ তারিখের রাতে চৌধুরী পাকবাহিনীর সৈন্য নিয়ে ছাত্রনেতা ফারুকের বাসা ঘেরাও করে পাক সৈন্যের দ্বারা ফারুককে হত্যা করায়। ২৫শে মার্চের পর থেকে চৌধুরীর অনুচরেরা বলে বেড়াত যে ইয়াহিয়া খান চৌধুরীকে পাকিস্তান রক্ষার জন্য লে: জেনারেল পদে ভূষিত করেছে। বর্ডারে কি হচ্ছে না হচ্ছে সে সম্পর্কে পাকবাহিনী সব সময় চৌধুরীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছে।

'জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী সাহেবের গুড হিলস্থ বাসায় আজ স্থাপিত হয়েছে মুক্তিফৌজের শিবির। পোল্যান্ডের লোকেরা নাৎসী বন্দী শিবির ডাচাউয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে আজও যে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে, চৌধুরীর বাসার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় চাটগাঁয়ের লোকেরা অনুরূপ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে। কারণ ২৫শে মার্চের পর থেকে স্বাধীনতার আগ পর্যন্ত ওটি ছিল নির্মম অত্যাচারের কেন্দ্র।'

ফজলুল কাদের চৌধুরীর দুই ছেলে সালাউদ্দিন কাদের ও গিয়াস উদ্দিন কাদের চৌধুরী আজ জাতীয় জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত; দুজনেই জাতীয় সংসদ সদস্য। দলবল নিয়ে এসময় এই দুই ভাই বাঙ্গালীদের ধরে এনে নৃশংস অত্যাচার চালাতেন। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর অসংখ্য অপকর্মের দু একটি দৃষ্টান্ত আমরা উল্লেখ করছি।

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, স্ত্রী কুন্ডেশ্বরী ঔষধালয় এবং কুন্ডেশ্বরী বিদ্যাপীঠের প্রতিষ্ঠাতা দানবীর বাবু নতুন চন্দ্র সিংহের হত্যাকান্ডের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন সালাউদ্দিন কাদের। ২৬ শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার পর প্রায় ৪৭ জন অধ্যাপক সস্ত্রীক আশ্রয় নিয়েছিলেন কুন্ডেশ্বরী ভবনে। এ'দের

মধ্যে ছিলেন সৈয়দ আলী আহসান, ডঃ এ আর মল্লিক, ডঃ আনিসুজ্জামান প্রমুখ। পাকবাহিনী চট্টগ্রাম দখলের পর এ'রা সবাই ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যান। বাবু নতুন সিংহকেও যাবার কথা বলেছিলেন সবাই। উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'যদি মরতে হয় দেশের মাটিতেই মরব।' পরিবারের সবাইকে সরিয়ে দিয়ে নিজে কুণ্ডেশ্বরী মন্দিরে অবস্থান করছিলেন। পাকসেনা আসতে পারে অনুমান করে উঠোনে চেয়ার টেবিলও সাজিয়ে রেখেছিলেন।

১৯৭১ সালের ১৩ এপ্রিল চারটি ট্যাংকসহ দুটি জীপে করে পাকবাহিনী কুণ্ডেশ্বরী ভবনে আসে। এর একটিতে বসেছিলেন সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরী। অধ্যক্ষ নতুন চন্দ্র পাকসেনাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে নিজের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করেন। সন্তুষ্ট হয়ে পাকসেনারা জীপে চলে আসে, কিন্তু সালাউদ্দিন কাদের তাদের জানান যে তার বাবার আদেশ আছে 'মালাউন নতুন চন্দ্র ও তাঁর ছেলেদের মেরে ফেলার জন্য।

এরপর মন্দিরের বিগ্রহের সামনে প্রার্থনায় নিমগ্ন সত্তর বছরের মহাপ্রাণ নতুন সিংহকে সালাউদ্দিন টেনে হিচ'ড়ে বাইরে নিয়ে আসেন। প্রথমে ট্যাংকের গোলার আঘাতে তাঁর বহু কষ্টে গড়া বিদ্যামন্দির উড়িয়ে দেয়া হয়। এরপর পাকবাহিনীর মেজর তাঁকে ৩টি গুলি করেন। একটি গুলি তাঁর চোখের নীচে বিদ্ধ হয়, একটি গুলি তাঁর হাতে লাগে এবং তৃতীয় গুলিটি তাঁর বুক ভেদ করে চলে যায়। তিনি চিৎকার করে মায়ের নাম নিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে যান। মেজরের ৩টি গুলির পর সালাউদ্দিন চৌধুরী রিভলবারের ৩টি গুলি ছোড়েন তাঁর দিকে।

খুনীরা চলে যাবার পর তাঁর লোকজনেরা এসে শবের ওপর একটি নতুন আচ্ছাদন দেয়। পাকসেনারা ফিরে এসে এই কাপড়ের আচ্ছাদন সরিয়ে ফেলে। পাকসেনা চলে যাবার পর ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টির মধ্যে আত্মগোপনকারী লোকেরা মৃতদেহের ওপর একটি শতরঞ্চী ঢাকা দেয়। পাকসেনারা আবার ফিরে এসে এই আবরণ সরিয়ে দেয়। এভাবে ৩ দিন তাঁর মৃতদেহ সেখানে পড়েছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের ইতিহাস প্রকল্প প্রণীত পনর খণ্ডের ইতিহাস গ্রন্থে কিভাবে দালালদের ভূমিকা চেপে যাওয়া হয়েছে তার একটি আদর্শ দৃষ্টান্ত হতে পারে এ'টি। ১৯৭২ সালের ১৩ এপ্রিল নতুন চন্দ্রসিংহের মৃত্যু বার্ষিকীতে দৈনিক বাংলায় বিশেষ নিবন্ধ হিসেবে এই হত্যাকাণ্ডের কাহিনী ছাপা হয়। সেখানে হত্যাকারী হিসেবে সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নাম ছাপা হয়েছিল 'কুখ্যাত ফজলুল কাদের চৌধুরীর বড় ছেলে সালাউদ্দিন (যে নাকি এখন লণ্ডনে)' এভাবে।

স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থে এই প্রতিবেদনটি মুদ্রিত করে সূত্র হিসেবে সন তারিখসহ দৈনিক বাংলার নামোল্লেখ করা হয়; শুধু 'কুখ্যাত ফজলুল কাদের চৌধুরীর বড় ছেলে সালাউদ্দিন' কথাটি তুলে দিয়ে লেখা হয় 'জনৈক সালাউদ্দিন'।[১]

চট্টগ্রামের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় মুসলিম লীগের বিশিষ্ট নেতা জহিরুদ্দিন আহমদের দ্বিতীয় পুত্র নিযামুদ্দিন আহমদকে ১৯৭১ সালের ৫ জুলাই ফকা চৌধুরীর গুন্ডা-বাহিনী আন্দরকিল্লা বাসস্ট্যান্ড থেকে ধরে নিয়ে যায়। ধরা পড়ার পর নিযামুদ্দিনকে ফকা চৌধুরীর নির্যাতন কেন্দ্রে ধরে নিয়ে যাওয়া হয়। সালাউদ্দিন কাদের চৌধুরীর নেতৃত্বে ফকা চৌধুরীর গুন্ডাবাহিনী তার ওপর ৮দিন ধরে নির্মম নির্যাতন চালায়। বিশিষ্ট সাংবাদিক সাহিত্যিক মাহবুব-উল-আলমের 'বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থের 'রক্ত-আগুন-অশ্রুজল-স্বাধীনতা' অধ্যায় থেকে নিযামুদ্দিনের জবানবন্দীর অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল, '...আমি ধরা পড়ি ৫ জুলাই। আমাকে ফজলুল কাদেরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে পিঠমোড়া করে বেঁধে ফজলুল কাদেরের পুত্র সালাউদ্দিন, অনুচর খোকা, খলিল ও ইউসুফ বড় লাঠি, বেত প্রভৃতি হাতে আমাকে পিটাতে থাকে। পাঁচ ঘণ্টা মারের চোটে আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি। ৬ জুলাই রাত্রি সাড়ে ১১ টায় আমাকে স্টেডিয়ামে চালান দেওয়া হয়। এ পর্যন্ত আমাকে কিছু খেতে দেওয়া হয়নি, পানি পর্যন্ত না। পানি খেতে চাইলেই বলা হয়েছে : 'তুই শালা হিন্দু হয়ে গেছিস, তোকে পানিও দেওয়া হবে না। ১৩ জুলাই আমাকে জেলখানায় সোপর্দ করা হয়।'[২] এরপর থেকে ১৮ নভেম্বর মুক্তি পাওয়া পর্যন্ত পাক বাহিনী নিযামুদ্দীনের ওপর নির্মম অত্যাচার চালায়।

এই গ্রন্থে আরও লেখা হয়েছে যে, ১৩ এপ্রিল তারিখেই সালাউদ্দিন কাদেরের নেতৃত্বে ফকা চৌধুরীর গুন্ডাবাহিনী গহিরার চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়িতে ঢুকে তাঁর পুত্র কলেজ ছাত্র ও ছাত্রকর্মী দয়াল হরি বিশ্বাসকে ধরে ফেলে ও তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে। বর্তমানে মন্ত্রী এরশাদ সভার সদস্য সালাউদ্দিন কাদেরের এই 'ধর্মরক্ষা অভিযানের' আরও বহু ঘটনা রয়েছে। তাঁর অনুজ গিয়াসউদ্দিন কাদের চৌধুরী সম্পর্কেও এ ধরনের নির্যাতন চালানোর অসংখ্য অভিযোগ রয়েছে।

---

১. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিল পত্র : অষ্টম খণ্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয় প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৮৩ পৃঃ ৫৭৬

২. বাঙ্গালীর মুক্তিযুদ্ধের ইতিবৃত্ত মাহবুব-উল-আলম, নয়ালোক প্রকাশনী আলমীন, কাজীর দেউরী, সেকেণ্ড লেন চট্টগ্রাম, পৃঃ ৬৯

মওলানা আব্দুল মান্নান

এরশাদ সরকারের ধর্মমন্ত্রী মওলানা আবদুল মান্নানও স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় তাঁর ভূমিকা গোপন করতে দিতে তৎপর। সাপ্তাহিক বিচিত্রায় প্রকাশিত 'খোঁচান ক্যান, কিসের বিতর্কিত আমি ?' শিরোনামে একটি সাক্ষাৎকারে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন, তিনি কোন শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন না বা স্বাধীনতা বিরোধী কোন বিবৃতিও দেন নি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় মওলানা মান্নান ছিলেন বাঙ্গালীদের জন্য ত্রাসস্বরূপ। এপ্রিল ১৯৭১ সালে তাঁকে শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় পরিষদে 'কো-অপ্ট' করা হয়। পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতিও দিয়েছেন তিনি বেশ কয়েকবার। এর মধ্যে ১৯৭১ সালের ২৭ এপ্রিল প্রকাশিত তার বিবৃতির একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। '...সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সমূলে উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক জনগণ আজ 'জেহাদের জোশে' আগাইয়া আসিয়াছে। জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় আমাদের সাহসী সশস্ত্র বাহিনী সকল অঞ্চলে দখল কায়েম করিয়া সুদৃঢ়ভাবে তাহাদের কর্তৃত্ব কায়েম করিয়াছে।'

২৭ সেপ্টেম্বর পূর্ব পাকিস্তান মাদ্রাসা শিক্ষক সমিতির সভাপতি মওলানা মান্নানের নেতৃত্বে মাদ্রাসা শিক্ষকদের একটি প্রতিনিধি দল 'খ' অঞ্চলের সামরিক আইন প্রশাসক এবং পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডের কমান্ডার লেঃ জেঃ এ, এ, কে, নিয়াজীর সাথে সাক্ষাৎ করে।

জেনারেল নিয়াজীকে এক কপি কোরান শরিফ উপহার দিয়ে মওলানা মান্নান বলেন, 'পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও ইসলামের গৌরব বৃদ্ধির জন্য আমরা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত।' প্রত্যুত্তরে জেনারেল নিয়াজী বলেন, 'ওলামা, মাদ্রাসা শিক্ষক এবং অপরাপর দেশপ্রেমিক নাগরিকরা যোগাযোগ মাধ্যমগুলো রক্ষা এবং রাষ্ট্রবিরোধীদের নির্মূল করতে পারে।' 'ভারতীয় চরদের মোকাবিলা করার জন্য গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর গঠনের ক্ষেত্রে জেনারেল নিয়াজী তাদেরকে পূর্ণ সহযোগিতার আশ্বাস দেন।

এই বৈঠকের পর মাদ্রাসা শিক্ষক ও ছাত্রদের রাজাকার, আল বদর ও আল-শামস বাহিনীতে অন্তর্ভূক্ত করে সামরিক ট্রেনিং দানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ আলীম চৌধুরীর হত্যায় মওলানা মান্নানের হাত ছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। ২৯, পুরানা পল্টনে ডাঃ আলীম

চৌধুরীর দোতলা বাড়ির এক তলায় তাঁর ক্লিনিক ছিল। প্রতিবেশী দালাল প্রাক্তন স্পীকার এ, টি, এম এ মতিন জোর করে ক্লিনিক তুলে দিয়ে সেখানে মওলানা মান্নানকে ভাড়া দিতে ডঃ আলীমকে বাধ্য করেছিলেন। ১৯৭১ সালের ১৫ ডিসেম্বর বিকেল সাড়ে চারটায় যখন আল বদররা একটি মাইক্রোবাসে করে আলীম চৌধুরীর বাড়িতে আসে তখন প্রথমে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দেন নি। তার কারণ সশস্ত্র আল বদররা সবসময় নীচতলায় মওলানা মান্নানের কাছে আসা যাওয়া করত। কিন্তু কিছুক্ষণ পর কলিংবেল বেজে উঠলে প্রথমে আলীম চৌধুরী বিমূঢ় হয়ে যান। ইতিপূর্বে ডাঃ চৌধুরী এ ধরনের একটা কিছু আঁচ করে বার বার বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মওলানা মান্নান তাঁকে বাড়ি ছেড়ে যেতে বাধা দেন। নিরাপত্তার আশ্বাস দিয়ে মওলানা মান্নান বলেন, ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম এরা তার বন্ধু। আল বদরের ছেলেরা তার ছাত্র। যদি তারা আসে তাহলে তাকে যেন খবর দেওয়া হয়।

লুঙ্গিপরা অবস্থায় আলীম চৌধুরী নীচে নেমে মওলানা মান্নানের দরজায় ধাক্কা দিতে থাকেন। এমনিতে মওলানা মান্নানের দরজা সব সময় খোলা থাকত, কিন্তু সেদিন ছিল বন্ধ। ডাঃ চৌধুরী ক্রমাগত অসহিষ্ণুভাবে দরজা ধাক্কাতে ধাক্কাতে মওলানাকে চিৎকার করে ডাকতে থাকেন। বেশ কিছুক্ষণ পর মওলানা মান্নান ভেতর থেকে বলেন, 'ভয় পাবেন না, আপনি যান, আমি আছি।'

এরপর ডাঃ চৌধুরী ওপরে ওঠার জন্য পা বাড়ান। এ সময় জামাতী গুন্ডারা বলে উঠে, 'হ্যান্ডস আপ, আমাদের সাথে এবার চলুন।' তারা সেই অবস্থায়ই ডাঃ চৌধুরীকে ধরে নিয়ে চলে যায়। পরে রায়ের বাজার বধ্যভূমি থেকে তাঁর গলিত বিকৃত লাশ উদ্ধার করা হয়।

মওলানা মান্নানের সাথে অবশ্য বুদ্ধিজীবী হত্যার অন্যতম নায়ক ব্রিগেডিয়ার কাসেম ও ক্যাপ্টেন কাইয়ুমের সম্পর্ক ছিল। আলীম চৌধুরী হত্যার মাসখানেক আগে ঈদের দিন রাত আড়াইটায় এই দুজন অফিসার 'দাওয়াত খেতে' এসেছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

আলীম চৌধুরীকে নিয়ে চলে যাওয়ার পর তার স্ত্রী শ্যামলী চৌধুরী নীচতলায় এসে বহু অনুনয় বিনয় করেন। কিন্তু তখনও তাঁকে আশ্বাস দেয়া হয় যে ডাক্তার সাহেবকে রোগী দেখার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছে, ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই।

৭১ এর ডিসেম্বরে দৈনিক বাংলা পত্রিকায় 'সেই তিন শয়তান কোথায়?' শিরোনামে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা

যুদ্ধের ইতিহাস গ্রন্থের অষ্টম খণ্ডেও এই ঘটনা সংকলিত হয়েছে।

২৭ ডিসেম্বর মওলানা মান্নানকে রমনা থানায় সোপর্দ করা হয়, কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাঁকে ছেড়ে দেয়া হয় এবং তিনি আত্মগোপন করেন।

দৈনিক আজাদে ৭-৫-৭২ তারিখে মওলানা মান্নানের ছবি ছেপে নীচে 'এই নরপিশাচকে ধরিয়ে দিন' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়—'মুসলিম লীগের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক, পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী, ইসলামিক উপদেষ্টা পরিষদ এবং আইয়ুবী আমলের প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য, শর্ষিণার পীরের একনিষ্ঠ ভক্ত, আই ডি পির সভাপতি এবং ইয়াহিয়ার তথাকথিত পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী, নিয়াজী-ইয়াহিয়া-ফরমান চক্রের অন্যতম দোসর, রাজাকার, বদর বাহিনীর অন্যতম সংগঠক, ইয়াহিয়া জঙ্গী বাহিনীর উর্ধতন সামরিক অফিসারদের তোষামোতকারী খেদমতগার, অসংখ্য বাঙ্গালীর হত্যাযজ্ঞের নায়ক, বিশেষ করে ফরিদগঞ্জ থানার অসংখ্য বাঙ্গালীর হত্যাযজ্ঞের পরামর্শদাতা ও বাড়ীঘর ধনসম্পত্তি নষ্টের সংগঠক, কুমিল্লা জেলার চাঁদপুর মহকুমার ফরিদগঞ্জ থানার তথাকথিত মওলানা আবদুল মান্নান আজও ধরা পড়ে নাই। সে কোথাও আত্মগোপন করে আছে। তাহারই কারসাজিতে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হওয়ার দীর্ঘ তিন মাস পর ফরিদগঞ্জ রাজাকার বাহিনী গঠিত হয়। ফরিদগঞ্জ থানার বিশিষ্ট আওয়ামী লীগার আবদুল মজিদ এবং ২৯/১ পুরানাপল্টনস্থ ডাঃ আমীম চৌধুরীকে হত্যার পিছনে তার হাত ছিল। তাকে ধরিয়ে দিন।'

এক কালে মুসলিম লীগের সমর্থক আজাদ পত্রিকা পর্যন্ত মওলানা মান্নানের স্বাধীনতাবিরোধী তৎপরতাকে কতখানি ঘৃনা এবং ক্ষোভের সঙ্গে বর্ণনা করেছে তার প্রমাণ উপরোক্ত সংবাদভাষ্য।

শাহ আজিজুর রহমান

জিয়া শাসনামলে প্রধানমন্ত্রিত্ব লাভের পর শাহ আজিজুর রহমান স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁর ভূমিকার জন্য তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এমনকি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে জাতীয় সংসদ ভবনের ভেতরেই দু'দুবার দৈহিকভাবে নাজেহাল করেন। এ'সময় বিভিন্ন সংবাদপত্রের সাথে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন জাতিসংঘে বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণা চালানোর জন্য পাকিস্তানী প্রতিনিধি দলটির সদস্য হতে তাঁকে বাধ্য করা হয়েছিল। তিনি নাকি মুক্তিযোদ্ধাদের সহায়তাও করতেন

এবং একারণে পাকবাহিনী নাকি তাঁর বাড়ি আক্রমণ করে কয়েকজনকে আহত করে।

কিন্তু এটি নিছক একটি বানানো গল্প। শাহ আজিজ কিভাবে পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করেছিলেন, সেসময় তাঁর দেয়া বিবৃতি-গুলির যে কোন একটি পড়লেই সে সম্পর্কে আঁচ করা যাবে। এখানে নমুনা হিসেবে ১৯৭১ সালের ৪ মে তাঁর দেয়া দীর্ঘ বিবৃতির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রবল উৎকণ্ঠার সঙ্গে রাজনৈতিক দলসমূহকে অধিকতর স্বাধীনতা প্রদানপূর্বক দেশে পূর্ণ এবং বাধাবিহীন গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজ-নৈতিক দল অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগ এই সুযোগের ভুল অর্থ করে বল প্রয়োগ আর শিরোচ্ছেদের মাধ্যমে নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে জয়লাভ করে অজস্রভাবে নিজেদের খেয়ালখুশীতে দেশ শাসন করার দাবী করে এবং এভাবেই অহমিকা, অধৈর্য্য এবং ঔদ্ধাত্যের ফলে নিজেদের ভাসিয়ে দেয়।'

'আমি সাম্রাজ্যবাদী ভারতের দুরভিসন্ধি নস্যাত করার উদ্দেশ্যে দেশপ্রেমিক সেনাবাহিনীকে সাহায্য করার জন্য জনগণের প্রতি আবেদন জানাচ্ছি।'

শর্ষিণার পীর

১৯৮০ সালে জনসেবা এবং ১৯৮৫ সালে শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য দু'দুবার স্বাধীনতা দিবস পদক পেয়েছেন শর্ষিণার প্রভাবশালী পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ। কিন্তু একাত্তরে তিনি ছিলেন মুখ্য স্বাধীনতা বিরোধী। তাঁর বহুবিধ কার্যকলাপের সামান্য পরিচয় দেবার জন্য স্বাধীনতা পরবর্তীকালের সংবাদপত্র থেকে এ 'টি প্রতিবেদন উদ্ধৃত হল। ৫ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখের দৈনিক পূর্বদেশে প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয়। 'গণহত্যার ঘৃণ্য নায়ক শর্ষিণার পীর গ্রেফতার' শিরোনাম-যুক্ত প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ—

> শর্ষিণার পীর আবু সালেহ মোহাম্মদ জাফর ধরা পড়েছেন গত শনিবার পয়লা জানুয়ারী শর্ষিণা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে বরিশাল সদরে নিয়ে যাওয়া হয়।
>
> গত ১১ই নভেম্বর ৫ শতাধিক রাজাকার, দালাল ও সাঙ্গপাঙ্গসহ মুক্তিবাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করলে তখন থেকে পীর সাহেবকে

গৃহবন্দী করে রাখা হয়।

উল্লেখ্য, নরঘাতক টিক্কা খানের আমলে ঢাকার ফরাসগঞ্জের লালকুঠিতে যে সকল পীর, মাদ্রাসার মোহাদ্দেস মোদাররেস ও দক্ষিণপন্থী রাজনীতিক রাজাকার বাহিনী গঠন, প্রতিটি মাদ্রাসাকে রাজাকার ক্যাম্পে পরিণত করা এবং সকল মা-াসা ছাত্রকে রাজাকার ও পুলিশ বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় শর্ষিণার পীর সাহেব তাদের মধ্যে অন্যতম।

শর্ষিণার পীর সাহেবের 'দাওয়াতে' হানাদার বাহিনী বরিশালের বিভিন্ন স্থানে হত্যাযজ্ঞ চালায় এবং অগ্নিসংযোগ ও লুট করে। শর্ষিণা মাদ্রাসার ৫ শতাধিক তালেবে এলেম প্রায় ৩০টি গ্রামে হামলা চালায় এবং বাড়ী ঘর ও বাজার লুট করে কয়েক কোটি টাকার সোনা, খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র ও নগদ টাকা এনে পীর সাহেবের 'বায়তুল মালে' 'জামানত' হিসাবে জমা করে। তারা হিন্দুদের বাড়ীর ভিটা পর্যন্ত নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছে।

পীর সাহেবের নির্দেশেই তালেবে এলেম রাজাকার এবং হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের একমাত্র পেয়ারা সরবরাহকারী হিন্দু অধ্যুষিত অঞ্চল আট ঘর, কুড়িয়ানা ও ধলারে পাঁচ দিক থেকে একযোগে হামলা চালিয়ে হাজার হাজার পুরুষ, মহিলা ও শিশুকে হত্যা করে এবং তাদের সর্বস্ব লুট করে। সেখানে বাড়ীঘরের তেমনি চিহ্ন নেই। মাদ্রাসার ছাত্র রাজাকাররা এখানে লোহার রড, লাঠির সাহায্যে লোককে হত্যা করা ছাড়াও জঙ্গল ও ধান ক্ষেতে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য মহিলার উপর পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারা প্রতিদিন বিভিন্ন এলাকা থেকে লোক ধরে এনে বেয়নেট চার্জ ও গুলি করে হত্যা করত।

গত রোজার শেষের দিকে পীর সাহেবের নির্দেশক্রমেই হানাদার বাহিনী ৬ দিক থেকে হামলা চালিয়ে স্বরূপকাঠির শিল্প শহর ও বন্দর ইন্দোরহাট পুড়িয়ে দেয় এবং প্রায় এক হাজার নিরীহ লোককে হত্যা করে। তবে মুক্তিবাহিনীর প্রতিরোধে এখানে ২২ জন হানাদার সৈন্য ও শর্ষিণার রাজাকার নিহত হয়। এখানকার স্থানীয় তরুণদের মধ্যে শতকরা ৯০ জনই ছিল মুক্তিবাহিনী এবং মাদ্রাসার কয়েকজন স্থানীয় ছাত্রও মুক্তিবাহিনীর সদস্য ছিল।

বিগত নয় মাস কাল শর্ষিণার পীরের বাড়ী ছিল হানাদার বাহিনীর একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ। এখানে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্য ও পাঞ্জাবী পুলিশ অবস্থান করে বিভিন্ন এলাকায় হামলা চালায় এবং রাজা-

কারদের ট্রেনিং দান করে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণের জন্য পরে এখানে স্বরূপকাঠি থানা স্থানান্তর করা হয়।

বর্তমানে শর্ষিণার রাজাকার এবং দালালরা মুক্তিবাহিনীর তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তবে পীর সাহেবের অনেক সাঙ্গপাঙ্গ ঢাকা, বরিশাল ও অন্যান্য শহরে আত্মগোপন করে আছে।

পাকিস্তানের সাবেক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমল থেকে শর্ষিণা গণবিরোধী চক্রের একটি শক্তিশালী আখড়া ছিল।'

১৯/১২/৭১ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকায় 'সমীপেষু' কলামে শর্ষিণার পীরের নজিরবিহীন দালালী সম্পর্কে একটি চিঠি প্রকাশিত হয়। সেই চিঠিটি ছিল এরকম—

'শর্ষিণার তথাকথিত পীর ও তার সহচরেরা একযুগ ধরিয়া পূর্ব বাংলার যাবতীয় মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে পাকবাহিনীর সহায়ক ও দালাল সৃষ্টি করিতে সক্রিয় সাহায্য ও সহযোগিতা করিয়াছে। এই কুখ্যাত পীর সর্ব প্রথম ঢাকায় ৫৬/এ, প্যারিদাস রোড-এর বাসায় মওলানা আজিজুর রহমান, আবুল খায়ের, আবদুল আজিজ (শর্ষিণা মাদ্রাসা), মওলানা আবদুল মান্নান, মওলানা আমিনুল ইসলাম, পীর ছুফিয়ান ছিদ্দিক (কুমিল্লা), আসাদুজ্জামান চৌধুরী (ফরিদপুর), ফখরউদ্দিন ও আবদুল আজিজ (বরিশাল), মওলানা আবদুস সালাম (পখিরা মাদ্রাসা) প্রমুখ সহচরদের নিয়া টিক্কা খাঁর নিকট দরবার করিয়া ঢাকার লালকুঠিতে জমিয়াতুল মোদাররেছীন-এর একটি সম্মেলন ডাকে। উক্ত সম্মেলনে বাংলাদেশের যাবতীয় মাদ্রাসার সুপার অথবা হেড মওলানাকে উপস্থিত করিয়া মাদ্রাসার অধিকাংশ ছাত্রকে লইয়া রাজাকার, আল-বদর, আল-শামস্ বাহিনী গঠন করে। এবং ছাত্রদিগকে আগ্নেয়াস্ত্রের ট্রেনিং দিয়া বাঙ্গালী নিধনের এবং সামরিক বাহিনীর পূর্ণ সাহায্য ও সহযোগিতা করিতে বাধ্য করে। আওয়ামী লীগ কর্মী তথা প্রগতিশীল বাঙ্গালী ধরিয়া দেওয়া, ধরিয়া আনা, হিন্দু বস্তি এলাকা, বাড়ীঘর পাকবাহিনীকে দেখাইয়া দেওয়া, লুটতরাজ করিয়া অগ্নিসংযোগ করা ইত্যাদি কাজে মাদ্রাসা ছাত্রদের ব্যবহার করা হয়। সামরিক জান্তা যখন বাঙ্গালী পুলিশদের সহযোগিতা লাভে ব্যর্থ হইল ঠিক সেই মুহূর্তে এই কুখ্যাত পীর স্বীয় সহচরদের লইয়া শিক্ষক ও ছাত্রদিগকে নিয়োগের পরামর্শ দান করে। ফলে বহু মাদ্রাসার ছাত্র—শিক্ষক, পুলিশ, রাজাকারে ভর্তি হয় এবং বাঙ্গালী নিধনযজ্ঞ পরিচালনায় খান সেনাদের সাহায্য করে। এই কুখ্যাত ভন্ড

জেনারেল টিক্কা খানের সাথে বৈঠকে মিলিত হন।

স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর ভূমিকা সম্পর্কে ধারণার জন্য ২৪ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখের দৈনিক আজাদ পত্রিকার 'এই মীর জাফরদের ক্ষমা নেই' শীর্ষক ধারাবাহিক উপসম্পাদকীয়র অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

'১৯৭১ সালের ৩রা জুন বিশ্বজনমতকে ধোকা দেয়ার জন্য মহামান্য মহাথেরো খান চক্রের সমন্বয়ে যে বিবৃতি দিয়েছিলেন আমরা পাঠকদের অবগতির জন্যে তা তুলে ধরছি—

'পাকিস্তান বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের প্রেসিডেন্ট মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, পাকিস্তান ৫ লক্ষ বৌদ্ধের প্রিয়জন্মভূমি হিসেবে টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তিনি বলেন যে, বৌদ্ধ যারা এখানে আবহমান কাল ধরে বসবাস করবে তারা দেশের অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে নিজেদের শেষ রক্ত বিন্দু দানে প্রস্তুত রয়েছে।

'মহামান্য বিশুদ্ধানন্দ চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের প্রধানতঃ বৌদ্ধ অধ্যুষিত স্থানগুলোতে ১৭ দিনে দুই হাজার মাইল পথ সফরান্তে আজ সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রসঙ্গতঃ বলেন, আমি আমার কর্মীদল সহ ১৬ই মে থেকে ১লা জুন পর্যন্ত উত্তরে রামগড়, দক্ষিণে টেকনাফ, পূর্বে রাঙ্গামাটি, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন এবং পশ্চিমে ধুম এলাকা সফর করি। আমার সফরকৃত দুই হাজার মাইল এলাকার মধ্যে অন্যান্য সম্প্রদায়ের সাথে প্রধানতঃ বৌদ্ধরাই বসবাস করে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমি পাকিস্তানের সংহতি এবং সকলের বিশেষতঃ পাকিস্তানের বৌদ্ধদের কল্যাণ কাজে অংশ গ্রহণের চেষ্টায় ত্রুটি করি নাই। তিনি তার সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, পাকিস্তানের বৌদ্ধরা ঐক্য, সংহতি ও পাকিস্তানের মর্যাদা রক্ষা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে আমার লোকদের কাছে আমার উপস্থিতি সকল বৌদ্ধদের মনে স্থায়ী শক্তি ও সম্প্রীতির অনুভূতি যোগানোর পক্ষে গভীরভাবে সহায়ক হবে। মহামান্য মহাথেরো প্রসঙ্গতঃ বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবনে মিঃ মংসুয়ে প্রু চৌধুরীর সক্রিয় আগ্রহ ও উপস্থিতিতে আমাকে অভ্যর্থনাকারী বিরাট বৌদ্ধ সমাবেশ এটাই প্রমাণ করে যে, বৌদ্ধরা পাকিস্তান ত্যাগ করে নাই।'

প্রশ্ন উঠতে পারে, বিশুদ্ধানন্দ বৌদ্ধদের নিরাপত্তার জন্য এই সমর্থন দিয়েছিলেন কি'না, সে কারণে দৈনিক পূর্বদেশের ২৩/১/৭২ সংখ্যার 'সমীপেষু' কলামে প্রকাশিত 'দালালরা চেহারা বদলাচ্ছে' শিরোনামে নিম্নলিখিত চিঠি খানি উদ্ধৃত করা যায়—

পীর হিন্দুদের মাল সম্পত্তি এমনকি হিন্দু মেয়েদেরও (মালে গনিমত) 'যুদ্ধ লব্ধ মাল' হিসাবে ফতোয়া দেয়।

রাও ফরমান আলী, ডঃ মালেক বহুবার এই কুখ্যাত পীরের ঢাকাস্থ ৫৬/এ, প্যারিদাস রোডের বাসায় আসিয়া শলাপরামর্শ করিত।

—কাশেফুল হক, শর্ষিণা ও
সৈয়দ আলতাফ হোসেন
ঝালকাঠি, বরিশাল।

শর্ষিণার পীরের নেতৃত্বে সেখানকার দালালরা নিরপরাধ বাঙ্গালীদের উপর কি ধরণের নির্যাতন চালিয়েছে তার একটি বিবরণ পাওয়া যেতে পারে 'বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস' প্রকল্পের অষ্টম খন্ডে। এখানে নির্যাতিতা একজন প্রত্যক্ষদর্শী মহিলার জবানবন্দীর একটি অংশ উদ্ধৃত হল—

'...এক মেয়েকে পেয়ারা বাগান থেকে ধরে এনে সবাই মিলে পাশবিক অত্যাচার চালায়। তারপর তিনদিন যাবত ব্লেড দিয়ে শরীর কেটে কেটে লবন দিয়েছে। অশেষ যন্ত্রণা লাঞ্ছনা দেওয়ার পর মেয়েটিকে গুলি করে হত্যা করে। মেয়েটি মেট্রিক পাশ ছিল। অন্য একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে অত্যাচার চালিয়ে গুলি করে। এখানে অধিকাংশ লোককে গুলি ও বেয়নেট চার্জ করে হত্যা করেছে। শত শত লোককে এই এলাকাতে হত্যা করেছে।'[৩]

বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো

প্রেম এবং অহিংসার বাণী নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন মহামানব গৌতম বুদ্ধ। বৌদ্ধ ধর্মে অহিংসা হল পরম ধর্ম অথচ বাংলাদেশে গণহত্যার সমর্থনে দালাল মওলানাদের সাথে যোগ দিয়েছিলেন দেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতা বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো।

স্বাধীনতা যুদ্ধের নয় মাস বিশুদ্ধানন্দ পাকসেনাদের কার্যকলাপকে অভিনন্দন জানিয়ে বহু বিবৃতি দিয়েছেন, পাকসেনার জন্য সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থান সফর করেছেন। ৬ মে তারিখে তিনি পাকিস্তানের তৎকালীন সহকারী প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আবদুল হামিদ খান এবং লেঃ

---

৩. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিল পত্র : অষ্টম খণ্ড গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, প্রথম সংস্করণ : জুন ১৯৮৪ পৃঃ-৩০৭

'আইরন্ব কর্তৃক টি, কে, কে, পি কে খেতাবে ভূষিত এবং বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের স্বঘোষিত সভাপতি উক্ত মহাথেরো বিগত নয় মাস যাবত হানাদার বাহিনীর পুতুল হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করার পর আজ স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে নিজেদের চেহারা বদলাতে সচেষ্ট। ১৯৭১ সালের মে মাসের প্রথম সপ্তাহে কুখ্যাত টিক্কা খান ও আবদুল হামিদ খানের সাক্ষাতের পর রাও ফরমান আলীর স্বাক্ষরিত পাশ অবলম্বন করে তথাকথিত 'শান্তি কমিটির' মত বিগত নয় মাস তথাকথিত 'শান্তি মিশনের' প্রতিভূ হিসেবে উক্ত মহাথেরো সামরিক বাহিনীর অর্থানুকূল্যে ও প্রহরায় অধিকৃত সরকারের পরিকল্পনা অনুযায়ী বিভিন্ন বৌদ্ধ এলাকা সফর করেন। সফরের পর সংবাদপত্রে ও অধিকৃত বেতারে অসংখ্য বিবৃতির মাধ্যমে হানাদার সরকারের জয়গানে মুখরিত হয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি উক্ত মহাথেরো দেশে ও বিদেশে কিভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন তার প্রামাণ্য কাগজপত্র আমাদের হাতে রয়েছে। প্রয়োজনবোধে এইসব কাগজপত্র সরকার ও জনসাধারণের সামনে উপস্থিত করব।

স্বাধীন দেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের লোকেরা যাতে এই মহাথেরোর মত দালালের রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে দেশ গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করার সুযোগ পায়, সেজন্য তার ভূমিকা সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করে বিভিন্ন দায়িত্ববান মহলকে তার সম্পর্কে সজাগ হতে অনুরোধ জানাই।

ঢাকা প্রবাসী বৌদ্ধরা

২০ জানুয়ারী '৭২ চট্টগ্রামে বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের সমাবেশে বহিষ্কৃত সভাপতি বিশুদ্ধানন্দের কার্যক্রমে 'তীব্র ক্ষোভ ও নিন্দা' প্রকাশ করা হয়।

সবুর খান ও অন্যান্যরা

এই গ্রন্থে মূলতঃ আজকের বাংলাদেশে সমাজের বিভিন্ন স্তরে পুনর্বাসিত দালালদের প্রসঙ্গই উল্লেখ করা হয়েছে; দেশত্যাগকারী বা মৃত প্রথম সারির স্বাধীনতা বিরোধীদের কথাও উল্লিখিত হয় নি। তবু স্মরণ রাখা প্রয়োজন, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে বাঙ্গালী হত্যায় নেতৃত্বদানকারী পরলোকগত স্বাধীনতা বিরোধীদের জাতীয় নেতার মর্যাদা দানের অপচেষ্টা হয়েছে। এ বিষয়ে সামান্য আলোকপাতের জন্য সবুর খানের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা যেতে পারে।

লোকান্তরিত বিশিষ্ট নেতৃবর্গের সঙ্গে জাতীয় গোরস্থানে সমাহিত

করা হয়েছে মুসলিম লীগ নেতা খান, এ, সবুরকে। '৭১ এর গণহত্যায় সহায়তাকারী মুখ্য দালালদের অন্যতম ছিলেন খান, এ, সবুর। রাজাকার বাহিনীকে একটি বৃহৎ সন্ত্রাসবাদী দল হিসেবে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি বিশেষ অবদান রেখেছিলেন। শান্তি কমিটির কার্যক্রমেও তাঁর নেতৃস্থানীয় ভূমিকা ছিল।

১৬ ডিসেম্বর পাকবাহিনীর পতনের পর সবুর খান প্রথমে আত্ম-হত্যা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। ৭২ এর ফেব্রুয়ারীতে মুক্তিবাহিনীর হাতে খান, এ, সবুর ধরা পড়ার পর বিভিন্ন দৈনিক প্রকাশিত প্রতি-বেদনগুলির মধ্যে ২৪ ফেব্রুয়ারী দৈনিক আজাদে প্রকাশিত 'সবুর খান ধরা পড়েছে' শিরোনামের প্রতিবেদনটি ছিল নিম্নরূপ ঃ

'পুলিশ গত মঙ্গলবার ইসলামাবাদের পদলেহী এবং পাক সামরিক গোষ্ঠীর শীর্ষস্থানীয় দালাল জনাব খান এ সবুরকে ঢাকায় গ্রেফতার করেছে। ব্যক্তিগতভাবে খুলনায় এবং বাংলাদেশের অন্যান্য স্থানে হাজার হাজার মানুষ হত্যা পরিকল্পনা পেশের জন্য তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে।

'জনাব সবুর খান কুখ্যাত কাইয়ুম লীগের সেক্রেটারী ছিলেন। পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর একজন পোষা ব্যক্তি হিসেবে তিনি সরকারের বহু উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কুখ্যাত আইয়ুব খানের আমলে জনাব সবুর খান তথাকথিত জাতীয় পরিষদের নেতা এবং মন্ত্রীসভার সর্বাধিক প্রবীণ সদস্য ছিলেন।

'পাকিস্তান সরকারের অধীনে যোগাযোগ মন্ত্রী থাকাকালীন তার বিরুদ্ধে বহু অভিযোগ আনা হয়।

'আজীবন বিশ্বাসঘাতক সবুর খান গত ১৬ ডিসেম্বর তার প্রভু পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর কাপুরুষোচিত আত্মসমর্পণের পর আত্মগোপন করেছিল।'

আমাদের জাতিসত্তার উন্মেষে যে দুজনকে স্থপতি বলে ধরা হয় তাঁরা হচ্ছেন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং শেরে বাংলা এ, কে, ফজলুল হক। এঁদের সন্তানরাও স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সোলায়মান একজন মুখ্য স্বাধীনতাবিরোধী। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর গণহত্যায় সক্রিয় সহায়তা প্রদান ছাড়াও তিনি আওয়ামী লীগের বিশ্বাসঘাতক নেতৃবৃন্দকে নিয়ে একটি নতুন দল এবং রাজাকার বাহিনীর অনুরূপ একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন।

শেরে বাংলার ছেলে প্রাক্তন মন্ত্রী এ, কে, ফয়জুল হকও ছিলেন

একজন মুখ্য স্বাধীনতা বিরোধী। স্বাধীনতা সংগ্রামের নয় মাস তিনি পাকবাহিনীর গণহত্যার সমর্থন সংগ্রহের জন্য সারাদেশে সফর করে বেড়িয়েছেন। স্বাধীনতাযুদ্ধে তাঁর ভূমিকায় পরিচয় দেবার জন্য ১১ এপ্রিল তারিখে তাঁর দেয়া বিবৃতির অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল—

'আমি আমার পূর্ব পাকিস্তানী ভাইদের আমাদের এবং প্রশাসন যন্ত্রের উপর আস্থা রাখার আবেদন জানাচ্ছি। যারা এখনো কোন কারণবশতঃ কিংবা কোন মোহে পড়ে কাজে যোগদান করেন নি, তাদের আমি শুধু বলবো সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে এবং আমরা যদি আমাদের নিজেদের সঠিক পথে ফিরে যাই তা হলে প্রত্যেকটি মিনিটের নিজস্ব একটি মূল্য রয়েছে। ঐক্যবদ্ধভাবে একই মানুষ হিসেবে ছবছর আগে আমরা যেমন ভারতের নগ্ন আক্রমণকে রুখে দাঁড়িয়েছিলাম এখনো তেমনিভাবে তাদের নগ্ন আক্রমণের মোকাবিলার জন্য আমাদের প্রস্তুত করতে হবে। আমরা আমাদের স্বার্থ ও আদর্শের জন্য সংগ্রাম করছি। ইনশাল্লাহ জয় আমাদের সুনিশ্চিত।'

শেরে বাংলার কন্যা রইসী বেগমও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে নয় মাস ধরে সাংগঠনিক তৎপরতা চালিয়েছেন। সে সময় প্রদত্ত তাঁর বহুসংখ্যক বিবৃতির একটির অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল। এই বিবৃতি তিনি দেন ২ মে তারিখে—

'১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ আমাদের ৭ কোটি পূর্ব পাকিস্তানীর জন্য মুক্তির দিন। এদিনে আমরা এক উগ্র মতবাদ থেকে মুক্তিলাভ করেছি। এ মতবাদ ইসলাম ও পাকিস্তানী আদর্শের সম্পূর্ণ বিপরীত-পাক সীমান্তের অপর পারের সংঘবদ্ধ সাহায্যপুষ্ট ও প্ররোচিত মুষ্টিমেয় দেশদ্রোহীর দ্বারা আমরা সন্ত্রস্ত ও ধ্বংসের সম্মুখীন হয়েছিলাম। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ নির্যাতিত অসংখ্য মুসলমানের প্রার্থনা আল্লাহ শুনেছেন এবং পাকিস্তানকে আসন্ন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের সাত কোটি মানুষের পক্ষে আমি আমাদের অদম্য সশস্ত্র বাহিনীর বীর সেনানীদের সালাম জানাই।'

রইসী বেগম আরও বলেন, 'আলহামদুলিল্লাহ, শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুচররা চিরদিনের জন্যে মঞ্চ থেকে অপসারিত হয়েছে। শয়তানী শক্তিকে চূর্ণ বিচূর্ণ করার শক্তি যেন আমাদের অজেয় সশস্ত্র বাহিনীকে আল্লাহ দান করেন।...

'হিন্দুরা কিভাবে মুসলমানদের নিধন করেছে আপনারা তাও জানেন। আপনাদের অবস্থাও সেরকম হতো যদি না আমাদের সেনাবাহিনী যথাসময়ে শেখের দুরভিসন্ধিকে নস্যাৎ করে দিত। আল্লাহর নামে ইসলাম ও

পাকিস্তানের প্রতি অনুগত ও ঐক্যবদ্ধ হউন।'

বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী মাহবুবুর রহমানও একজন উল্লেখযোগ্য স্বাধীনতা বিরোধী। পাকিস্তান ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইয়ুথের সভাপতি হিসেবে ১০ এপ্রিল '৭১ তাঁর দেয়া বিবৃতির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত হল—

'ভারত ইতিপূর্বেই যথেষ্ট পরিমাণে উস্কানী দিয়েছে এবং উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে, বিশ্ব শান্তির ক্ষেত্রে বিশ্বের জনগণের এটা আর চালিয়ে যেতে দেওয়া উচিত হবে না।

'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে ভারত যা করছে, তা হল জাতিসংঘ সনদ ও বান্দুং নীতির খেলাফ এবং সেই সাথে আমাদের সার্বভৌমত্বের ওপর আক্রমণ।

'ভারতীয় বেতারে আমাদের সম্পর্কে মিথ্যা, বিদ্বেষপূর্ণ এবং বিভ্রান্তিকর প্রচারণা বন্ধ করা উচিত। কারণ এটা আমাদের দুর্ভাগ্য ও ক্ষতিই বাড়িয়ে তুলছে।'

জাতীয় জীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন এ ধরনের শত শত স্বাধীনতা বিরোধীর দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে। এই সমস্ত খুনী এবং দালালদের চিহ্নিত করে রাখা প্রয়োজন। এদের ব্যাপারে আরও গবেষণা হওয়া উচিত।

৫

রাজাকার, আল-শামস ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী দল

'রাজাকার' শব্দটির উৎপত্তি হচ্ছে ফার্সী ভাষার 'রেজাকার' থেকে। ফার্সী এই শব্দটি বিশ্লেষণ করলে দুটি অংশ পাওয়া যায়—'রেজা' অর্থ স্বেচ্ছাসেবা দানে আগ্রহী ব্যক্তি এবং 'কার' অর্থ কর্মী। শব্দটির পুরো অর্থ দাঁড়ায় স্বেচ্ছাকর্মী। ভারত বিভক্তির সময় ভারত ইউনিয়নের সাথে একীভূত হতে অনিচ্ছুক হিন্দু প্রধান রাজ্য হায়দারাবাদের নিজাম একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে এই নাম দিয়েছিলেন। সংখ্যা-গরিষ্ঠ হিন্দুজনতার সংগ্রামকে উপেক্ষা করে নিজাম অবশ্য এই অন্যায় অনীহা বেশীদিন বজায় রাখতে পারেন নি, সামান্য শক্তি প্রদর্শনের পর পরই তিনি তাঁর নবাবী ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে ৭১ সালে জামাতের বর্তমান সেক্রেটারী জেনারেল এবং তৎকালীন মজলিশে শুরা সদস্য মওলানা এ, কে, এম, ইউসুফ খুলনায় রাজাকার বাহিনী গঠনের সূত্রপাত করেন। ৯৬ জন জামাত কর্মী নিয়ে রাজাকার বাহিনী গঠনের পর পরই দেশের সর্বত্র এই বাহিনী গঠিত হয়। প্রাথমিকভাবে এই বাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোক অন্তর্ভুক্ত হলেও তাদেরকে তিনভাগে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথমতঃ যারা 'পাকিস্তান' ও ইসলামকে রক্ষার জন্য বাঙ্গালী হত্যা ও মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ করাকে কর্তব্য মনে করেছিল, দ্বিতীয়তঃ যারা লুটপাট, প্রতিশোধ গ্রহণ, নারী নির্যাতন করার একটি সুযোগ গ্রহণ

করতে চেয়েছিল এবং তৃতীয়তঃ গ্রামের দরিদ্র অশিক্ষিত জনগণ যারা সীমান্তের ওপারে চলে যেতে ব্যর্থ হয়—এধরনের লোককে প্রলুব্ধকরণ, বল প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের মাধ্যমে রাজাকার বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এদের অনেকেই যুদ্ধ চলাকালে স্বপক্ষ ত্যাগ করে মুক্তি-যোদ্ধাদের সাথে যোগ দেয়।

আল বদর এবং আল শামস বাহিনী ছিল জামাত ও মুসলিম লীগের নিজস্ব বিশেষ সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। কিন্তু রাজাকার বাহিনী সাধারণভাবে শান্তি কমিটির নেতৃত্বাধীন ছিল। প্রতিটি রাজাকার ব্যাচ 'ট্রেনিং' গ্রহণের পর শান্তি কমিটির স্থানীয় প্রধান তাদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। এই অনুষ্ঠানে সারিবদ্ধভাবে দন্ডায়মান রাজাকার-দের সামনে দিয়ে একজন মোল্লা কোরান শরীফ বয়ে নিয়ে যেতেন; রাজাকাররা সেই কোরান শরীফ ছুঁয়ে আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করত। এর পর রাজাকারদের 'কুচকাওয়াজে' শান্তি কমিটি প্রধান সালাম গ্রহণ করতেন।

শপথ গ্রহণের পর রাজাকাররা শুরু করত তাদের ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান সফরকালে করাচীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জামাত নেতা গোলাম আজম বলেন, 'প্রদেশে রাজাকাররা চমৎকার কাজ করছে। ১০/১২ দিন ট্রেনিংয়ের পরই তারা যুদ্ধকলায় পারদর্শী হয়ে লড়াই শুরু করে দেয়।' দশ বারো দিন 'ট্রেনিং' প্রাপ্ত এই সমস্ত মূর্খ ও অর্ধশিক্ষিত লোকজন স্বাভাবিকভাবেই বুকে প্রতিশোধের বহ্নিজ্বালা নিয়ে মরণপণ লড়াইয়ে রত মুক্তিযোদ্ধাদের সামনে দাঁড়াতেই পারত না। ফলে তাদের মূল কাজ হয়ে দাঁড়ায় গ্রামে গঞ্জে অত্যাচার চালানো।

মে জুন মাসে শান্তি কমিটির উদ্যোগে প্রদেশের সর্বত্র রাজাকার বাহিনী গঠনের পর কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দ এই বাহিনীকে সরকারী স্বীকৃতি প্রদানের জন্য সামরিক সরকারের কাছে আবেদন জানাতে থাকেন। এছাড়া হাফেজ্জী হুজুর, মওলানা সিদ্দিক আহমদ, মওলানা আজিজুর রহমান নেসারাবাদীসহ প্রভাবশালী তথাকথিত আলেমরাও সশস্ত্র স্বেচ্ছা-সেবক বাহিনী গঠনের আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি দেন। ইতিমধ্যে আনসার বাহিনীর বেশীরভাগ সদস্যই মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের জন্য বাহিনী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। ফলে সামরিক আইন প্রশাসক টিক্কা খান আনসার বাহিনীকে রাজাকারে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৯৭১ সালের জুন মাসে টিক্কা খান 'পূর্ব পাকিস্তান রাজাকার অর্ডিন্যান্স ১৯৭১' জারী করেন। এই অর্ডিন্যান্স বলে ১৯৫৮ সালের আনসার এ্যাক্ট বাতিল বলে ঘোষণা করে আনসার বাহিনীকে বিলুপ্ত করা হয় এবং আনসার বাহিনীর সমস্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, মূলধন ও দায়

এবং রেকর্ডপত্র রাজাকার বাহিনীর কাছে হস্তান্তর করা হয়। আনসার বাহিনীতে তখন পর্যন্ত থেকে যাওয়া এ্যাডজুট্যান্টদের রাজাকার এ্যাডজু-ট্যান্ট নিযুক্ত করা হয়। এই অর্ডিন্যান্সে আরও বলা হয়, প্রাদেশিক সরকারের সিদ্ধান্ত অনুসারে যে সমস্ত ব্যক্তিকে রাজাকার বাহিনীতে ভর্তি করা হবে তাদের ট্রেনিং ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করা হবে এবং নির্ধারিত ক্ষমতাবলে রাজাকাররা তাদের দায়িত্ব পালন করবে।

আনসার বিলুপ্ত করে রাজাকার বাহিনী গঠনের অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল আনসারে ভর্তি ও প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য যে সমস্ত কড়াকড়ি ও বাধ্যবাধকতা ছিল তা দূর করা, যাতে যে কেউ রাজাকার বাহিনীতে নাম লেখাতে পারে। এর ফলে অতি দ্রুত সারাদেশের স্থানীয় গুন্ডা, টাউট ও মাদ্রাসা ছাত্ররা এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এই অবস্থায় পূর্বতন এ্যাডজুট্যান্টদের উপর এই বাহিনীর দায়িত্ব দিয়ে রাখতে শান্তি কমিটি অনীহ হয়। কিছুদিন পর জামাতে ইসলামীর ছাত্রফ্রন্ট ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা নেতৃবৃন্দকে স্ব-স্ব জেলার রাজাকার বাহিনীর প্রধান করা হয়। ছাত্রসংঘ নেতা মোহম্মদ ইউনুসকে রাজাকার বাহিনীর সর্বাধিনায়ক করা হয়। রাজাকার বাহিনীর নেতৃবৃন্দ শান্তি কমিটির সভায় উপস্থিত থেকে বক্তব্য পেশ করত এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়ন করত। এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য ১৪ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটির সভার উল্লেখ করা যেতে পারে। ২১ আগস্ট দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত এই সভার খবরে বলা হয়, '১৪ আগস্ট চট্টগ্রাম জেলা শান্তি কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা শান্তি কমিটির আহবায়ক মাহমুদুন্নবী চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় পাকিস্তান জমিয়াতে তালাবায়ে আরাবিয়ার চট্টগ্রাম শাখা সভাপতি হাফেজ মকবুল আহমেদ, প্রাক্তন জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী, শহর ইসলামী ছাত্রসংঘ সভাপতি ও জেলার রাজাকার বাহিনী প্রধান মীর কাসেম আলী প্রমুখ বক্তব্য পেশ করেন।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এবং ক্যাম্পাসের অন্যান্য মাঠগুলোকে রাজাকারদের প্রধান প্রশিক্ষণ স্থল করা হয়। পি পি পি নেতাদের রাজাকার সমালোচনার প্রতিবাদে জামাতী নেতাদের ২৮ নভেম্বর তারিখের বক্তব্য থেকে জানা যায় কোম্পানী কমান্ডার পর্যন্ত জুনিয়র নেতৃত্ব ছিল রাজাকারদের নিজেদের, এর উপরের নেতারা ছিল ছাত্রসংঘ কর্মীবৃন্দ। এরা একই সাথে ছিল রাজাকার এবং আল বদর। পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে এদের ট্রেনিং দেয়া হত। ঢাকায় এই উচ্চপদস্থ রাজাকারদের ট্রেনিং মূলতঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলাভবন সংলগ্ন মাঠ

এবং ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের আল বদর হেডকোয়ার্টারের মাঠে অনুষ্ঠিত হত।

আগস্টের শুরুর দিকে রাজাকার বাহিনী মোটামুটি ভাবে একটি আধাসামরিক বাহিনীতে পরিণত হয়। এসময় এদের সাংগঠনিক পরিচয় পাওয়া যাবে ১৪ আগস্ট 'আজাদী দিবসে' শান্তি কমিটির মিছিলের আগে কুচকাওয়াজকারী রাজাকার দলের একটি সংবাদ থেকে।

১৫ আগস্ট দৈনিক পাকিস্তানে এই মিছিলের বর্ণনা দিয়ে বলা হয়, 'মিছিলে কয়েকশত পুরো ইউনিফর্ম, বাহুতে ব্যাজ, মাথায় সবুজ টুপিধারী সশস্ত্র রাজাকার দৃপ্ত পদক্ষেপে কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে যায়।'

রাজাকার বাহিনীর সদস্য সংখ্যা সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য ১৭ অক্টোবর চট্টগ্রামে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্য আবুল কাসেমের বক্তৃতার একটি অংশ তুলে ধরা যেতে পারে। এই ভাষণে আবুল কাসেম বলেন, ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও প্রয়োজনীয় অস্ত্রে সজ্জিত রাজাকারের সংখ্যা এখন ৫৫ হাজার। রাজাকারদের সংখ্যা ১ লক্ষে বৃদ্ধির পরিকল্পনা রয়েছে এবং প্রত্যেক ইউনিয়নে পর্যাপ্ত রাজাকার মোতায়েন করা হবে, এছাড়া পুলিশ বাহিনী তো থাকবেই।'

রাজাকার বাহিনী এ সময় সাংগঠনিক ভাবে এত শক্তিশালী হয় যে ২৩ নভেম্বর রাজাকার ডিরেকটরেটের এক হ্যান্ড আউটে রাজাকারদের বেতন ও ভাতা বাড়িয়ে মুজাহিদদের সমান করার কথা ঘোষণা করা হয়। ঘোষণায় বলা হয় নয়া ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকাররা সেনাবাহিনী ও মুজাহিদদের মত ফ্রি রেশন পাবে। ১ ডিসেম্বর থেকে কার্যকর এই ব্যবস্থা অনুযায়ী রাজাকারদের বেতনের হার নির্ধারণ করা হয়—কোম্পানী কম্যান্ডার রেশনসহ ৩০০ টাকা ও রেশন ছাড়া ৩৫৫ টাকা; প্লাটুন কম্যান্ডার রেশনসহ ১৩৫ টাকা ও রেশন ছাড়া ১৮০ টাকা; সাধারণ রাজাকার রেশন সহ ৭৫ টাকা ও রেশন ছাড়া ১২০ টাকা। সে সময়কার দ্রব্য মূল্যে অনুযায়ী এই উচ্চ বেতন (১২০ টাকায় তখন ৪ মণ চাল পাওয়া যেত।) নির্ধারণ করা হয়েছিল মূলতঃ দরিদ্র মানুষকে বিপুল সংখ্যায় রাজাকারে ভর্তি হতে প্রলুব্ধ করবার জন্য।

রাজাকার বাহিনীতে নানা শ্রেণীর লোক ভর্তি হলেও এর মূল নেতৃত্ব ছিল জামাতের হাতে। ইসলামী ছাত্রসংঘের জেলা প্রধানরা ছিল স্ব স্ব জেলার রাজাকার প্রধান। সেসময় রাজাকারদের সমালোচনার জবাবও সে কারণেই জামাতে ইসলামীকে দিতে হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দৈনিক সংগ্রামের সম্পাদকীয় অংশবিশেষ উদ্ধৃত হতে পারে—

...ঠিক একারণেই পাকিস্তানী বেতার রেজাকারদের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

প্রত্যহ তারা রেজাকার, মোজাহেদ ও আল বদর বাহিনীর অভাবনীয় সাফল্যের খবর পরিবেশন করছে। পাকসেনানায়করা আর সরকার রেজাকারদের কৃতিত্বে আনন্দিত ও গর্বিত।

'পশ্চিম পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল পিপলস পার্টি ও তার মুখপত্র মুসাওয়াত সম্প্রতি ঠিক পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক দল নিষিদ্ধ আওয়ামী বিদ্রোহীদের সুরে সুর মিলিয়ে রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার শুরু করেছে। এমনকি সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সংগৃহীত রেজাকারদের দল বিশেষের নামে চালিয়ে এ আধা সামরিক সরকারী বাহিনীতে রাজনীতি ঢুকাবার অবৈধ প্রয়াসের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দেশের অখন্ডত্বের জন্য আত্মোৎসর্গী একমাত্র নির্ভরযোগ্য স্থানীয় বাহিনীর বিলুপ্তির ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে।

'যে রেজাকারদের সর্বদলীয় শান্তি কমিটির সহযোগিতায় সামরিক সরকারই বাছাই করছেন এবং ট্রেনিং দিয়ে তাদেরই নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগিয়েছেন তারা কি করে দল বিশেষের পক্ষ হয়ে অন্যান্য দলের কর্মীদের খতম করছে ভাবতে অবাক লাগে। অপবাদ মূলতঃ সামরিক সরকারকে কি দেওয়া হচ্ছে না ?

'সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রেজাকাররা যখন শুধু ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দালালদের খতম করছে, তখন তা যদি অন্য কোন দলের কর্মী নিপাত করা হয়ে থাকে তো মানতে হবে, সে দলের কর্মীরা নিঃসন্দেহে ভারতীয় দালালী করছে।' ১

স্বাধীন বাংলাদেশে রাজাকার বাহিনীর কোন সুশৃংখল পুনর্বাসন ঘটে নি। একাত্তরে এরা ছিল মূলতঃ বলির পাঁঠা;পাকবাহিনী এদেরকে যুদ্ধের ঢাল হিসেবে বিপুল হারে ব্যবহার করেছে। স্বাধীনতার পর পরই এই বাহিনীর সাধারণ সদস্যদের কেউ কেউ জনরোষের শিকার হয়েছে, বেশীর ভাগই অস্ত্র শস্ত্র ফেলে দিয়ে জনতার মাঝে মিশে গেছে। উল্লেখ্য দালাল আইনের অধীনে বাংলাদেশের গণহত্যায় দায়ী ব্যক্তিদের মধ্যে একমাত্র যাকে মৃত্যুদন্ড দেয়া হয় সে ছিল একজন রাজাকার। ১৯৭১ সালের ১৯ অক্টোবর কুষ্টিয়ার মীরপুরের আবদুল গফুরকে হত্যা করে তার কন্যা দুলালী বেগমকে অপহরণ করে উপর্যুপরী ধর্ষণের অভিযোগে কুষ্টিয়ার রাজাকার চিকন আলীকে ১০-৬-৭২ তারিখে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়। চিকন আলীর বিরুদ্ধে হত্যা, লুট, ধর্ষণ ও অগ্নিসংযোগের আরও বহু অভিযোগ ছিল. কিন্তু ইতিমধ্যে চরম শাস্তির আদেশ হওয়ায় অন্যান্য অভিযোগের বিচার হয় নি।

১. 'রেজাকারদের বিরুদ্ধে বিষোদগার' দৈনিক সংগ্রাম ৬ সেপ্টেম্বর '৭১

বিবাদী পক্ষের কৌসুলী অবশ্য চিকন আলীকে বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে দাবী করে তা প্রমাণের জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান।

রাজাকার বাহিনীর যারা ছিল চাঁই, তারা অবশ্য তাদের প্রতিপত্তি ফিরে পেয়েছে। এদের মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ আজ জামাতের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে পুনর্বাসিত। স্থানীয় নেতারা জামাত, মুসলিম লীগ ও অন্যান্য ডানপন্থী দলে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এখানে একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যায়।

রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র মতিঝিল, ফকিরাপুল, আরামবাগের রাজাকার বাহিনীর কমান্ডার ছিলেন ফিরোজ মিয়া। ১৮৯ নং ফকিরাপুলে ছিল তার অফিস। স্বাধীনতা সংগ্রামের ৯ মাস ফিরোজ মিয়া ছিলেন ওই এলাকার ত্রাস স্বরূপ। ফকিরাপুলের পুরনো বাসিন্দাদের সাক্ষ্য অনুযায়ী ফিরোজ মিয়া বহু বাঙ্গালীকে ধরে নিয়ে গেছেন, যাদের কেউই আর ফিরে আসে নি। জামাতে ইসলামীর গুন্ডা ও স্থানীয় অবাঙ্গালী তরুণদের নিয়ে ফিরোজ মিয়া প্রায় ৩০০ সদস্যের একটি রাজাকার প্লাটুন গড়ে তোলেন। এই বাহিনী ফকিরাপুল ও আরামবাগের শত শত লোককে হত্যা করে, বাঙ্গালী মেয়েদের নির্যাতন করে এবং পাকবাহিনীর হাতে তুলে দেয়। স্বাধীনতার পর এই প্লাটুনের একটি ছবি দৈনিক বাংলা পত্রিকায় ছাপানো হয়। ছবিটিতে দেখা যায় কাঁধে রাইফেল নিয়ে এক পা সামনে বাড়িয়ে 'অ্যাটেনশন' হয়ে দাঁড়ানো রাজাকার প্লাটুনের সামনে এক ব্যক্তি বিরাট চাঁনতারা পতাকা কাঁধে দণ্ডায়মান। পাশে কালো স্যুট পরিহিত ফিরোজ মিয়া নোটবুককে কি যেন দেখছেন; সম্ভবত রাজাকারদের রোল কল করছেন। ফিরোজ মিয়ার অত্যাচারের স্বরূপ বর্ণনার জন্য তাঁর হাতে অত্যাচারিত ফকিরাপুলের জনৈক বাসিন্দা নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন কৃতি ফুটবল খেলোয়াড়ের জবানবন্দী এখানে উদ্ধৃত হতে পারে—

'ফিরোজ মিয়ার দল আমাকে ধরে নিয়ে যাবার পর প্রথমেই একটি বাড়িতে নিয়ে রুলার দিয়ে বেদম প্রহার করে। প্রহারের ফলে আমি বহুবার অচেতন হয়ে গেছি। আজ যেখানে সংকীর্ণ গলির ভেতর ফিরোজ মিয়ার অফিস তার উল্টো দিকে ছিল এই বাড়িটি। কয়েক দিন পরে আমাকে ফিরোজ মিয়ার রাজাকার অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়। এখানেও আমাকে মাটিতে শুইয়ে, সিলিং থেকে ঝুলিয়ে ফিরোজ মিয়া বহু মারধোর করে। এই বাড়িতে বহু ভদ্র ও শিক্ষিত বাঙ্গালী মেয়েকে ধরে এনে রাখা হয়েছিল। এদের ওপর প্রতিদিন প্রতিরাতে চরম নির্যাতন চালানো হত। নির্যাতনের সময় বহু মেয়ে ফিরোজ মিয়ার হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করে বলত 'আমি তোমার বোন, আমাকে ছেড়ে দাও।'

ফিরোজ মিয়া অবশ্য কাউকেই নিস্তার দেয়নি।'

ফিরোজ মিয়া যদি তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ অস্বীকার করেন তা হলে কি হবে এই প্রশ্নের উত্তরে জবানবন্দীদাতা বলেন, 'তা হলে সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসুন। আমি সাক্ষী দেব আর সাক্ষী দেবে ফকিরাপুলের মানুষ।' এ পর্যায়ে তিনি পিঠের কাপড় খুলে নির্যাতনের চিহ্নগুলো দেখিয়ে বলেন, 'আমি মিথ্যা বলতে পারি, কিন্তু এগুলো তো আর মিথ্যা হতে পারে না।'

১৬ ডিসেম্বর বিকেলে ফিরোজ মিয়াকে ক্ষিপ্ত এলাকাবাসী পিটিয়ে মেরে ফেলার উপক্রম করে। এ সময় এলাকার মুরুব্বী স্থানীয় লোক-জন তাকে রমনা থানায় সোপদ করেন। কিন্তু ১০ জুলাই ফিরোজ মিয়া ছাড়া পেয়ে ফকিরাপুলের নিজ বাড়িতে চলে আসেন। ইতিমধ্যে ফিরোজ মিয়ার বেশ কয়েকজন দোসর স্বাধীনতার পর পরই আওয়ামী লীগের নেতা সেজে গিয়েছিলেন। তাদেরই সহায়তায় ফিরোজ মিয়ার বিরুদ্ধে মামলা তুলে নেয়া হয়। এরপর থেকে পুনর্বাসনের স্বাভাবিক ধারায় ফিরোজ মিয়া এখন ওই একই এলাকার পৌরসভার ওয়ার্ড চেয়ারম্যান ও জাতীয় পার্টির স্থানীয় নেতা।

আল-শামস বাহিনীটি সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। তবু এতটুকু বোঝা যায় যে, জামাতে ইসলামের ছাত্র ফ্রন্ট ইসলামী ছাত্র সংঘকে আল বদর বাহিনীতে রূপান্তরিত করার পর অন্যান্য দলের ছাত্র সংগঠনগুলো একত্রিত হয়ে আল-শামস গঠন করে। এই দলে মুসলিম লীগপন্থী ছাত্র সংগঠনসমূহ এবং জামাতসহ মাদ্রাসা ছাত্রদের সংগঠন জমিয়তে তালাবায়ে আরাবিয়ার প্রাধান্য ছিল। এদের কার্যক্রম মোটা-মুটিভাবে আল বদরের অনুরূপ ছিল, বুদ্ধিজীবী হত্যায়ও এদেরকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হয়।

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে আল-শামসের নেতৃবৃন্দ নিশ্চয়ই সমাজের উচ্চ তলাতেই পুনর্বাসিত হয়েছে. তবু তাদের পরিচয় এখনও অজানা রয়ে গেছে। এই গ্রন্থ রচনার জন্য তথ্য সংগ্রহের সময় আল শামস বাহিনীর তিনজন নেতার পরিচয় পাওয়া গেছে, কিন্তু সুনির্দিষ্ট লিখিত দলিলের ভিত্তিতে নয় বলে তাদের নাম উল্লেখ করা সমীচীন হবে না। এদের মধ্যে মোহাম্মদপুর আল শামসের প্রধান একটি সুপরিচিত ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রিকার বিজ্ঞাপনী কর্মকর্তা। কেন্দ্রীয় কম্যান্ডের অন্য দুজনের একজন একটি প্রখ্যাত বিজ্ঞাপনী সংস্থার কর্মকর্তা এবং অন্যজন একটি রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানীর মহাব্যবস্থাপক ছিলেন, এখন একজন প্রতিষ্ঠিত শিল্পপতি।

মুজাহিদ বাহিনী ছিল একটি নিয়মিত আধা সামরিক বাহিনী। বাঙালী নিধনের ক্ষেত্রে আল বদর ও আল-শামস বাহিনীর পর এই বাহিনীই সর্বাধিক নৃশংসতার পরিচয় দিয়েছিল। এই বাহিনী সম্পর্কেও যথেষ্ট তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি; তবে এদের সম্পর্কে গবেষণার প্রয়োজন আছে। সংখ্যায় এরা প্রায় রাজাকার ও আল বদর বাহিনীর সমান ছিল।

পাকিস্তান আমল থেকেই জামাতে ইসলামীর রাজনীতির একটি বৈশিষ্ট্য হল, এরা সমাজের সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে নিজস্ব ক্যাডার তৈরী করে। ১৫ বছরের নীচের শিশু, কিশোরদের নিয়ে জামাতে ইসলামীর একটি সংগঠন ছিল সে সময় 'শাহীন শিবির' নামে। এই শিশুদেরকে দিয়েও একটি বাহিনী গঠন করা হয়েছিল 'শাহীন ফৌজ' নাম দিয়ে। দৈনিক সংগ্রামের শিশু কিশোর বিভাগ 'শাহীন শিবিরে' সে সময় প্রকাশিত বিভিন্ন ফিচার দেখে বোঝা যায়, এদের মধ্যেও অদ্ভুত রণোন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এদের অনেকে আল বদর বাহিনীর সাথে 'অপারেশন' করেছে। তৎকালীন পূর্বাঞ্চলীয় পোস্ট মাস্টার জেনারেল এবং জামাত নেতা জনৈক শান্তি কমিটির সদস্য ছিলেন এই বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক।

ইস্ট পাকিস্তান সিভিল আর্মড ফোর্স সংক্ষেপে 'ইপকাফ', ইস্ট পাকিস্তান ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, রেঞ্জার ইত্যাদি দল ছিল নিয়মিত আধা সামরিক বাহিনী। এদের নেতাদের সম্পর্কেও তথ্য উদ্ধার করা সম্ভব হয় নি। অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীগুলির মধ্যে পাইওনিয়ার ফোর্স, লাকসাম শান্তি কমিটির শক্তিবাহিনী, রেলওয়ে ভল্যান্টিয়ার ফোর্স, 'আজাদী বাহিনী' ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য।

৬

পুনর্বাসিত আল বদর

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সারা দেশে হানাদার বাহিনীর বর্বর সৈন্যরা এবং তাদের এদেশীয় দালাল ঘাতকরা যে নৃশংসতম হত্যাকান্ড চালিয়েছে তার ভেতর সবচেয়ে মর্মান্তিক হচ্ছে '৭১-এর ডিসেম্বরের মধ্য ভাগে সংঘটিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড। অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় নিখুঁত পরিকল্পনা অনুযায়ী জামাতে ইসলামীর সদস্যদের দ্বারা গঠিত আল বদর বাহিনী এই হত্যাকান্ড চালায়।

হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের পর যখন মোহাম্মদপুর ও মীরপুর এলাকার বধ্যভূমিগুলোতে দেশের সেরা সন্তানদের লাস খুঁজে পাওয়া যায়, পত্রিকায় তার বিবরণ পড়ে গোটা বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হয়ে পড়ে।

বধ্যভূমি ঃ প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ

'আর একটু এগিয়ে যেতেই সামনে বড় বড় দুটো মস্ত মানুষ, নাক কাটা, কান কাটা—মুখের কাছ থেকে কে যেন খামচিয়ে মাংস তুলে নিয়েছে, হাত পা বাঁধা। দুদিন পর্যন্ত লাশ দুটো ওখানে পড়েছিল। সনাক্ত হয়নি। ফর্সা বড় বড় দুটো মানুষের বীভৎস বিকৃত চেহারা এখনও ভেসে উঠে। পরে ওখানকার বাসিন্দারা মাটি চাপা দিয়ে দিয়েছে।

'আর একটু এগিয়ে যেতেই বাঁ' হাতের যে মাটির ঢিপিটা ছিল তারই পাদদেশে একটি মেয়ের লাশ। মেয়েটির চোখ বাঁধা। গামছা দুটো আজও ওখানে পড়ে আছে। পরনে কালো ঢাকাই শাড়ী ছিল। এক পায়ে মোজা ছিল। মুখ ও নাকের কোন আকৃতি নেই। কে যেন অস্ত্র

দিয়ে তা কেটে খামচিয়ে তুলে নিয়েছে। যেন চেনা যায় না। মেয়েটি ফর্সা এবং স্বাস্থ্যবতী। স্তনের একটা অংশ কাটা। লাশটা চিৎ হয়ে পড়ে আছে। বিভৎস চেহারার দৃশ্য বেশীক্ষণ দেখা যায় না। তাকে আমি চিনতে পারিনি। পরে অবশ্য সনাক্ত হয়েছে যে, মেয়েটি সেলিনা পারভীন। "শিলালিপি"র এডিটর। তার আত্মীয়রা বিকেল বেলায় খবর পেয়ে লাশটি তুলে নিয়ে গেছে।

'আর একটু দূরে যেতেই দেখতে পেলাম, একটি কংকাল, শুধু পা দুটো আর বুকের পাঁজরটিতে তখনও অল্প মাংস আছে। বোধ হয় চিল শকুনে খেয়ে গেছে। কিন্তু মাথার খুলিটিতে লম্বা লম্বা চুল। চুলগুলো ধুলো কাদায় মিশে যেয়ে নারী দেহের সাক্ষ্য বহন করছে।

'আর একটু এগিয়ে যেতেই একটা উঁচুস্থানে বেশ কয়েকজন লোক দাঁড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে কি যেন দেখছে। আমি উপরে উঠতেই একজন ভদ্রলোক হাত বাড়িয়ে আমাকে উপরে উঠিয়ে নিলেন। সামনে চেয়ে দেখি, নীচু জলাভূমির ভিতর এক ভয়াবহ বিভৎস দৃশ্য। সেখানে এক নয়, দুই নয়, একেবারে বারো তের জন সুস্থ সবল মানুষ। একের পর এক শুয়ে আছে। পাশে দুটো লাশ, তার একটির হৃৎপিন্ড কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। সেই হৃৎপিন্ড ছেড়া মানুষটিই হল ডঃ রাব্বী। পাশের গাদাটিতে রমনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান ইয়াকুব আলী আর ইত্তেফাকের সিরাজউদ্দিন হোসেন। পাশের একজন বললেন মুনীর চৌধুরীর লাশও এখানে ছিল। কবীর চৌধুরী সকালবেলা এসে দেখে গিয়েছেন।

'প্রায় ঘন্টাখানেক আমি সেখানে ছিলাম। আসতে পারিনি। এক একে সবাই এসে এখানে হাজির হচ্ছে। ডঃ রাব্বীর লাশটা তখনও তাজা। জল্লাদ বাহিনী বুকের ভেতর থেকে কলিজাটা তুলে নিয়েছে। তারা জানতো যে তিনি চিকিৎসক ছিলেন। তাই তার হৃৎপিন্ডটা ছিঁড়ে ফেলেছে। চোখ বাঁধা অবস্থায় কাৎ হয়ে দেহটা পড়ে আছে। পাড় থেকে ধাক্কা দিয়ে গর্তের মধ্যে ফেলে দেয়া হয়েছে। রাব্বী সাহেবের পা দুখানা তখনো জ্বল জ্বল করে তাজা মানুষের সাক্ষ্য দিচ্ছে। নাক মুখ কিছুই অক্ষত ছিলনা। দস্যু হায়েনার নখের আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত।

'সামনের দিকে তাকাতেই দেখলাম, রমনা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব ইয়াকুব আলীকে। প্যান্ট ও গেঞ্জিতে তখনও তাজা রক্তের দাগ। কোন মানুষের গায়ে শার্ট ছিলনা। খুলে ফেলে সবাইকে গেঞ্জি পরিয়ে দিয়েছিল। তারপর নৃশংস অত্যাচার করে মানুষগুলোকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। পরে বুকের মাঝে গুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে। এক বছর এক

সাথে ইয়াকুব সাহেবের সাথে কাজ করেছি। কিন্তু তাকেও আমি প্রথম দৃষ্টিতে চিনতে পারিনি। অনেক লক্ষ্য করবার পর চিনলাম, তিনি ইয়াকুব সাহেব। তিনি তো মুসলিম লীগের লোক। তবে এরা তাঁকে হত্যা করলো কেন ?

'সবাই বলে এটা সিরাজউদ্দিন হোসেনের লাশ। আত্মীয়স্বজন এই বিভৎস কঠোর বাস্তব সত্যকে স্বীকার করে নিতে পারেনি। আজও আশা করে আছে, সিরাজউদ্দিন হোসেন ফিরে আসবে। বিকেল বেলা ওখানে এক ভদ্র মহিলা এসে আমাকে বললেন, দেখুন, দেখুন এটা নিশ্চয় সিরাজ ভাই-এর লাশ, সিরাজ ভাই ডান হাতে একটি মাদুলী পরতেন। ঐ দেখুন, সিরাজ ভাই-এর হাতে মাদুলীটা রয়েছে। আমাদের বাড়ীর কলতলায় স্নান করতেন। এটা ঠিকই সিরাজ ভাই। তার একজন সহকর্মী সম্পাদকও ঐ একই সঙ্গে সিরাজের লাশ বলে সনাক্ত করেন। খন্দকার ইলিয়াস সাহেবও আমাদের সাথে একমত যে, এটা নিশ্চয়ই সিরাজউদ্দিনের লাশ।

'ঐ স্থানটি থেকে বিকেলের দিকে পরপর তিনটা লাশ তুলে পাশাপাশি চাদরে রাখা হয়েছে। তারা তিন ভাই। গোপীবাগে তাদের বাড়ী। তাদের মধ্যে একজন ডাক্তার আর একজন মেম্বার। তিনটি তাজা কালো পাথরে খোদাই করা সবল মানুষ। একেবারে তাজা। যেন ঘুমিয়ে আছে। এদের দেহগুলো তত বিকৃত নয়। একজনের হাতে তখনও লম্বা লাল পাথরের আংটি রয়েছে। ভদ্রলোকদের দোষ তাদের ভাগ্নে মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিয়েছে।

'তখনো দলে দলে নারী পুরুষ খুঁজে বেড়াচ্ছে তাদের হারিয়ে যাওয়া আত্মীয়-স্বজনকে। আর একটু দূরে যেতেই আর একটা গর্তের মধ্যে প্রায় ৭/৮ টা লাশ। ঠিক চেনা যায় না কার কার লাশ। বিকৃত বীভৎস এই লাশগুলো। প্রত্যেকটির গায়ে তখনো অত্যাচারের দাগগুলো ঘায়ের মত দগ দগ করে জ্বলছে। এমনও পৈশাচিক হত্যাকান্ড যে এই বিংশ শতাব্দীর যুগে ঘটতে পারে, তা সভ্য মানুষের বুদ্ধির অগোচরে।

'দু'তিন বছর আগে প্রেস ক্লাবে ভিয়েৎনামে আমেরিকান সৈন্যদের অত্যাচারের ছবি দেখেছিলাম। সে অত্যাচার মনে হলো এই বদর-বাহিনীর অত্যাচারের কাছে কিছুই নয়। ভিয়েৎনামের যুদ্ধে অনেক ভিয়েৎকঙ প্রাণ দিয়েছে। কিন্তু বদর-বাহিনীর মত তারা এমন বেছে বেছে বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করেনি।

'ডঃ আলিম চৌধুরীর মত চক্ষু বিশেষজ্ঞ একদিনে তৈরী করা যাবেনা। আর শহীদুল্লাহ কায়সারের মত সাংবাদিক-সাহিত্যিকও একদিনে তৈরী

করা যাবেনা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লগ্নে এমন পৈশাচিক হত্যাকান্ড যে সংঘটিত হবে একথা কেউ ভাবতে পারেনি।

'মাঠের পর মাঠ চলে গিয়েছে। প্রতিটি জলার পাশে পাশে হাজার হাজার মাটির ঢিবির মধ্যে মৃত কংকাল সাক্ষ্য দিচ্ছে কত লোক যে এই মাঠে হত্যা করা হয়েছে।'

১৯৭২ সালের ২ জানুয়ারী দৈনিক আজাদে প্রকাশিত অধ্যাপিকা হামিদা রহমানের লেখা 'কাটাসুরের বধ্যভূমি' শীর্ষক যে নিবন্ধ থেকে উপরোক্ত অংশটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে, সেটি ছিল রায়ের বাজার বিলে বুদ্ধিজীবী হত্যার বধ্যভূমির প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। স্বাধীনতা যুদ্ধের অন্তিম লগ্নে বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তান বুদ্ধিজীবীদের যে নৃশংসতা এবং বিকৃত উল্লাসের সাথে হত্যা করা হয়েছে, ইতিহাসে তার তুলনা খুঁজে পাওয়া যাবে না। মৃত্যুর পূর্বে আলবদর বাহিনীর প্রধান নির্যাতন কেন্দ্র ও বন্দীশালা মোহাম্মদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজে এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীদের ওপর কেমন নৃশংস নির্যাতন চালানো হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পুনর্বাসিত শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ অধ্যায়ে গ্রন্থিত হয়েছে।

নারকীয় হত্যাযজ্ঞের আরও একটি বধ্যভূমি আজ যেখানে শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মৃতিসৌধ সেখানকার শিয়ালবাড়ি বধ্যভূমি সম্পর্কে একটি নিবন্ধ এখানে সংযোজন করা হল। বুদ্ধিজীবীদের কুচিকুচি করে কাটা হাড়ের ছবিসহ আনিসুর রহমানের লেখা নিম্নোক্ত প্রতিবেদনটি ৮ জানুয়ারী, '৭২ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত হয়—

'সত্যি আমি যদি মানুষ না হতাম। আমার যদি চেতনা না থাকতো। এর চেয়ে যদি হতাম কোন জড়পদার্থ। তাহলে শিয়ালবাড়ির ঐ বধ্যভূমিতে দাঁড়িয়ে মানুষ নামধারী এই দ্বিপদ জন্তুদের সম্পর্কে এতটা নীচ ধারণা করতে পারতাম না। মানুষ যত নীচই হোক তবু ওদের সম্পর্কে যে সামান্যতম শ্রদ্ধাবোধ ছিল তা এমনভাবে উবে যেতো না। আর মানুষ কেন, কোন প্রাণীই কি পারে এত নির্মম, এত বর্বর, এতটা বোধহীন হতে ?

'অথবা যদি না যেতাম সেই শিয়ালবাড়িতে। তাহলে দেখতে হতো না ইতিহাসের বর্বরতম অধ্যায়কে। অনুসন্ধিৎসু হিসেবে যা দেখাও কোন মানুষের উচিত নয়। ওখানে না গেলে গায়ে ধরতো না এমন দহনজ্বালা। সহ্য করতে হতো না, ভয়-ক্রোধ, ঘৃণা মিশ্রিত এমন তীব্র অনুভূতি। সে অনুভূতি বলে বুঝাবার নয়। প্রতিটি মুহূর্তে মনে হয়েছে ভয়ে ভয়েই বুঝি হার্টফেল করবো। ধ্বংসস্তুপের মাঝে কতক্ষণ পর পরই চোখ বুজতে হয়েছে। না, না, এ সত্যি নয়, এ স্বপ্ন, বলে দৃষ্টি

আকাশের দিকে উত্থিত করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত আর দেখতে চাই না বলে মাটি—ভুল বললাম মানুষের হাড়ের উপর বসে পড়তে হয়েছে। সারা এলাকার মানুষের হাড় ছাড়া অবিমিশ্রিত মাটি কোথায় !

'কাটাসুরের হত্যাকান্ডকে মোটামুটি একটা থিওরিতে ফেলা যায়। একে যে কোন হিসেব কোন থিওরিতে ফেলা যায় না। এ'তো বুদ্ধিজীবী হত্যা নয়। নয় আওয়ামী লীগের অথবা বাছাই করা আন্দোলনকারী হত্যা। ক' হাজার লোককে সেখানে হত্যা করা হয়েছে ? যদি বলি দশ হাজার, যদি বলি বিশ হাজার, কি পঁচিশ হাজার তাহলে কি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন ? (আমাদের দুর্ভাগ্য, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ওখানে যারা আত্মাহুতি দিয়েছেন তাদের পরিচিতি তো নয়ই, এমনকি সংখ্যা নিরূপণ করতেও কেউ আজ পর্যন্ত এগিয়ে আসলেন না।) আমরা শিয়ালবাড়ির যে বিস্তীর্ণ বন-বাদাড়পূর্ণ এলাকা ঘুরেছি তার সর্বত্রই দেখেছি শুধু নরকংকাল আর নরকংকাল। পা বাঁচিয়েও হাড়হীন মাটির উপর পা ফেলতে পারিনি। (ক্ষমা কর শহীদ ভাই বোনেরা, দেশের জন্য আত্মদান করার পরও তোমাদের হাড় মাড়িয়ে চলতে হচ্ছে আমাদের। কেউ আজ পর্যন্ত তোমাদের সৎকারে এগিয়ে এলো না।) দেখেছি কুয়ায় কুয়ায় মানুষের হাড়। মাংসহীন পায়ের হাড়ে এখনও লেগে রয়েছে জুতো। কোমরের হাড়ের সঙ্গে লেগে রয়েছে জাঙিয়াসহ টেট্রনের প্যান্ট। কংকালের পাশে পাশেই পড়ে আছে আমার সতী সাধবী মায়ের ঘোরখাটি পর্যন্ত।

'ইতিহাসে পৈশাচিকভাবে হত্যা করার অনেক কাহিনী পড়েছি। কিন্তু শিয়ালবাড়িতে ঐ পিশাচরা যা করেছে এমন নির্মমতার কথা কি কেউ পড়েছেন, শুনেছেন বা দেখেছেন ? কসাইখানায় কসাইকে দেখেছি জীবজন্তুর গোশতকে কিমা করে দিতে। আর শিয়ালবাড়িতে গিয়ে দেখলাম কিমা করা হয়েছে হাড়। একটা মানুষকে দু'টুকরো করলেই যথেষ্ঠ পাশবিকতা হয়। কিন্তু তাকে কিমা করার মধ্যে কোন্ পাশবিক উল্লাস ? লাশের পাশে দেখেছি বরকনের গলায় পরার মালা। এ থেকে এবং স্থানীয় লোকদের তথ্যাবলীতে মনে হয়েছে হত্যার আগে পিশাচরা অনেককে বাদ্য-বাজনা বাজিয়ে নাওশা দুলহার মত সাজিয়ে এনেছে। হয়তো সেই হতভাগ্যরা ছিল সাধারণের চাইতে একটু উপরে। হয়তো বুদ্ধিজীবী, হয়তো রাজনীতিক। তাই তাদেরকে হত্যাও করা হয়েছে অসাধারণ পাশবিকভাবে।

'নৃশংসতার বিগত ইতিহাস—তুমি হেরে গেছো ওদের কাছে। হিটলার-চেংগিস-হালাকু তোমরাও লজ্জা পেয়েছো এই পিশাচদের কাছে।

ভবিষ্যত ইতিহাস তুমিও হতে পারবে না এর চাইতে নির্মম। সর্বকালের সবচাইতে মসীলিপ্ত অধ্যায়টি রচনা হয়ে গেছে এই বাংলায় এই কয়দিনে।

'ওখানে গিয়ে প্রথমেই একটা জিনিষ মনে পড়ে। কত নরপশু এই হত্যাযজ্ঞে লিপ্ত ছিল ? হাজার হাজার লোককে এমন ঠান্ডা মস্তিস্কে তো দু'দশ বা বিশ জনে হত্যা করতে পারে না। তাহলে ওরা গেল কোথায় ? শিয়ালবাড়ীর হত্যাযজ্ঞে জড়িত কাউকে গ্রেফতার করার কোন খবরও আজ পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় ছাপা হয়নি। অনেকের ধারণা এরা এখনও ঐ এলাকায়ই রয়ে গেছে। রয়ে গেছে সশস্ত্র অবস্থায়। প্রসঙ্গক্রমে বলতে হয় যে, স্বাধীনতার মাসখানেক পরেও ওখানে যেতে হয়েছে পুলিশের প্রহারাধীনে। আইন যতই তাড়াতাড়ি এসে ওদের পাকড়াও করবে এমনকি আইনের জন্য হবে মঙ্গল জনক।''

আল বদরদের অবিশ্বাস্য নৃশংসতার আর একটি দৃষ্টান্ত হল ১৯ জানুয়ারী '৭২ তারিখে দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত নিম্নলিখিত প্রতিবেদনটি ঃ

'হানাদার পাকবাহিনীর সহযোগী আল বদরের সহযোগীরা পাকসেনাদের আত্মসমর্পনের পর যখন পালিয়ে গেল তখন তাদের হেডকোয়ার্টারে পাওয়া গেল এক বস্তা বোঝাই চোখ। এদেশের মানুষের চোখ। আলবদরের খুনীরা তাদের হত্যা করে চোখ তুলে তুলে বস্তা বোঝাই করে রেখেছিল।

'ঘটনাটির কথা বলেছেন আওয়ামী লীগের বৃদ্ধ নেতা মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে গতকাল ইঞ্জিনিয়ার ইন্সটিটিউট আয়োজিত এক সভায় তিনি একথা বলেন।'

'তিনি বলেন, সেদিন বদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টারের পাশে এক বাড়ীতে গিয়েছিলাম। তোলাবায়ে আরাবিয়া ও ইসলামী ছাত্রসংঘের ছেলেদের দ্বারা গঠিত এই আল-বদর বাহিনী যে অত্যাচার চালিয়েছে তার অনেক কাহিনী শুনেছি।

'বৃদ্ধ মাওলানা বলেন, খুনীদের এই সংস্থার নাম দেওয়া হলো আল বদর বাহিনী। একি কোন মনঃপুত নাম ? যে বদর যুদ্ধ ছিল আদর্শের জন্যে ইসলামের প্রথম লড়াই সেই যুদ্ধের সাথে কি কোন সংযোগ এই নৃশংসতার মধ্যে ছিল ? মাওলানা বলেন, হানাদারদের সহযোগী এই বদর বাহিনী শুধু ইসলামের শত্রুই নয়, এরা হলো জালেম।''

আল বদরদের হাতে নিহত বুদ্ধিজীবীদের লাশের অজস্রতার কারণে তা দাফন করা সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। ২০ ডিসেম্বর দৈনিক বাংলায় কালো

বর্ডার দেওয়া হেডিংয়ে মোটা হরফে লেখা একটি আবেদনে বলা হয়— 'জামাতে ইসলামীর বর্বরবাহিনীর নিষ্ঠুরতম অভিযানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের অসংখ্য লাশ এখনও সেই সব নারকীয় বধ্যভূমিতে, সনাক্তহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। তাঁরা সবাই শহীদ, তাঁরা সবাই অমর। অথচ এ'পর্যন্ত তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় দাফনের ব্যবস্থা করা যায়নি। বর্বরদের নৃশংস অভিযানে যাঁরা শহীদ হয়েছেন তাঁদের লাশ সনাক্তের অপেক্ষায় না রেখে অবিলম্বে দাফনের ব্যবস্থা করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ'রা সনাক্তের অযোগ্য হলেও লাওয়ারিশ নন এবং লাওয়ারিশ লাশের জন্য যেমন ডোম বা আঞ্জুমানে মফিদুল ইসলাম দিয়ে দাফনের ব্যবস্থা করা হয়, এ'দের জন্য তা বাঞ্ছনীয়ও নয়।'

সুপরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড

শুধু রাজধানী নয়, বাংলাদেশের সর্বত্র বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চ শিক্ষিত শ্রেণীকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দেয়ার একটি আন্তর্জাতিক চক্রান্ত যে বাংলাদেশ আর দু'একদিন অবরুদ্ধ থাকলেই কার্যকর করা হত, এ' বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এ ব্যাপারে একটি ইঙ্গিত প্রদানের জন্য ২৭/১২/৭১ তারিখের দৈনিক আজাদে বিরাট হেড লাইনে বড় বড় হরফে লেখা 'আর একটা সপ্তাহ গেলেই ওরা বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের সবাইকেই মেরে ফেলত—বদর বাহিনীর মাস্টার প্লান' শীর্ষক দীর্ঘ প্রতিবেদনটির অংশ বিশেষ এখানে উদ্ধৃত করা হল—

'পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর গণহত্যায় সাহায্যকারী দলগুলির মধ্যে জামাতে ইসলামীর ভূমিকা ছিল সবচেয়ে ঘৃণ্য ও জঘন্য। মওদুদী-গোলাম আজম-আবদুর রহিমের নেতৃত্বে পরিচালিত জামাতী ইসলামী বাংলাদেশের স্বাধীনতায় শুধু ঘোর বিরোধিতাই করেনি—লক্ষ লক্ষ বাঙ্গালীকে পাইকারীভাবে হত্যা করার কাজে সক্রিয় সহযোগিতাও করেছে। '...হানাদার পাকিস্তানী বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যার সহায়তা করেই জামাতে ইসলামী ক্ষান্ত হয়নি—বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার উদ্দেশ্যে তারা গড়ে তুলেছিল এক সশস্ত্র গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী সংগঠন—বদর বাহিনী নামে যা সর্বসাধারণের কাছে পরিচিত ছিল। পাকিস্তানী হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের শেষ মুহূর্তে এই বদর বাহিনী বহুসংখ্যক বুদ্ধিজীবীকে রাতের আঁধারে ধরে নিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে—এ খবর এখন সবাই জেনে গেছে। কিন্তু আর মাত্র কয়েকটা দিন সময় পেলে এরা যে বাংলাদেশের

বুদ্ধিজীবী সমাজকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার কাজে ইতিহাসের জঘন্যতম বুদ্ধিজীবী নিধন অভিযানে কামিয়াব হত সে সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য পাওয়া গেছে।

'মুজিব বাহিনীর বীর মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে বদর বাহিনীর যে মুষ্টিমেয় পান্ডা ইতিমধ্যে ধরা পড়েছে তাদের জোর জিজ্ঞাসা চলছে। এই জিজ্ঞাসাবাদ থেকে এ' পর্যন্ত যে সমস্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে তা থেকে জানা গেছে যে, বাঙ্গালী জাতিকে বুদ্ধিমত্তা এবং শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও কারিগরী উৎকর্ষের দিক থেকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করে বাংলার বুকে চিরকালের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে বদর বাহিনীর পান্ডারা বুদ্ধিজীবীদের নির্মূল করার এক মহা পরিকল্পনা রচনা করেছিল।

'মুজিব বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধারা এ' পর্যন্ত যে কয়জন বদর পান্ডাকে গ্রেফতার করতে সমর্থ হয়েছে, তাদের জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে এ মাস্টার প্লানের তথ্য উদঘাটিত হয়েছে। বদর বাহিনীর যে সমস্ত পান্ডা গা ঢাকা দিয়ে আত্মগোপন করে রয়েছে তাদেরকে পাকড়াও করতে পারলে এই মাস্টার প্লানের আরও অনেক চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাবে বলে মুজিব বাহিনীর হাই কম্যান্ড সূত্রে জানা গেছে। তারা আমাকে একথাও জানিয়েছেন যে, ধৃত পান্ডারা এ' পর্যন্ত অনেক গুপ্ত তথ্য এখনও পর্যন্ত ফাঁস করেনি এবং জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুরো তথ্য পাওয়া গেলে বুদ্ধিজীবী হত্যা নিধনের উদ্দেশ্যে রচিত মাস্টার প্লানের পূর্ণ বিবরণ জানা যাবে। তবে এ পর্যন্ত ধৃত কতিপয় পান্ডা স্বীকার করেছে যে, আর মাত্র কয়েকটা দিন সময় গেলে এরা ঢাকাসহ দেশের সকল শহরের বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করত। বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের এই মহা পরিকল্পনা রচনায় পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা বিভাগের বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত কতিপয় অফিসার সাহায্য করে। এছাড়া সৈন্য ও আল বদররা যাতে বুদ্ধিজীবীদের গ্রেফতারের কাজে সাহায্য করে সে জন্য পাক সামরিক বাহিনীর সকল বিভাগের কম্যান্ডারদের বিশেষ সাংকেতিক বার্তার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়।

'রাজধানী ঢাকার বিভিন্ন মহল্লা থেকে এ' পর্যন্ত ধৃত পান্ডাদের কয়েকজনের কাছে বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক কর্মীদের নামের ভিন্ন ভিন্ন তালিকা পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে এরা হত্যা করতে সক্ষম হয়েছে তাদের অনেকেরই নাম এই তালিকায় লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং এই নামগুলোর শেষ দিকে লাল কালির ক্রস মার্ক রয়েছে। মুজিব বাহিনীর জিজ্ঞাসাবাদ কেন্দ্রের জনৈক কর্মকর্তা

উক্ত লাল কালির ক্রস মার্ক-এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, যাদেরকে ইতিমধ্যেই হত্যা করা হয়েছে, তাদের নামের শেষেই কেবল ক্রস মার্ক পাওয়া গেছে।

'উক্ত কর্মকর্তা আরও জানান, ধৃত বদর পান্ডাদের কাছ থেকে উদ্ধারকৃত বুদ্ধিজীবীদের তালিকায় লিপিবদ্ধ কারো কারো নামের নীচে লাল কালির আন্ডার লাইন রয়েছে। অবশিষ্ট নামসমূহে কোনরূপ লাল কালির চিহ্ন নেই। এ' থেকে বুঝা যায় যে, বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কাকে কাকে আগে হত্যা করতে হবে, তার নিশানা হিসেবেই লাল কালির আন্ডার লাইন রয়েছে।'

হত্যাকান্ড ঢাকার বাইরে

ঢাকার এক বিরাট সংখ্যক বুদ্ধিজীবী এবং উচ্চপদস্থ অফিসারকে গভর্ণর হাউসে এক সভায় আমন্ত্রণ করে নির্বিচারে হত্যা করার একটি মহা পরিকল্পনা পরবর্তীতে ফাঁস হয়ে যায়। কোন অজ্ঞাত কারণে শেষ পর্যন্ত এই পরিকল্পনা কার্যকর হতে পারেনি। এই একই কৌশলে দেশের বড় বড় শহরগুলোতে সার্কিট হাউস বা অন্যকোন গুরুত্বপূর্ণ সরকারী অফিসে বিশিষ্ট নাগরিকদের আক্রমণ করে ঘেরাও করার মাধ্যমে গুলি করে হত্যা করা হয়। বুদ্ধিজীবী হত্যা রহস্য তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় সমাজের শিক্ষিত শ্রেণীর অন্ততঃ ২০ হাজার জনকে হত্যা করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

এছাড়া, আল বদর বাহিনীর গেস্টাপো কায়দায় মুখোশ পরে বুদ্ধিজীবীদের তুলে নিয়ে গিয়ে নির্যাতন ও হত্যা করার ঘটনাও ঘটেছে বাংলাদেশের প্রায় সমস্ত শহরে। দেশের অন্যান্য শহরে এই পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের নমুনা হিসেবে ২৫-১২-৭২ তারিখের দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার একটি সংবাদের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করা হল—'কুখ্যাত জামাতে ইসলামীর সংগঠন ততোধিক কুখ্যাত আল বদর বাহিনীর হাতে কেবল ঢাকার শত শত বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রাণ হারান নি, তাদের পরিকল্পিত হত্যাকান্ডের হাত থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে শত শত বিশিষ্ট নাগরিকও রেহাই পান নি। অন্যান্য যে সকল স্থান থেকে এ' পর্যন্ত হত্যালীলার খবর আসছে তন্মধ্যে আছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট জেলার মৌলভীবাজার, রংপুর, দিনাজপুর, চট্টগ্রাম প্রভৃতি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

'সাতই ডিসেম্বর দস্যু পাকিস্তানী সৈন্যরা মুক্তিবাহিনী ও মিত্র ভারতীয় বাহিনীর হাতে চরম পরাজয় বরন করার আগের দিন অর্থাৎ ৬ই ডিসেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিভিন্ন বাড়িতে হানা দিয়ে ডাক্তার, অধ্যাপক, স্কুল শিক্ষক ও উকিল সহ ৪০ জন বুদ্ধিজীবীকে গ্রেফতার করে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়।

'মুক্তিবাহিনী ও মিত্র বাহিনী ব্রাহ্মণবাড়িয়াকে দস্যুমুক্ত করার পর কুরুলিয়া খালের পাড়ে এই ৪০টি মৃতদেহ পান। পরের দিন আত্মীয়-স্বজনকে খবর দিয়ে লাশগুলি যথারীতি সৎকারের ব্যবস্থা করা হয়। নিহত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্রাহ্মণবাড়িয়া কলেজের তরুণ ও জনপ্রিয় অধ্যাপক জনাব লুৎফর রহমান এবং ঢাকা হাইকোর্টের তরুণ এডভোকেট সৈয়দ আকবর হোসেন অন্যতম।

'এছাড়া গত ঈদুল ফিতরের পরের দিন রাতে পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যরা রাজাকার ও বদর বাহিনীর সহায়তায় ৫৫ জন তরুণ ও অন্যান্য তথাকথিত সন্দেহভাজন লোককে গ্রামের কাছে একটি গ্রামে হত্যা করে।

'দুর্বৃত্ত পাষণ্ডদের হিংস্র থাবায় বাংলা জাতীয় লীগের তরুণ কর্মী ফারুক আহমদের মৃতদেহ পরের দিন সকালে লাশের স্তুপ থেকে সনাক্ত করা হয়।

'সিলেট জেলার মওলবী বাজার থেকে পলায়নের পূর্ব মুহূর্তে হানাদার ও তাদের অনুচররা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে হত্যা করে গেছে বলে প্রাপ্ত খবরে জানা যায়।'

এই খবরটি প্রেরিত হয়েছিল ২৪ ডিসেম্বর তারিখে। তারপর ক্রমশঃ সারা বাংলাদেশের সমস্ত শহর থেকে পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের খবর ঢাকায় এসে পেঁছিতে থাকে।

১৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে চূড়ান্ত বিজয়ের পরও দেশবাসী জানতে পারেনি এদেশের শ্রেষ্ঠ সন্তানদের চোখ ও হাত বাঁধা বিকৃত লাশ খানাখন্দে পড়ে আছে। ১৮ ডিসেম্বর তারিখের দৈনিক পূর্বদেশে 'কুখ্যাত আল বদর বাহিনীর হাত থেকে এদের বাঁচান' শিরোনামে একটি প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'ফ্যাসীবাদী জামাতে ইসলামীর পাণ্ডাদের দ্বারা গঠিত কুখ্যাত আল বদর বাহিনী গত কয়েক দিনে ঢাকার বুকে বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছিল। গত এক সপ্তাহ যাবত এই সব গণ দুশমনদের দল অধ্যাপক, সাংবাদিক, চিকিৎসক প্রভৃতি শ্রেণীর লোকদের ধরে নিয়ে মোহাম্মদপুরে তাদের সদর দফতরে আটক রেখেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।' এরপর অপহৃত বুদ্ধিজীবীদের নাম দিয়ে

লেখা হয়, 'ঘৃন্য আল বদর বাহিনীর ঠগেরা বহুসংখ্যক সাংবাদিক, অধ্যাপক প্রমুখের বাসভবনে হানা দিয়ে তাদের বাসায় না পেয়ে বাসায় লোকদের ওপর অত্যাচার করে। আল বদর গুন্ডাদের অত্যাচারের খবর পেয়ে যেসব অধ্যাপক, সাংবাদিক বাসা থেকে অন্যত্র সরে গিয়েছিলেন, তারা কোন মতে রক্ষা পেয়েছেন। ওপরে যে সব বুদ্ধিজীবীদের নাম দেওয়া হল, এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তাদের কোন খবর পাওয়া যায়নি।' নিখোঁজ বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয় স্বজনরা এসময় পাগলের মত খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁদের প্রিয়জনদের। অনেকেই ক্যান্টনমেন্টে গিয়ে খোঁজ নেন, কেউ কেউ ১৫, পুরনো পল্টনে ইসলামী ছাত্র সংঘের অফিসে। তাঁদের মনে ক্ষীন আশা তখনও ছিল, হয়ত তাঁদের আপন জনেরা এ সমস্ত স্থানে বন্দী হয়ে আছেন।

তারপর, ১৮ ডিসেম্বর সকালে, রায়ের বাজারে আবিষ্কৃত হয় মানব জাতির ইতিহাসের সবচেয়ে হৃদয় বিদারক সেই বধ্যভূমি। ১৯ ডিসেম্বরের দৈনিক বাংলায় 'শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকান্ড সংগঠিত করেচে আল বদর বর্বর বাহিনী' শিরোনামের প্রতিবেদনে লেখা হয়, 'স্বাধীনতার আনন্দ উচ্ছ্বাসের মাঝে গতকাল শনিবার বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরীতে করুণ ছায়া নেমে আসে। মুক্তির আনন্দকে ছাপিয়ে ওঠে কান্নার রোল। শতাব্দীর জঘন্যতম হত্যাকান্ড সংঘঠিত হয়েছে ঢাকা নগরী ও বাংলাদেশে গত ফেব্রুয়ারী থেকে। তা আরও চরমে উঠেছিল মুক্তির পূর্বক্ষণে।

'এই নৃশংস হত্যাকান্ড চালিয়েছে গত সপ্তাহ ধরে জামাতে ইসলামীর আল বদর।

'শহরের কয়েকশ বুদ্ধিজীবী ও যুবককে এরা ধরে নিয়ে গিয়ে অমানুষিক ভাবে হত্যা করেছে।

'গতকাল রায়ের বাজার ও ধানমন্ডি এলাকার বিভিন্ন গর্ত হতে প্রচুর সংখ্যক লাশ উদ্ধার করা হয়। এদের মধ্যে অধ্যাপক, ডাক্তার, সাংবাদিক ও সাহিত্যিকদের লাশও রয়েছে। এ পর্যন্ত কতিপয় ব্যক্তির লাশ সনাক্ত করা গেছে। অনেক লাশই বিকৃত হয়ে গেছে, চেনার উপায় নাই। গত এক সপ্তাহে যতজন নিখোঁজ হয়েছেন অনুমান করা হচ্ছে যে, এদের একজনকেও আল বদর রেহাই দেয়নি।

ফ্যাসীবাদী রাজনৈতিক দল জামাতে ইসলামীর ছাত্র সংস্থা ইসলামী ছাত্র সংঘের সশস্ত্র গ্রুপ আলবদর এই বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা নগরী মুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এক সপ্তাহে শহরের কয়েকশত বুদ্ধিজীবী ও যুবককে ধরে নিয়ে যায়।'

১৪ ডিসেম্বর রায়ের বাজার বিলের বধ্যভূমি আবিষ্কৃত হলে সারা বিশ্ব এই হত্যাকান্ডের নিন্দায় মুখর হয়ে যায়। কিন্তু বাংলাদেশের মানুষ তাদের বিজয়লগ্নে জাতির এই চরম সর্বনাশে শোকের আতিশয্যে বজ্রাহত হয়ে পড়ে। এ বিষয়ে বিশ্বখ্যাত সাংবাদিক নিকোলাস টোমালিনের 'বাংলার বুদ্ধিজীবীরা এক খাদে মরে পড়ে আছেন,' শীর্ষক প্রতিবেদনের অংশবিশেষের বঙ্গানুবাদ হচ্ছে,…বধ্যভূমিটি হচ্ছে ঢাকা শহরে মধ্যবিত্তদের আবাসিক এলাকা ধানমন্ডীর কাছে একটি ইটখোলা। এটি একটি অদ্ভুত নির্জন জায়গা; যদিও নীলচে সাদা এঁদো জলাশয়গুলোতে কচুরীপানা ভেসে ভেড়ায়।

'শত শত ঢাকাবাসী আজ এখানে এসেছিলেন। মৃত দেহগুলো দেখার জন্য কাদামাটির পাড়/ ধরে হাঁটতে থাকা লোকদের অনেকেই নিজেদের আত্মীয় স্বজনের লাশ খুঁজছিলেন।'

…'এখানে এই বুদ্ধিজীবীরা এখনো শুয়ে আছেন; তাঁদের শরীরের ওপর জমেছে ধুলো-কাদা, দেহগুলো গলতে শুরু করেছে। একটি বাঁধের ওপর একটি কংকাল পড়ে রয়েছে; ঢাকার কুকুরগুলো নাটকীয়-ভাবে দেহটিকে মাংসমুক্ত করে ফেলেছে।

'বাঙ্গালী জনতা এই ডোবাগুলোতে এক অদ্ভূত শান্ত ভঙ্গিমায় চলাচল করছে। এখানে তাদেরকে ক্রোধান্বিত মনে হয় না। অন্যত্র তারা ক্রোধোন্মত্ত। কিন্তু এখানে তারা হাঁটছে, মৃদু ফিস ফিস করে কথা বলছে; তারা যেন গীর্জা পরিদর্শনরত পর্যটক।'১

হাহাকার করার ভাষা কেড়ে নেওয়া এই হত্যাকান্ডের মূল পরিকল্পক ছিল কারা সে বিষয়টি আজও রহস্যাবৃত রয়ে গেছে। যাঁদের নিকটাত্মীয় এবং ঘনিষ্ঠজন এই বুদ্ধিজীবীরা নিহত হয়েছেন, আমাদের দেশের সেই সমস্ত বুদ্ধিজীবীরাও এই সুপরিকল্পিত উদ্দেশ্যপূর্ণ হত্যাকান্ডের রহস্য উন্মোচন করতে আশ্চর্যজনক ভাবে কোনরকম চেষ্টাই করেন নি; সম্ভাব্য করুণতম এই হত্যাকান্ডকে আমরা সবাই যেন স্রেফ ভুলে গেছি।

এই বিষয়ে এখনই গবেষণা শুরু হওয়া অত্যাবশ্যক। কারণ, কান্না-জড়িত আমাদের স্বাধীনতার ইতিহাসে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড সবচেয়ে করুণ পর্যায়। তাছাড়া, যে আন্তর্জাতিক চক্র আমাদের দেশকে জ্ঞানের দিক থেকে রিক্ত করে দিতে চেয়েছিল তাদের আজও তৎপর থাকাই স্বাভাবিক। শহীদ বুদ্ধিজীবীদের এই অবিশ্বাস্য বিস্মৃতি জাতির জন্য

১. বাংলাদেশ জেনোসাইড এন্ড ওয়ার্ল্ড প্রেস। সংকলক ফজলুল কাদের কাদরী, প্রকাশিকা—বেগম দিল আফরোজ কাদরী, ১৩২, গ্রীণ রোড ঢাকা-১৫ সংশোধিত ২য় সংস্করণ অক্টোবর, ৭২ পৃঃ-৪২১-৪২২

বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবেই।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডে কোন কোন বিদেশী শক্তি জড়িত ছিল, যথাযথ গবেষণা ছাড়া সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে যাওয়া যুক্তিসংগত নয়; তবে এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেবার জন্য দু'একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যেতে পারে।

এ বিষয়ে প্রথম দলিলটি হচ্ছে '৭২ এর জানুয়ারীতে ভারতের সাপ্তাহিক 'দি নিউ এইজ' পত্রিকায় একটি প্রতিবেদন। এর অংশ বিশেষের বাংলা তরজমা নিম্নরূপ ঃ

'গণহত্যা তদন্ত কমিটির সভাপতি চলচ্চিত্র প্রযোজক জনাব জহির রায়হান আমাদেরকে জানিয়েছেন ঃ

'আল বদরদের কার্যকলাপ অনুসন্ধান করতে যেয়ে আমরা একই সাথে অপরাধীদের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝবার জন্য নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে যখন নিহত বাবা ও ভাইদের দেহের অবশেষ ঢাকার বধ্যভূমিতে খুঁজে ফিরছিলেন তখন আমাদের ধারণা ছিল যে দখলদার পাকিস্তানী শাসকদের নিশ্চিত পরাজয় উপলব্ধি করে সন্ত্রস্ত গোঁড়া ধর্মধ্বজী পশুরা ক্রোধান্ধ হয়ে কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করেছে। কিন্তু পরে বুঝেছি ঘটনা তা ছিল না। কেননা এই হত্যাকাণ্ডের শিকার যাঁরা হয়েছেন তাঁরা বাঙালী বুদ্ধিজীবী-দের প্রতিনিধি স্থানীয় এবং সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাবের জন্য সুপরিচিত ছিলেন।

'আল বদর বাহিনীর ধর্মান্ধ ও মূর্খ লোকদের কাছে সব লেখক ও অধ্যাপকই এক রকম ছিলেন। জহীর রায়হান বলছিলেন এরা নির্ভুলভাবে বাংলাদেশের গণতন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদেরকে বাছাই করে আঘাত হেনেছে। এ থেকে একটা সিদ্ধান্তেই পৌঁছনো যায় যে, আল বদরের এই স্বেচ্ছা-সেবকরা অপরের ইচ্ছা কার্যকরী করার বাহন ছিল মাত্র। কিন্তু কারা এই খুনীদের পেছনে ছিল ?

'সংগৃহিত দলিল ও সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে জানা যায় শ্রেষ্ঠ বাঙালী সন্তানদের হত্যার কাজে নিয়োজিত অন্ধ ধর্মীয় শিক্ষাপ্রাপ্ত গুন্ডাদেরকে আল বদর বাহিনীতে যারা সংগঠিত করে, তারা সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সাথে জড়িত।

'পূর্বে উল্লেখিত পাকিস্তানী জেনারেলের (বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী) ডায়েরীতে উল্লেখ পাওয়া যায় যে, দুজন আমেরিকান নাগরিক ঢাকা সফর করে। এরা হল হেইট (Haight) ও ডুসপিক (Dwespic)।

'এদের নামের পাশে ছোট ছোট অক্ষরে ইউ, এস, এ (U. S. A.) ও ডি, জি, আই, এস (D.G.I.S.) অর্থাৎ ডিরেক্টর জেনারেল অব ইন্টারন্যাশনাল সার্ভিস লেখা ছিল। আর লেখা আছে—'রাজনৈতিক ৬০-৬২, ৭০'। অপর এক জায়গায় লেখা আছে—এ দুজন আমেরিকান পি, আই, এ-র একটি বিশেষ বিমানে ব্যাংককের উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করে।

'হেইট ও ডুসপিক কে ? ঢাকার দৈনিক বাংলার রিপোর্টে দেখা যায়, হেইট ১৯২৮ সালে জন্ম গ্রহণ করে। সে ১৯৪৬-৪৯ সাল পর্যন্ত সৈন্য বাহিনীতে চাকুরী করত। ১৯৫৩ সাল থেকে সে সামরিক গোয়েন্দা বিভাগের সাথে যুক্ত ছিল। ১৯৫৪ সাল থেকে সে আমেরিকান দূতাবাসের রাজনৈতিক কুটনীতিবিদ হিসেবে বহুদেশ ভ্রমণ করেছে। সে কলকাতা এবং কায়রোতেও ছিল। সি, আই, এ এজেন্ট ডুসপিকের সাথে গত বছর সে ঢাকায় ফিরে আসে এবং রাও ফরমান আলীর সাথে তিন হাজার বুদ্ধিজীবীর একটি তালিকা তৈরী করে। জেনারেলের শোবার ঘরে এই তালিকা পাওয়া গেছে।

'নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে, আল বদর বাহিনীর পরিকল্পিত হত্যার কাজে বিদেশী মুখোশ, ছদ্ম পোশাক ও ছোরা ব্যবহার করা হয়েছে। গণহত্যা তদন্ত কমিটির রিপোর্ট থেকে এই তথ্য পাওয়া যায়।

'স্বভাবতঃই. পাকিস্তানী সেনাপতি ও সি, আই, এ-চরদের মধ্যেকার এই যোগাযোগ গোপন ব্যাপার ছিল। আল বদর বাহিনীর সাধারণ কর্মীরা এ সম্পর্কে কিছুই জানত না। আবার এই সন্ত্রাসবাদী সংস্থার হোতারা এবং জামাতে ইসলামী দলের নেতারা অনুগামীদের মনোবল বাড়ানোর আশায় আমেরিকা ও পিকিং নেতাদের সাথে পাকিস্তানের সামরিক এক-নায়কের ঘনিষ্ঠ রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা প্রচার করত। ১৯৭১ সালের ১২ ডিসেম্বর ঢাকার জামাতে ইসলামীর সম্পাদক প্রকাশিত এক প্রচার পত্রের ভাষা হলঃ বিদেশে আমাদের বন্ধুরা আছেন। চীন ও আমেরিকা আমাদের সমর্থক বন্ধুদেশ।'

উল্লেখ্য রাও ফরমান আলীর ডায়েরীতে যে দুজন সি, আই, এ এজেন্টের নাম পাওয়া গিয়েছিল তারা ইন্দোনেশিয়াতে বুদ্ধিজীবী হত্যা-কান্ড পরিচালনা করেছিল, এবং ইন্দোনেশীয় সরকার সেজন্য তাদের অনুপস্থিতে বিচারও করেছিল।

বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের ব্যাপারে মুজিব সরকারের তৎকালীন ভূমিকা সম্পর্কেও প্রশ্ন উঠতে পারে। স্বাধীনতার পর পরই শান্তি কমিটি ও রাজাকার বাহিনীর মূল নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করা হলেও

আল বদর বাহিনীর নেতৃস্থানীয় উল্লেখযোগ্য সবাইকে গ্রেফতার করা হয় নি। একমাত্র শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণকারী আল বদর নেতা ও ঢাকা শহর জামাতের তৎকালীন প্রচার সম্পাদক এ, বি, এম খালেক মজুমদারকে গ্রেফতার করা হয়। লক্ষ্যণীয় খালেক মজুমদারকে গ্রেফতার করেছিল মুজিব বাহিনীর সদস্যরা; সাধারণ মুক্তিযোদ্ধারা নয়। এই মুজিব বাহিনী স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় ভারতে বিশেষ ট্রেনিং প্রাপ্ত হয় এবং তাদেরকে অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র দেয়া হয়। সে সময় এই বাহিনী যুদ্ধরত বহু বামপন্থী মুক্তিযোদ্ধাকে হত্যা করেছিল বলে অভিযোগ রয়েছে। মুজিব বাহিনী খালেক মজুমদারকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে বুদ্ধিজীবী হত্যার যে মহাপরিকল্পনা উদ্ধার করেছিল তা প্রকাশ করতে না দিয়ে দেশের বাইরে পাচার করে দেয়া হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত ধামাচাপা

আওয়ামী লীগ সরকারকে নিহত বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ, বিশ্বের প্রখ্যাত মনীষীবৃন্দসহ অন্যান্য মহল বার বার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা বুদ্ধিজীবী হত্যা রহস্য উন্মোচনের কোন উদ্যোগ নেয় নি। স্পষ্টতঃ পরিকল্পিত ও সুদূর প্রসারী উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই হত্যাযজ্ঞের জন্য কোন সরকারী তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় নি। মুখরক্ষার জন্য প্রচলিত আইনে এই হত্যাকান্ডের যেমন তেমন বিচারের ব্যবস্থা করা হয়। ২৮ মার্চ ১৯৭২ তারিখে প্রচারিত পুলিশ ডাইরেক্টরেটের একটি তথ্য বিবরণীতে বলা হয়, 'বাংলাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডকে কেন্দ্র করে এ' পর্যন্ত ৪২টি মামলা রুজু করা হয়েছে। গোয়েন্দা বিভাগের ডি আই জির-অধীনে গোয়েন্দা অফিসারদের একটি দল' এই মামলা পরিচালনা করছে। আসামী হিসেবে এ' পর্যন্ত ৫০ ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।'

নিহত বুদ্ধিজীবীদের আত্মীয়-স্বজনদের সাথে আলাপ করে জানা গেছে, এই মামলাগুলোর বেশীর ভাগই ছিল সাজানো মামলা। এ, বি, এম খালেক মজুমদার সহ বদর বাহিনীর যে কয়েকজন নেতার বিচার করা হয়, অপরাধ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হওয়া সত্বেও তাদের লঘুদন্ড দেয়া হয়। কিন্তু অন্যানা বুদ্ধিজীবীদের কথিত হত্যাকারীরা ছিল সাধারণ তরুণ আল বদর।

সরকারের কাছে আবেদন জানিয়ে ব্যর্থ হবার পর বুদ্ধিজীবীরা নিজেরাই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন ২৯ ডিসেম্বর ১৯৭১ তারিখে। জহির রায়হানের সভাপতিত্বে এই কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন এহ

তেশাম হায়দার চৌধুরী, ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলাম, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমেদ, এনায়েতুল্লাহ খান, সৈয়দ হাসান ইমাম এবং ডঃ সিরাজুল ইসলাম। এই কমিটি, বিশেষতঃ এর আহবায়ক জহির রায়হান বুদ্ধিজীবী হত্যার মূল রহস্য উদঘাটনে অনেকদূর এগিয়ে যান।

৩০ জানুয়ারী জহির রায়হান রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান। এর পর বুদ্ধিজীবী নিধন তথ্যানুসন্ধান কমিটির উদ্যোগ থামিয়ে দেয়া হয়। কমিটি ইতিমধ্যে যে সমস্ত তথ্যপ্রমাণ উদ্ধার করেছিল, কোলকাতার একটি পত্রিকার একজন সাংবাদিক তা ভারতে নিয়ে চলে যান।

২১ ডিসেম্বর তারিখে আকাশবানী কোলকাতা কেন্দ্রে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধের বিশিষ্ট সমর্থক বৃটেনের সাবেক মন্ত্রী জন স্টোনহাউজ বলেন যে বাংলাদেশের শত শত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করার ব্যাপারে পাকবাহিনী যে জড়িত ছিল তার প্রমাণ তাঁর কাছে রয়েছে। ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন এই হত্যাকান্ড চলছিল তখন মিঃ স্টোনহাউজ ঢাকাতেই ছিলেন। সাক্ষাৎকারে মিঃ স্টোনহাউজ বলেন যে বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত ক্যাপ্টেন থেকে জেনারেল পদমর্যাদার দশজন সামরিক অফিসারকে তিনি চিহ্নিত করতে সক্ষম হয়েছেন। এই অফিসারদের নাম প্রকাশে তাৎক্ষণিকভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে তিনি এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক অনুসন্ধান কমিটির মাধ্যমে তদন্ত করার জোর দাবী জানান। বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের সাথে জড়িত মুখ্য দালালদের নামও উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছেন বলে তিনি জানান।

এই দশজন অফিসারের পরিচয় এবং বুদ্ধিজীবী হত্যাসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলপত্র আর কখনই আমাদের হস্তগত হয় নি। এদের মধ্যে হত্যাযজ্ঞ সরাসরিভাবে পরিচালনাকারী দুই অফিসার জেনারেল নিয়াজী এবং জেনারেল রাও ফরমান আলীকে ২০ ডিসেম্বর একটি বিশেষ বিমানে কোলকাতা নিয়ে যাওয়ার পর কড়া সামরিক প্রহরায় কোন এক অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। হত্যাযজ্ঞের সাথে জড়িত অন্যান্য অফিসারকেও অল্প কিছু দিনের মধ্যেই ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়।

বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্ত দাবী করে ৭২ সালের ১৭ মার্চ শহীদ বুদ্ধিজীবীদের পরিবারবর্গ শহীদ মিনারে গণ জমায়েত করেন। এরপর মিছিল করে বঙ্গভবনে যান। মিছিলকারীরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চাইলে শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমে দেখা করতে অস্বীকার করেন। পরে মিছিলকারীরা বঙ্গভবনের ফটকে অবরোধ করে বসে পড়লে অনেকক্ষণ পর প্রধানমন্ত্রী এসে তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন এবং মিছিলকারীদের সঙ্গে তাঁর উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়। পরে তিনি জানান যে তদন্তের

নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং যথাসময়ে তা প্রকাশ করা হবে। ইতিপূর্বে ৮ই ফেব্রুয়ারী জহির রায়হানের পরিবারের সদস্যদেরও তিনি অশ্রু ভারাক্রান্ত কন্ঠে জানিয়েছিলেন, জহির রায়হানের অন্তর্ধান সহ বুদ্ধিজীবী হত্যার তদন্তের জন্য তিনি নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিন সপ্তাহের ভেতর তাঁকে রিপোর্ট করা হবে। সেই তদন্তের ফলাফল দেশবাসী কখনো জানতে পারেন নি

ধীরে ধীরে জাতি ও সারা বিশ্ব ভুলে যায় সমগ্র মানবতার বিরুদ্ধে ইতিহাসের চরমতম এই অপরাধের তদন্ত করার দায়িত্বের কথা। কিন্তু অনাগতকাল ধরে অন্ততঃ আমাদের দেশের বুদ্ধিজীবী এবং গবেষকদের দায়িত্ব হয়ে থাকবে এই হত্যারহস্য উন্মোচনে এবং বিশ্বের কাছে এর ভয়াবহতার স্বরূপ প্রকাশে যথাসম্ভব প্রচেষ্টা চালানো।

এই হত্যাকান্ড সম্পর্কে রহস্যের যত ধূম্রজালই থাকুক, বাঙ্গালী জাতির জন্য অপরিসীম এবং অমোচনীয় লজ্জার বিষয় যে, বুদ্ধিজীবী হত্যা মহাপরিকল্পনা প্রণয়নের মূল পক্ষ জামাতে ইসলামী এবং তাঁদের হুশিয়ারী প্রদান, অপহরণ, নির্যাতন ও নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য এককভাবে দায়ী জামাতে ইসলামীর আল বদর নামে পরিচিত ছাত্রফ্রন্ট ইসলামী ছাত্র সংঘ হত্যাযজ্ঞের এক দশকেরও কম সময়ে সম্পূর্ণভাবে পুনর্বাসিত হতে পেরেছে। বিশ্বের অন্যান্য জাতি হয়তো পুনর্বাসনের এই অবিশ্বাস্য কাহিনী বিশ্বাসই করতে চাইবে না, কিন্তু আমরা আমাদের মৃতুঞ্জয়ী বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ন্যূনতম দায়িত্ব পালনে যে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছি, তা সারা বিশ্বের ইতিহাসে অন্যায়, আত্মস্বার্থপরতা, নির্লজ্জতা, বিস্মৃতি এবং কাপুরুষতার এক আশ্চর্য কাহিনী হিসেবে চিরকাল লেখা থাকবে।

আল বদরের সূচনা ও তৎপরতা

আল বদর বাহিনী গঠনের সূত্রপাত অবশ্য জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের হাতে ঘটে নি, এটি ঘটেছিল জামালপুর শহরে। এই বাহিনীর উৎপত্তি সম্পর্কিত একটি চমৎকার দলিল হতে পারে ১৪-৯-৭১ তারিখে জামাতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত 'আল বদর' নামের একটি ফিচার। ভবিষৎ গবেষকদের কাজে লাগতে পারে বলে সংগ্রামের ওই সংখ্যার ৩য় পৃষ্ঠার এক-চতুর্থাংশ জুড়ে মুদ্রিত এই বক্স আইটেমটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল—

'আল বদর একটি নাম ! একটি বিস্ময় ! আল বদর একটি প্রতিজ্ঞা !

যেখানে তথাকথিত মুক্তিবাহিনী আল বদর সেখানেই। যেখানেই দুষ্কৃতকারী আল বদর সেখানেই। ভারতীয় চর কিংবা দুষ্কৃতকারীদের কাছে আল বদর সাক্ষাৎ আজরাইল।

২২শে এপ্রিল জামালপুরে পাকবাহিনীর পদার্পণের পর পরই মোমেনশাহী জেলা ইসলামী ছাত্র সংঘের সভাপতি জনাব মুহম্মদ আশরাফ হোসাইনের নেতৃত্বে আল বদর বাহিনী গঠিত হয়। আল বদর সম্পূর্ণরূপে একটা স্বেচ্ছাপ্রণোদিত বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। আল কোরআনের মহামন্ত্রে উজ্জীবিত, সত্য, ন্যায় ও কল্যাণের জন্য উৎসর্গীকৃত পাকিস্তানবাদী এসব তরুণেরা ভারতীয় চর, অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের মোকাবেলায় অবতীর্ণ হয়।

'সরলপ্রাণ জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা ও দুর্ভাবনার চরম মুহূর্তে আল বদর বিশেষ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা নিয়ে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা ও ইসলামের হেফাজতে আল বদরের বলিষ্ঠ ভূমিকায় ভারতীয় চর অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারীদের সমূলে উৎখাত করে জনজীবনে শান্তি স্বস্তি ও নিরাপত্তার কার্যকরী ও ন্যায়ানুগ পদক্ষেপ জনসাধারণকে শুধু মুগ্ধই করেনি, বরং তাদেরকে চিরকৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছে। জনজীবনে আল বদর তাই সত্য, ন্যায় ও শান্তির প্রতীক।

'জামালপুর মহকুমায় এ পর্যন্ত আল বদর সাতটিরও অধিক ক্যাম্প স্থাপন করেছে। বিভিন্ন সময় ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও দুষ্কৃতকারী-দের সাথে প্রত্যেকটি মোকাবিলায় প্রচুর সংখ্যক দুষ্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারী হত্যাই করেনি বরং তাদের অনেককে আটক করেছে, তাদের কাছ থেকে এত বেশী পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার করেছে যা ভাবাই যায় না।

'দেওয়ানগঞ্জে আল বদর মুজিব বাহিনীর দুষ্কৃতকারীদের শুধু প্রতিহতই করেনি, পরাস্তও করেছে। আল বদর নওজোয়ানদের হাতে বহু দুষ্কৃতকারী নিহত হয় এবং তারা ১১টা রকেট বোমা, একটি রাইফেল ও মেশিনগানের প্রচুর গুলি রেখে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

'ইসলামপুরে আল বদর তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর এক হামলার মোকাবিলায় ৬জন শত্রুকে হত্যা করে এবং ৬টা হাত বোমা, ১টা রাইফেল, ৮৪ রাউন্ড গুলি, ৬ বাক্স বিস্ফোরক দ্রব্য ও জি, এ, ও রাইফেলসহ মেগজিন, স্টেনগান, মর্টার উদ্ধার করে। এখানে জনৈক মোজাহিদ কমান্ডার ও ইসলামপুর থানা ছাত্রলীগের সভাপতি ও তথাকথিত মুক্তি-বাহিনীর কমান্ডার নিহত হয়। ইসলামপুরে আল বদর ভারতীয় দালাল

ভার, দেওয়ানীর কাছ থেকে ৩ শত ৫০ মন পাট উদ্ধার করে। এ পাট নৌকাযোগে ভারতে পাচার হচ্ছিল।

'সরিষাবাড়িতে আল বদর দুষ্কৃতকারীদের মোকাবিলায় ১০ জনকে হত্যা করে ও অসংখ্য আহতকে নিয়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। এখানে একজন দুষ্কৃতকারীকে একটি রাইফেল ও একটি মর্টার শেলসহ গ্রেফতার করা হয়।

'কালীবাড়ী এলাকায় আল বদর একটি রাইফেল, ৭টি ৬ ইঞ্চি মর্টার, ৬টা হাতবোমা ও প্রচুর বিস্ফোরক দ্রব্য উদ্ধার করে।

'নান্দিনা ও মেলান্দহ এলাকায় আল বদর তথাকথিত মুক্তিবাহিনীকে হটে যেতে বাধ্য করে।

'জামালপুর শহরে তথাকথিত মুক্তিবাহিনীর ৭জন সদস্য আল বদরের কাছে অস্ত্রশস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করে, এবং আল বদর তিনজন ভারতীয় চরকে এখানে গ্রেফতার করে।

'নখলা এলাকায় পাক ফৌজের সহায়তায় আল বদর ২ শোরও বেশী অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা করে। এবং ধানুয়া কমলাপুরে ৩ শোর অধিক অনুপ্রবেশকারীকে হত্যা ও ১ শো ১৩ জনকে গ্রেফতার করে। এখানে মর্টার মেশিনগান সহ প্রচুর গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়। শত্রু মোকাবিলা ছাড়াও অন্যান্য সামাজিক কল্যাণমূলক কাজেও আল বদর পিছপা নয়। 'স্থানীয় আল বদরের কাছ থেকে বিশেষ আশ্বাস ও নিশ্চয়তা পাওয়ায় সম্প্রতি জামালপুর মহকুমার বিভিন্ন পরীক্ষা কেন্দ্রে এস, এস, সি, এইচ, এস, সি, প্রাইমারী টিচার্স ও দাখেল পরীক্ষা অত্যন্ত শান্তিপূর্ণ পরিবেশে সুসম্পন্ন হয়। সর্বাধিক সংখ্যক পরীক্ষার্থী নিরুদ্বেগে ও প্রফুল্লচিত্তে এসব পরীক্ষায় অংশ গ্রহণ করে। এখানে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, এ'সমস্ত পরীক্ষার্থীর অধিকাংশই পরীক্ষা চলাকালে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষা ও দুষ্কৃতকারীদের সম্ভাব্য সবরকম হুমকীর মোকাবিলায় আল বদর ট্রেনিং নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং পরীক্ষা শেষ হওয়ার সাথে সাথেই তারা বদর বাহিনীতে যোগ দেয়।

'স্থানীয় প্রাইমারী টিচার্স ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে ১৯৭১-৭২ সালের কোর্সে ভর্তির জন্য এবার এত বেশী ভীড় হয় যে ১ শো ৫০ টি সিটের জন্য তিন শত আবেদনকারীকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হয়।

'আল বদর বা বদরবাহিনী তাই আজ জামালপুর বাসীর কাছে শুধু মুখেই উচ্চারিত নয়—আশির্বাদপুষ্টও। জামালপুর মহকুমার যে কোন হাট, বাজার, গঞ্জ, স্কুল, কলেজ, আজ কলমুখর—আগের মতই প্রাণ-

চাঞ্চল্যে ভরপুর। দুষ্কৃতকারী, অনুপ্রবেশকারী কিংবা ভারতীয় চর সম্পর্কে গ্রামবাসী পর্যন্ত সর্বদা সজাগ। রেল লাইন, হল, নদীপথ প্রভৃতি স্থানে আজ তাদের দুর্বার প্রতিরোধ। ভারতীয় অপপ্রচারের জবাবে আজ তাদের কন্ঠ মুখর, জেহাদী প্রেরণায় তারা উদ্দীপ্ত।

'জামালপুরবাসী তাই আজ আল বদর থেকে বিছিন্ন নয়। শুধু জামালপুর নয়, মোমেনশাহীও নয়, সমস্ত প্রদেশেই আল বদর আজ প্রশংসিত।'

সারাদেশে বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের ঘটনাকে খুব বিশ্লেষণী দৃষ্টি দিয়ে দেখলে সহজেই বুঝতে পারা যায় বুদ্ধিজীবী হত্যা ঘটেছে তিন ধরনের। প্রথমতঃ এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সহ দেশের নানা স্থানের যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করা হয়েছে তাঁরা নিহত হয়েছেন পাকবাহিনীর সাধারণ নির্বিচার গণহত্যা বিশেষতঃ স্বাধীনতা-পন্থী ছাত্র শিক্ষক হত্যার শিকার হয়ে; পরিকল্পিত বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ড তখনো শুরু হয় নি। দ্বিতীয়তঃ জামাতে ইসলামী তাদের দলীয় নীতির অংশ হিসেবেই গোঁড়া ধর্মোন্মাদ ছাড়া অন্য সমস্ত বুদ্ধিজীবীকেই হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল। একাত্তরে জামাত ও ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা বিবৃতি, মাদ্রাসা শিক্ষা প্রচলন সম্পর্কে বাড়াবাড়ি, ছাত্র সংঘের টিক্কা খানের কাছে শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে উগ্র সাম্প্রদায়িক সুপারিশ পেশ এবং এগুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বাংলাদেশমনা বুদ্ধিজীবীদের সরাসরি হুমকি প্রদর্শন ইত্যাদি আলামত থেকে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়। জামাত ও ছাত্র সংঘের নেতারা তাদের এই অপপ্রয়াসের দোসর করে নেয় এক শ্রেণীর লোভী, নীতি-জ্ঞানবর্জিত ও উগ্র সাম্প্রদায়িক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী এবং শান্তি কমিটির কিছু অতি গোঁড়া সদস্যকে। এধরনের বুদ্ধিজীবী হত্যা জামাতে ইসলামী করেছে এপ্রিল থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত। তৃতীয়তঃ নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ থেকে শুরু করে ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত যে সমস্ত বুদ্ধিজীবী নিহত হয়েছেন, তাঁরা সুপরিকল্পিত আন্তর্জাতিক চক্রান্তের শিকার হয়ে হানাদার পাকিস্তানী জেনারেলদের সরাসরি নেতৃত্বে পরিচালিত হত্যাকান্ডে নিহত হয়েছেন। শেষোক্ত শ্রেণীর শহীদদের কেউ কেউ ছিলেন শুধুমাত্র জামাতের টার্গেট, কেউ কেউ আন্তর্জাতিক চক্রান্তের টার্গেট, কেউ কেউ ছিলেন উভয় পক্ষেরই টার্গেট। একারণেই দেখা যায় সাংবাদিক সিরাজুদ্দিন হোসেনের মত পাকিস্তান পন্থী লোকও তাদের হাতে নিহত হয়েছেন, অথবা যে কবীর চৌধুরীকে কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটি তাদের সিরাত সম্মেলন, আজাদী দিবস পালন ইত্যাদি

সভার অভ্যাগত করে বক্তৃতা করতে দিয়েছে তা তিনিও রাও ফরমান আলীর হত্যা তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেছেন।

জামালপুরে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী হিসেবে আল বদর গড়ে ওঠার সাথে সাথে জামাত নেতৃত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে পারে যে ছাত্র সংঘকে তারা সশস্ত্র করে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী সাধারণ তৎপরতা চালানো ছাড়াও বুদ্ধিজীবী হত্যার জন্য বিশেষ স্কোয়াড হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। প্রথমতঃ পরীক্ষামূলকভাবে সারা ময়মনসিংহ জেলায় ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মীদের আল বদর বাহিনী হিসেবে সংগঠিত করে সশস্ত্র ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই সাংগঠনিক কার্যক্রমের পরিচালক ছিলেন বর্তমানে জামাতের কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক এবং তৎকালীন ময়মনসিংহ জেলা ইসলামী ছাত্র সংঘ প্রধান কামরুজ্জামান। কামরুজ্জামানের নেতৃত্বে মাসখানেকের মধ্যেই ময়মনসিংহ জেলার সমস্ত ছাত্র সংঘ কর্মীকে আল বদর বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কামরুজ্জামানের নেতৃত্বদানের এই বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য একটি প্রতিবেদনের অংশবিশেষ এখানে উদ্ধৃত হতে পারে। ১৬ আগস্ট তারিখের দৈনিক সংগ্রামে প্রকাশিত একটি প্রতিবেদনে বলা হয় 'পাকিস্তানের ২৫তম আজাদী দিবস উপলক্ষে গত শনিবার মোমেনশাহী আল বদর বাহিনীর উদ্যোগে মিছিল ও সিম্পোজিয়াম অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় মুসলিম ইনস্টিটিউটে আয়োজিত এই সিম্পোজিয়ামে সভাপতিত্ব করেন আল বদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক জনাব কামরুজ্জামান। এক তারবার্তায় প্রকাশ সিম্পোজিয়ামে বিভিন্ন বক্তা দেশকে ধ্বংস করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দুশমনদের সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।'

অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত সাধারণ আল বদররা সুনির্দিষ্ট বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিল বলে মনে হয় না। এসময় পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ইসলামী ছাত্র সংঘকে আল বদর বাহিনীতে পরিবর্তিত করার পর তাদের কাজকর্ম মোটামুটিভাবে রাজাকার বাহিনীরই অনুরূপ ছিল; যদিও তারা ছিল অধিকতর সুশৃংখল।

সেপ্টেম্বর মাসে জামাতে ইসলামীর নেতারা তাদের নিজেদের বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা হত্যাকান্ডের মূল পরিচালক রাও ফরমান আলীর কাছে পেশ করে। দালাল বুদ্ধিজীবীরাও এ সময় এই চক্রান্তে যোগ দেয়। 'টার্গেট' বুদ্ধিজীবীদেরকে চিহ্নিত করা, তাদের ঠিকানা সংগ্রহ করা প্রভৃতি পাকবাহিনীর পক্ষে নিশ্চয়ই আয়াসসাধ্য হত। কিন্তু দালাল বুদ্ধিজীবী ও ইসলামী ছাত্র সংঘের নেতৃবৃন্দের কাছে এটা খুব সহজ ব্যাপার ছিল। এ কারণেই দেখা যায় বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডে

অপহরণ অভিযান সম্পন্ন করার জন্য বেছে নেয়া হয়েছিল মূলতঃ অপেক্ষাকৃত তরুণ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র এবং তথাকথিত সংবাদিকদের। এছাড়া একটি নিয়মিত সেনাবাহিনীর মর্যাদার পক্ষে ক্ষতিকর এ ধরনের কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ডের জন্য অপহরণ করায় সৈন্য নিয়োগের বিষটি প্রকাশিত হয়ে পড়ার ভয়তো ছিলই। এ সমস্ত কারণেই সম্ভবতঃ রাও ফরমান আলী বুদ্ধিজীবী হত্যা অভিযানে আল বদরদের কাজে লাগানোর সিদ্ধান্ত নেয়।

বুদ্ধিজীবীর হত্যার এই পরিকল্পনা পেশের পর পরই গোলাম আজম দুজন জামাত নেতা রাজাকার বাহিনী প্রধান মোহাম্মদ ইউনুস ও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের প্রধান জল্লাদ আশরাফুজ্জামান খান যে এলাকায় বাস করত সেখানকার শান্তি কমিটি লিয়াজো অফিসার মাহবুবুর রহমান গুরহাকে নিয়ে ফিজিকেস ট্রেনিং কলেজে আল বদর বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে আল বদর ও রাজাকারদের প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করতে যান। 'পুনর্বাসিত শান্তি কমিটির সদস্য বৃন্দ' অধ্যায়ে এই সভার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এর পর থেকে সারাদেশেই ইসলামী ছাত্র সংঘকে আল বদরে রূপান্তরিত করা হয় এবং নভেম্বরের শেষ সপ্তাহ ও ডিসেম্বরের প্রথম পক্ষে তাদের হাতে বুদ্ধিজীবীদের তালিকা দিয়ে অপহরণ ও নির্যাতনের উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়।

আল বদর বাহিনীর এই ক্রমবিকাশের বিষয়টি পরিস্কার করার জন্য আল বদর নেতাদের বক্তৃতা বিবৃতি ও সংঘের কার্যাক্রমের একটি মোটামুটি কালানুক্রমিক সারসংক্ষেপে জামাতে ইসলামীর মুখপত্র দৈনিক সংগ্রামের '৭১-এর ফাইল থেকে এখানে উপস্থাপন করা যেতে পারে। দ্রষ্টব্য যে, আল বদর নেতার সেপ্টেম্বরের শেষ পর্যন্ত শান্তি কমিটির নেতৃবৃন্দের মতই, ভারতীয় চর ও অনুপ্রবেশকারীদের নির্মূল' করার কথা ঘোষণা করেছে। কিন্তু এর পর থেকে তারা বিশেষতঃ 'অভ্যান্তরীণ শত্রু' 'ভারতীয় দালাল,' 'ব্রাহ্মণ্যবাদের দালাল' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদেরকে নির্মূল করার কথাই বার বার বলেছে।

১০ এপ্রিল ছাত্র সংঙ্গের এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, 'দুস্কৃতকারী ও অনুপ্রবেশকারীদের হাত থেকে পূণ্যভূমি পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য ছাত্র সংঘের প্রত্যেকটি কর্মী তাদের শেষ বিন্দু দিয়ে যাবে। হিন্দুস্তানের ঘৃণ্য চক্রান্তের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য ছাত্র সংঘ কর্মিরা সেনাবাহিনীকে সহযোগিতা করতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত।'

১৩ মে ছাত্র সংঘের আর একটি বিবৃতিতে বলা হয়, 'দেশের বর্তমান দুরবস্থার জন্য ছাত্র সমাজকে দায়ী করা হয়। অথচ ছাত্র সংঘ কর্মীরাই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমন ও সেনাবাহিনীকে সহায়তা করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি

এই সভায় করতালির মধ্যে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, 'ঘৃণ্য শত্রু ভারতকে দখল করার প্রাথমিক পর্যায় আমাদেরকে আসাম দখল করতে হবে।' এ জন্য আপনারা সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

২৩ সেপ্টেম্বর আলবদর ক্যাম্প ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রসংঘ আয়োজিত এক চা চক্রে মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তাদের এদেশীয় দালালরা যে সন্ত্রাশবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকরাই তাদেরকে কার্যকরীভাবে মুকাবলা করতে সক্ষম। যারা ইসলামকে ভালবাসে শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালবাসে। এইবারের উদঘাটিত এই সত্যটি যাতে আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

১৫ অক্টোবর প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় 'রাজাকার ও আলবদরদের ভূমিকা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করায় পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ জনাব ভূট্টো, কাওসার নিয়াজী ও মুফতী মাহমুদের তীব্র সমালোচনা করেন বলে গত বুধবার পিপি আই প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য স্বেচছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জাতির সেবা করেছে।

'অথচ সাম্প্রতিকালে দেখা যাচ্ছে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা যেমন জনাব জেড এ ভূট্টো, কাওসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ ও আসগর খান রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য দেশ হিতৈষী সেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিষোদগার করেছেন।

'এসব নেতার এধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এবং এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সরাকার প্রতি আবেদন জানান।

'পরিশেষে ছাত্রসংঘ নেতা ক্লাসে যোগদানের জন্য এবং সেই সঙ্গে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সেনবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আলবদর ও দেশহিতৈষী ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।'

২৫ অক্টোবর তারিখে এক বিবৃতিতে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ১৭ রমজান বদর দিবস পালনের আহ্বানে জানিয়ে বলেন, 'আমরা আজ ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই পবিত্র দিবসে আমরা জাতির স্বার্থে এবং এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করব।'

এই সভায় করতালির মধ্যে আলী আহম্মদ মুহাম্মদ মুজাহিদ বলেন, 'ঘৃণ্য শত্রু ভারতকে দখল করার প্রাথমিক পর্যায় আমাদেরকে আসাম দখল করতে হবে।' এ জন্য আপনারা সশস্ত্র প্রস্তুতি গ্রহণ করুন।

২৩ সেপ্টেম্বর আলবদর ক্যাম্প ঢাকা আলীয়া মাদ্রাসায় ছাত্রসংঘ আয়োজিত এক চা চক্রে মতিউর রহমান নিজামী বলেন, 'সশস্ত্র ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তাদের এদেশীয় দালালরা যে সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা চালাচ্ছে একমাত্র পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক যুবকরাই তাদেরকে কার্যকরীভাবে মুকাবিলা করতে সক্ষম। যারা ইসলামকে ভালবাসে শুধুমাত্র তারাই পাকিস্তানকে ভালবাসে। এইবারের উদঘাটিত এই সত্যটি যাতে আমাদের রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবীরা ভুলে যেতে না পারে সেজন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।'

১৫ অক্টোবর প্রকাশিত একটি সংবাদে বলা হয় 'রাজাকার ও আলবদরদের ভূমিকা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করায় পূর্ব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ জনাব ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী ও মুফতী মাহমুদের তীব্র সমালোচনা করেন বলে গত বুধবার পিপি আই প্রকাশিত এক খবরে প্রকাশ। এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানে দেশপ্রেমিক যুবকরা ভারতীয় চরদের হাত থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছে এবং রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সদস্য হিসেবে জাতির সেবা করেছে।

'অথচ সাম্প্রতিকালে দেখা যাচ্ছে কতিপয় রাজনৈতিক নেতা যেমন জনাব জেড এ ভুট্টো, কাওসার নিয়াজী, মুফতি মাহমুদ ও আসগর খান রাজাকার, আলবদর ও অন্যান্য দেশ হিতৈষী সেচ্ছাসেবক বাহিনীর বিরুদ্ধে আপত্তিকর মন্তব্য করে বিষোদগার করেছেন।

'এসব নেতার এধরনের কার্যকলাপ বন্ধ করার জন্য এবং এ ব্যাপারে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করার জন্য সরাকার প্রতি আবেদন জানান।

'পরিশেষে ছাত্রসংঘ নেতা ক্লাসে যোগদানের জন্য এবং সেই সঙ্গে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি ফিরিয়ে আনার ক্ষেত্রে সেনবাহিনীকে সহায়তা করার জন্য আলবদর ও দেশহিতৈষী ছাত্রদের প্রতি আহ্বান জানান।'

২৫ অক্টোবর তারিখে এক বিবৃতিতে আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ ১৭ রমজান বদর দিবস পালনের আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'আমরা আজ ইসলাম বিরোধী শক্তি এবং চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। এই পবিত্র দিবসে আমরা জাতির স্বার্থে এবং এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মোৎসর্গের শপথ গ্রহণ করব।'

ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টির একটি দলিল

ইসলামী ছাত্র সংঘ ছিল সুশৃংখল, সুসংগঠিত একটি প্রতিষ্ঠান। ইসলামী ছাত্র শিবির নামে পুনর্বাসিত এই দলটির সদস্যরা আজকের মত সেদিনও নেতৃবৃন্দের তদারকীতে রাজনৈতিক ও অন্যান্য শিক্ষা গ্রহণ করত। আজকের মত সেদিনও এদের মধ্যে সুপরিকল্পিতভাবে বিকৃত ধর্মোন্মাদনা সৃষ্টি করা হয়েছিল। এর ফলাফল কি হয়েছিল তা বোঝাবার জন্য এখানে ৭ নভেম্বর বদর দিবস উপলক্ষে দৈনিক সংগ্রামের সাহিত্য বিভাগের প্রকাশক মাহফুজুল হক নামে জনৈক আলবদর কমাণ্ডারের লেখা 'আল বদর আলবদর আলবদর—থ্রি ওয়ান থ্রি, থ্রি, ওয়ান থ্রি, থ্রি ওয়ান থ্রি, নামক একাংকিকার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হল। উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত মুষ্টিবদ্ধ হাতে সসঙ্গীন রাইফেলের চিত্রসহ একাঙ্কিকাটির প্রথম অংশটি এরকম—

প্রস্তাবনা

ফারাবী, আজাদ, ফারুক, আশফাক, বদরুল। এরা ক'জন তরুণ সঙ্গীদের সাথে করেছে অঙ্গীকার। এরা বলে সঙ্গীন আমার বন্ধু। প্রশ্ন করলে এরা হাতের দু আঙ্গুল তুলে দেখায় 'ভি' অর্থাৎ ভিক্টোরী। নিশ্চিত বিজয়। তিনশ তের এদের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। তাই প্রত্যয়দৃপ্ত শপথে এরা হাতিয়ার তুলে নেয়। রাইফেল, স্টেনগান, এল, এম, জির মাঝে খুঁজে নেয় জিন্দেগীর স্বপ্নিল ফুলঝুরি।

এক

মোহসিন হলে ফারাবীর কক্ষ। টেবিল, চেয়ার, আলনা, এক গাদা বইতে সাজানো কক্ষ। ফারাবী আধশোয়া অবস্থায় বই পড়ছে। আজাদ ও ফারুকের প্রবেশ।

আজাদ—কিরে এত মনোযোগ দিয়ে কি পড়ছিস?
ফারাবী—আরে তোরা—আয়—আয়— বোস্।
ফারুক—কি পড়ছিলি?
ফারাবী—এই সাইয়েদ কুতুবের বইটা।
আজাদ—তারপর কবে যাচ্ছিস?
ফারাবী— কোথায়?
আজাদ—কেন আশফাক তোকে কিছু বলেনি?

---

১. তিনশ তের অর্থাৎ বদর যুদ্ধের তিনশ তের জন যোদ্ধা
২. সাইয়েদ কুতুব হচ্ছেন জামাতে ইসলামীর আদর্শিক গুরু

ফারাবি—ওহ্, আল বদর ট্রেনিং এর কথা ?

আজাদ—হ্যাঁ, আমরাতো সবাই আগামী দশ তারিখে যাচ্ছি ক্যাম্পে। তুইও যাচ্ছিস তো ?

ফারাবী—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। যাব না কি বলছিস (একটু থেমে) সত্যি এটা ভাবতে আশ্চার্য লাগে, আজ এই দেশের বুকে দাঁড়িয়ে এমন প্রকাশ্যে সশস্ত্র ট্রেনিং লাভের সুযোগ পাচ্ছি দেখে। এতদিন যা ছিল কল্পনা আজ তা বাস্তবে পরিণত হতে যাচ্ছে—(থেমে) সত্যি তোদের আনন্দ লাগছে না ?

আজাদ—কিন্তু এ আনন্দের সাথে মিশে আছে অনেক বেদনাঃ অনেক কান্নার ইতিহাস। আজ সারা দেশে কত শত শত মানুষকে শুধুমাত্র ইসলাম অনুসারী হবার অপরাধে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হচ্ছে। জীবন্ত খেজুরের কাঁটা বিছানো গর্তে কবর দেওয়া হচ্ছে। গাছের সাথে বেঁধে পৈশাচিক ভাবে চোখে, মুখে, বুকে গজাল ঠুকে ঠুকে হত্যা করা হচ্ছে। গরম লোহার শলাকা দিয়ে চোখ উপড়ে দিয়ে বলছে, বল্ আরো ইসলাম ইসলাম বলবি না কি ? শুধু তাই নয়, এদের কেটে টুকরো টুকরো করে ছালায় ভরে নদীতে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। এদের রক্তে পদ্মা যমুনার রঙ লালে লাল হয়ে যাচ্ছে—

ফারুক—থাম্ থাম্ আজাদ—থাম্।

আজাদ - এদের দোষ, এদের দোষ এরা চেয়েছিল পাকিস্তানকে একটা সুন্দর দেশরূপে গড়ে তুলবে। এরা চেয়েছিল এখানে আল্লাহর শাশ্বত জীবন বিধান ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করতে। যাতে পাকিস্তানের মানুষ দুবেলা দুমুঠো ভাত, মোটা কাপড়, একটা আশ্রয়, একটু সুখের মুখ দেখতে পায়। সারাদিন মাটির ঘর্মক্লান্ত পরিশ্রমের ফলস্বরূপ পায় কিছু সুখের হাতছানি—

ফারাবী—সেদিন শুনলাম মওলানা মাদানী * সাহেব শহীদ হয়েছেন—

আজাদ—শুধু মাদানী সাহেব কেন, এরকম প্রতিদিন কত শত শত মাদানী অকাতরে জীবন বিলিয়ে দিচ্ছেন তার খবর রাখিস ! গতকাল নোয়াখালী হতে টেলিগ্রাম এল, মাত্র দশ দিনে সেখানে পঞ্চাশ জন ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মি শহীদ হয়েছেন (উদগত কান্না রোধ করে)—এ'সব ইতিহাস বড় কান্নার

---

* সৈয়দ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী ছিলেন পুর্ব পাকিস্তান নেজামে ইসলামী দলের সহসভাপতি। ১০ আগষ্ট '৭১ ঢাকার অদুরে মীর কাদিমে বক্তৃতা দেয়ার সময় মুক্তিযোদ্ধারা এই কুখ্যাত দালালকে গুলি করে হত্যা করে।

ইতিহাস রে—বড় করুন ইতিহাস—

... ...

ফারাবী—আচ্ছা আমরা ক'জনা যাচ্ছি তাহলে ?

আজাদ—প্রথম ব্যাচে প্রায় শ'দুয়েক—পরে আরো আসতে পারে—

ফারাবী—সত্যি আমার কি যে আনন্দ লাগছে আজ। আগে যখন ইসলামের ইতিহাস পরতাম—বদর, ওহুদ, খন্দকের যুদ্ধের ইতিহাস পড়তাম, তখন মনে হত, আচ্ছা আমরাও অমন ইসলামী মুজাহিদ হয়ে যুদ্ধের ময়দানে নামতে পারে না কেন ? কেন আমরাও আল্লাহ্‌র পথে শহীদ হওয়ার সুযোগ পাই না ? (একটু থেমে) সত্যি আজ সেই সোনালী সুযোগ এসেছে, সত্যি আজ কি যে আনন্দ লাগছে—কি আনন্দ !

ফারুক—আল বদর।

সমস্বরে—জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ।

(সবাই কক্ষ থেকে বেরিয়ে যাবে)

এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় জামাতের ছাত্র সংগঠনের নেতাদের লেখা এই সমস্ত রচনায় যে চিত্র বিধৃত হয়েছে সেটি তখনকার বাস্তবতাকেই তুলে ধরেছে। এই শৃংখলা এবং ধর্মিয় উন্মদনার কারণে আল বদর খুব তাড়াতাড়ি সন্ত্রাসবাদী চরমপন্থী দল হিসেবে পাকিস্তানী বাহিনীর নজরে পড়তে সক্ষম হয়। এছাড়া এদের মূল উদ্দেশ্য এবং বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনাকারী সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য অভিন্ন হওয়ার পাকবাহিনী এদেরকে দিয়ে তাদের নিজস্ব টার্গেট বুদ্ধিজীদেরকে নির্যাতন ও হত্যা করার কাজ নেবার সিদ্ধান্ত নেয় সেপ্টেম্বরের বুদ্ধিজীবী হত্যার পরিকল্পনা পেশের পর পরই সরাসরি পাক সামরিক কর্তৃপক্ষ এ উদ্দেশ্যে আল বদরকে সুসংগঠিত করে তুলতে থাকে। এ বিষয়ে ইতিপূর্বে উল্লেখিত নিউ এজ পত্রিকার রিপোর্টটিতে লেখা হয়—'আল বদর সংস্থা সমপর্কে অতি সম্প্রতি কিছু জানা গেছে। রাজনৈতিক দিক থেকে এই অস্ত্র সজ্জিত দলটি প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মিয় সম্প্রদায়িক দল জামাতে ইসলামীর দোসর। আল দব বাহিনীর সদস্যদের (প্রধানতঃ ১৮ থেকে ২০ বছর বয়সের তরুণরাই এর অন্তরভুক্ত) মাথায় এই কথাটাই ঢুকিয়ে দেয়া হয় যে জাতীয় মুক্তি সংগ্রামী ও ভারতীয় চরদের দ্বারা ইসলাম বিপন্ন হয়ে পড়েছে।

'বিগত গ্রীষ্ম ও শরতকালে দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে পরিচালিত জনপ্রিয় গেরিলা তৎপরতা যখন চরমে পৌঁছে, তখন পাকিস্তানী জেনারেলরা স্থানীয়

পুলিশের ওপর ক্রমশঃ আস্থা হারিয়ে ফেলেন এবং এবং স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করেন পাকবাহিনীর সেনাপতির ডায়রীতে লিখিত বক্তব্য থেকে এ কথার ইঙ্গিত পাওয়া যায়—'পুলিশ বাহিনীকে উটিয়ে নিতে হবে। আল বদরকে ব্যবহার করতে হবে -তাদেরকে অবশ্যই উত্তম অস্ত্র দিতে হবে।'

এ' সময় আল বদর বাহিনীর তৎপরতা সম্পর্কে নিম্নলিখিত দলিলটি থেকে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। ভবিষ্যৎ গবেষণায় সহায়তা হতে পারে। এই বিবেচনায় দলিলটি সম্পূর্ণ উদ্ধৃত হল। সংগ্রাম পত্রিকার ১৬ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সংখ্যার 'সম্পাদক সমীপেষু' কলামে জনৈক আল বদর কমাণ্ডারের লেখা এই পত্র নিম্নরূপ :

'জনাব'

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান 'আল বদর' বাহিনীর নাম আজ প্রদেশের প্রত্যন্ত প্রান্তে পৌছে গেছে। গত ২৭ জুন জামালপুর মহকুমার আল বদর বাহিনী গঠিত হবার পর আজ সমগ্র মোমেনশাহী জেলা ও প্রদেশের আরও দু একটি জেলায় এর কাজ শুরু হয়েছে বলে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আল বদর বাহিনী পাকিস্তানবাদী ইসলামপন্থী দেশ প্রেমিক ছাত্রদের দ্বারা গঠিত। স্কুলের ১২ বছরের ছেলে থেকে আরম্ভ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু ছাত্র রয়েছে।

'যতদুর জানা যায় পুর্ব পাকিস্তানের মধ্যে জামালপুর মহকুমাতেই পূর্ণ স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করছে। এখানে এস এস সি ও এইচ এস সি পরীক্ষায় ৪০% থেকে ৫০% ছেলে পরীক্ষা দিয়েছে। জামালপুর মহকুমার শেরপুর, নলিতাবাড়ি, ইসলামপুর, দেওয়ানগঞ্জ ও জামালপুর শহরে দুষ্কৃতকারীদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয় হয়েছে।

'জামালপুরের বিভিন্ন জায়গার সীমান্তবর্তী এলাকায় আল বদর বাহিনী সাহসিকতা ও সাফল্যের সাথে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীদের মোকাবিলা করেছে। আল বদর বাহিনীর তৎপরতা দেখে ভারতীয় অনুচর নাপাক বাহিনীর লোকেরা জামালপুর ছেড়ে অন্যত্র চলে যাচ্ছে বলে ক্রমাগত সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। আল বদর বাহিনীর বৈশিষ্ট্য হল এর প্রতিটি ছেলেই শিক্ষিত এবং নামাজ। পড়ে ধন সম্পদ ও নারীর প্রতি কোন লোভ নেই। বদর বাহিনীর গত তিন মাসের কাজে কোন চরিত্রগত দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায় নি। একজন্যেই জনগণের কাছে বদর বাহিনী দ্রুত জনপ্রিয়তা লাভ করছে। মোমেনশাহী জেলার জনগণের কাছে আশার আলকবর্তিকা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয় নাম আল বদর। জামালপুরে রাজাকার, পুলিশ, মুজাহিদ ও রেঞ্জাররা পুল ও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জায়গা পাহাড়া দিচ্ছে আর পাক ফৌজ ও আল বদর বাহিনী অপারেশন করছে।

'আমি পূর্ব পাকিস্তানের দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থী ছাত্র জনতার নিকট আহ্বান জানাচ্ছি সামরিক কর্তৃপক্ষের সহযোগিতা ও সাহায্য নিয়ে দ্রুত প্রদেশের সর্বত্র আল বদর বাহিনী গঠন করতে। বদর বাহিনী ছাড়া শুধু রাজাকার ও পুলিশ দিয়ে সম্পূর্ণ পরিস্থিতি আয়ত্বে আনা সম্ভব নয়। আমাদের কাছে রাজাকার, বদর বাহিনী বা মুজাহিদের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। আমরা সবাইকে মনে করি সমান। ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ও তার দালালদের শায়েস্তা করতে আজ তাই প্রদেশের সর্বত্র আল বদর বাহিনী গঠন করা প্রয়োজন।

'দেশের বর্তমান এ নাজুক ও সংকটপূর্ণ পরিস্থিতিতে যত তাড়াতাড়ি আল বদর বাহিনী প্রদেশের সর্বত্র গঠন হয় ততই দেশ ও জাতির মঙ্গল। আ. হ আমাদের তার পথে কাজ করার তৌফিক দান করুন। আমিন।

মুহাম্মদ আবদুল বারী
ইনচার্জ, আল বদর ক্যাম্প, ইসলামপুর থানা, মোমেনশাহী ও প্রচার
সম্পাদক, জামালপুর মহকুমা শান্তি কমিটি'

স্বাধীনতার পর আবদুল বারীর ব্যক্তিগত ডায়েরীটি উদ্ধার করা সম্ভব হয় ১০ মার্চ ,০৭২ দৈনিক ইত্তেফাকে মুদ্রিত ডায়েরীর প্রধান প্রধান বিবরণগুলি হচ্ছে২ :

"টাঙ্গাইলে Successful Operation হয়েছে। হাজার দেড়েকের মত মুক্তি-ফৌজ মারা পড়েছে আল বদর ও আর্মিদের হাতে।"

1. Haider Ali 2. Nazmul Hoque. Rs, 2500·00

তিতপল্লার শিমকুড়া গ্রাম-জব্বারের কাজ থেকে ২৯/১০/৭১ (তারিখে) আর তিন হাজার পরিকল্পনা আছে।......

"26-1 o-71...Prostitution Quaretr

24-1o-71,Raping Case -Hindu Girl"

ডায়েরীর এই পৃষ্ঠায় ছাপ মারা সিলে লেখা 'দি ডেইলী প্রগ্রেস অব পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ, জামালপুর ইউনিট, তারিখ ২৬-১০-৭১।'

সম্পাদক সমীপে আবদুল বারীর বক্তব্য এবং তার ডায়েরীর বিষয়বস্তুর মধ্যেকার পার্থক্য (বেশ্যাগমন, লুণ্ঠন ও হিন্দু মেয়ে ধর্ষণ) ইসলামের

---

২. বাংলাদেশে গণহত্যা, ফজলুর মুক্তধারা (স্বাধীন বাংলা সাহিত্য পরিষদ) ঢাকা প্রথম প্রকাশ—নভেম্বর ১৯৭২ পৃঃ—৬৫-৬৬

ধ্বজাধারী দালালদের তৎকালীন এবং বর্তমান মিথ্যাচারের স্বরূপ প্রকাশে উপযোগী বিবেচিত হতে পারে।

ইতিমধ্যে ২৫ নভেম্বর ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের কার্যকরী পরিষদ পুনর্গঠিত হয়। এই পরিষদে বুদ্ধিজীবী হত্যাযজ্ঞের 'চীফ একসিকিউটর' ('প্রধান জল্লাদ') আশরাফুজ্জামান সহ বুদ্ধিজীবী হত্যাকারী খুনী আল বদর কমাণ্ডাররা অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্তমানে জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরার সদস্য শামসুল হকের সভাপতিত্বে গঠিত এই কমিটির সদস্যরা ছিল—১। মোস্তফা শওকত ইমরান ২। নুর মোহাম্মদ মল্লিক ৩। এ, কে, মোহাম্মদ আলী ৪। আবু মোঃ জাহাঙ্গীর ৫। আশরাফুজ্জামান ৬। আ, শ, ম রুহুল কুদ্দুস ৭। সর্দার আব্দুস সালাম।

বুদ্ধিজীবী হত্যায় আল বদর

নভেম্বরের প্রথম থেকেই আল বদর নেতারা প্রকাশ্যে বুদ্ধিজীবীদের হুঁশিয়ারী দিতে থাকে। ৭ নভেম্বরের সারা দেশে মহা ঘটা করে পালন করা হয় আল বদর দিবস। এই উপলক্ষে জামাতে ইসলামী এবং ছাত্র সংঘ ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করে। নাখাল পাড়া আদর্শ শিক্ষায়তনে তেজগাঁ থানা জামাতে ইসলামী প্রধান মাহবুবুর রহমান গুরহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় জামাতের সেক্রেটারী জেনারেল আব্দুল খালেক বলেন 'পাকিস্তানে অনৈসলামী মতবাদ ও জীবন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য ইসলাম বিরোধী শক্তির সর্বতোমুখী আন্দোলনকে ধ্বংস করে দিতে হবে। ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদেরকে তাদের জীবনকে বাতেল শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের মুর্তমান প্রতীক হিসেবে কাজ করে যেতে হবে। এ জন্য আলবদর বাহিনীর মত পারস্পারিক মতভেদ ও অনৈক্য ভুলে মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ শক্তি হিসেবে দাঁড়াতে হবে।' (দৈনিক সংগ্রাম, ৮/১১/৭১)

আল বদর দিবসে ইসলামী ছাত্র সংঘের কর্মসূচী বর্ণনা দিয়ে ৮ নভেম্বরের দৈনিক সংগ্রামে লেখা হয়—'আল বদর দিবসে প্রদেশের জিন্দাদিল তরুণ সমাজের মধ্যে যে অনুপ্রেরণা পরিলক্ষিত হয়েছে তা অভুতপুর্ব। তারা একবাক্যে ঘোষণা করেছে, পৃথিবীর মানচিত্রে মানবতার দুশমন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব আমরা স্বীকার করি না। মানচিত্র থেকে হিন্দুস্তানের অস্তিত্ব মুছে না যাওয়া পর্যন্ত আল বদরের অনুপ্রেরণা নিয়েই আমরা শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ে যাব।

আল বদর দিবস উপলক্ষে গতকাল রোববার ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্র সংঘের উদ্যোগে এক বিরাট ছাত্র-গন মিছিল বের করা হয়। পবিত্র রমজানের মধ্যে গতকালই প্রথমই আল বদরের অনুপ্রেরণায় উজ্জীবিত মিছিলকারীদের জিন্দাদিল তরুণরা 'বীর মুজাহিদ অস্ত্র ধর, ভারত ভুমি দখল কর, 'দুনিয়ার মুসলমান এক হও' 'ভারতীয় দালালদের খতম কর' 'হাতে লও মেশিনগান দখল কর হিন্দুস্তান' হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে এক হও' 'ইসলামের সমাজ কায়েম কর, আমাদের রক্তে পাকিস্তান টিকবে,' প্রভৃতি শ্লোগানে রাজধানীর রাজপথ মুখরিত করে তোলে।

'পূর্বাহ্নে বাইতুল মোকাররম প্রাঙ্গনে, এক বিরাট গণ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

'ঢাকা শহর ইসলামী ছাত্রসংঘের সভাপতি জনাব সামসুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সমাবেশে সংঘের পূর্ব পাক সভাপতি আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ ও সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী বক্তৃতা করেন।

জনাব আলী আহসান মোহাম্মদ মুজাহিদ তাঁর তেজোদ্দীপ্ত ভাষণে বলেন, এদেশের তৌহিদবাদী মানব মানবতার দুশমন, শান্তির দুশমন, শান্তির দুশমন ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে স্বীকার করেনা। দুনিয়ার মানচিত্র থেকে হিন্দুস্তানের অস্তিত্বকে মুছে ফেলা না পর্যন্ত আমাদের সংগ্রামের বিরাম নেই।

'হিন্দুস্তানের সাংস্কৃতিক অনপ্রবেবেশের বিরুদ্ধে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে জনাব মুজাহিদ বলেন, 'আগামীকাল থেকে কোন লাইব্রেরী হিন্দুদের ও হিন্দুস্তানীয় দালালদের বই পুস্তক বেচাকেনা করতে পারবে না। আগামীকাল থেকে কোথাও হিন্দু ও হিন্দুস্তানী দালালদের বই-পুস্তক বেচাকেনা হতে দেখলে তা ভস্মিভুত করা হবে।

'পূর্ব পাক ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রধান ভারতীয় দালালদের বিরুদ্ধেও কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় দালালরা পাকিস্তানবাদী স্বেচ্ছাসেবীদের বিরুদ্ধে ক্রমাগত প্রচারনা চালাচ্ছে। এদের মুখ আমরা চিনি। তিনি জনগণকে এদের বিরুদ্ধে সজাগ থাকারও আহ্বান জানান।

'তিনি বলেন, পাকিস্তান শুধু এখানকাকার মুসলমানদের জন্যই গঠিত হয়নি। পাকিস্তান বিশ্ব মুসলিমের আশ্রয়স্থল। দুনিয়ার মুসলমানদের নেতৃত্ব দিয়ে পাকিস্তানকেই বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধারের জন্য এগিয়ে যেতে হবে। এই উদ্দেশ্যে প্রথম দিল্লীর বুকেই বৃহত্তর পাকিস্তানের পতাকা উড্ডীন করতে হবে।

'পূর্ব পাক ইসলামী ছাত্রসংঘের নবনিযুক্ত সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী তার বক্তৃতায় বলেন, পাকিস্তানীরা কোন অবস্থাই হিন্দুদের গোলামী বরণ করতে প্রস্তুত নয়। তিনি বলেন. আমরা শেষ রক্ত বিন্দু দিয়ে হলেও দেশের ঐক্য ও সংহতি অক্ষুন্ন রাখবো। সমাবেশ শেষে এক জঙ্গী মিছিল বাহাদুর শাহ পার্ক গিয়ে সমাপ্ত হয়।'

এসময় সম্ভবতঃ বুদ্ধিজীবী হত্যা চক্রান্ত চুড়ান্ত পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল। ৭ নভেম্বর তারিখেই প্রাদেশিক ছাত্রসংঘ প্রধান আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ সংঘের প্রাদেশিক কার্যকরী পরিষদের নাম ঘোষণা করেন। এরা হল—মুহম্মদ শামসুল হক (ঢাকা শহর), আবদুল হাই ফারুকী (রাজশাহী জেলা), সরদার আবদুস সালাম (ঢাকা জেলা), মোস্তাফা শওকত ইমরান (ঢাকা শহর), মতিউর রহমান (খুলনা), মীর কাশেম আলী চট্টগ্রাম, আবদুল জাহেদ মুহাম্মদ আবু নাসের (চট্টগ্রাম), আশরাফ হোসেন (মোমেনশাহী)। দুজন মনোনীত সদস্য ছিল এ, কে, মুহম্মদ আলী (ঢাকা শহর এবং মাজহারুল ইসলাম (রাজশাহী জেলা)।

বিভিন্ন জেলা সদরে নিযুক্তিপ্রাপ্ত এই নেতারা ছিল স্ব স্ব জেলার আলবদর প্রধান। বিভিন্ন বিভাগের বুদ্ধিজীবী অপহরণের কার্যক্রম এরাই পরিচালনা করেছিল। ঢাকা শহরে আলবদরের প্রধান জল্লাদ আশরাফুজ্জামান খানের উদ্ধারকৃত ডায়েরীতে মুহাম্মদ শামসুল হক ও শওকত ইমরানের নাম লিখিত হয়েছিল শহর আলবদর প্রধান হিসেবে। এই ডায়েরীতেই লিখিত ছিল নিহত বুদ্ধিজীবী-দের নাম ঠিকানা।

১৪ নভেম্বর তারিখে সংগ্রাম পত্রিকায় আলবদর সর্বাধিনায়ক (বর্তমানে জামাতে ইসলামীর সহ-সাধারণ সম্পাদক) মতিউর রহমান নিজামী 'বদর দিবস, পাকিস্তান ও আলবদর শীর্ষক এক উপ-সম্পাদকীয়তে লেখেন, 'বিগত দুবছর থেকে পাকিস্তানের একটি তরুণ কাফেলার ইসলামী পুনর্জাগরণ অন্দোলনের ছাত্র প্রতিষ্ঠান পাকিস্তান ইসলামী ছাত্রসংঘ এই ঐতিহাসিক বদর দিবস পালনের সুচনা করেছে।—সারা পাকিস্তানে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সাথে এই দিবস উদযাপিত হওয়ার পেছনে এই তরুণ কাফেলার অবদান সবচেয়ে বেশী।—

'হিন্দুবাহিনীর সংখ্যা শক্তি আমাদের তুলনায় পাঁচ গুণ বেশী। তাছাড়া আধুনিক সমরাস্ত্রেও তারা পাকিস্তানের চেয়ে অধিক সুসজ্জিত। দূর্ভাগ্যবশতঃ পাকিস্তানে কিছু মুনাফিক তাদের পক্ষ অবলম্বন করে ভেতর থেকে আমাদেরকে দুর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তাদের মুকাবিলা করেই—তাদের সকল ষড়যন্ত্র বানচাল করেই পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষা করতে হবে; শুধু পাকিস্তান রক্ষার আত্মরক্ষামুলক প্রচেষ্টা চালিয়েই এ' পাকিস্তানকে রক্ষা করা যাবেনা।

'বদরের যুদ্ধ থেকে অনেক কিছুই আমাদের শিখবার আছে। এই যুদ্ধের সৈনিকরা কেউ পেশাদার বা বেতনভুক সৈনিক ছিলেন না। মুসলমানরা সবাই ছিলেন সৈনিক, তারা সবাই ছিলেন স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ, ঈমানের তাগিদেই তারা লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন বিরাট শক্তির মুকাবিলায়! বৈষয়িক কোন স্বার্থই ছিলনা তাদের সামনে। মরলে শহীদ বাঁচলে গাজী—এই ছিল তাদের বিশ্বাসের অঙ্গ। ঈমানের পরীক্ষায় তারা ছিলেন উত্তীর্ণ। সংখ্যার চেয়ে গুণের প্রাধান্য ছিল সেখানে লক্ষ্যণীয়। পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-কলহের লেশমাত্র ছিলনা তাঁদের মাঝে। এক রসুলের নেতৃত্বে তারা সবাই ছিলেন সীসা ঢালা প্রাচীরের ন্যায় ঐক্যবদ্ধ একমাত্র আল্লাহ্‌র সাহায্য ছিল তাদের সম্বল। আর আল্লাহর সন্তোষ ছিল তাদের কাম্য। আজকের বাফেরদের পর্যদুস্ত করতে হলে আমাদের মধ্যেও অনুরূপ গুণাবলীর সমাবেশ অবশ্যই ঘটাতে হবে।

'আমাদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে। পাক সেনার সহযোগিতায় এদেশের ইসলামপ্রিয় তরুণ ছাত্রসমাজ বদরযুদ্ধের স্মৃতিকে সামনে রেখে আলবদর বাহিনী গঠন করেছে। বদর যুদ্ধে মুসলিম যোদ্ধাদের সংখ্যা ছিল তিন শত তের। এই স্মৃতিকে অবলম্বন করে তারাও তিন শত তের জন যুবকের সমন্বয়ে এক একটি ইউনিট গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বদর যোদ্ধাদের যেইসব গুণাবলীর কথা আমরা আলোচনা করেছি, আলবদরের তরুণ মর্দে মুজাহিদদের মধ্যে ইনশাআল্লাহ সেই সব গুণাবলী আমরা দেখতে পাব।

'পাকিস্তানের আদর্শ ও অস্তিত্ব রক্ষার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে গঠিত আল বদরের যুবকেরা এবারের বদর দিবসে নতুন করে শপথ নিয়েছে, তাদের তেজোদ্দীপ্ত কর্মীদের তৎপরতার ফলেই বদর দিবসের কর্মসূচী দেশবাসী তথা দুনিয়ার মুসলমানের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হয়েছে। ইনশা আল্লাহ বদর যুদ্ধের বাস্তব স্মৃতিও তারা তুলে ধরতে সক্ষম হবে। আমাদের বিশ্বাস সেদিন আর খুব দুরে নয় যেদিন আল বদরের তরুণ যুবকেরা আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর পাশাপাশি দাঁড়িয়ে হিন্দুবাহিনীকে পর্যুদস্ত করে হিন্দুস্তানকে খতম করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় পতাকা উড্ডীন করবে।'

২৩ নভেম্বর ইয়াহিয়া খান সারাদেশে জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর পরই প্রাদেশিক ছাত্রসংঘ সভাপতি আলী আহসান মোঃ মুজাহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক মীর কাসেম আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে 'সৈনিক হিসেবে প্রস্তুত হয়ে যাওয়ার জন্য দেশের দেশপ্রেমিক যুবকদের প্রতি আহ্বান জানান।'

(দৈনিক সংগ্রাম, ২৪/১১/৭১) এসময় থেকেই দেশের অন্যান্য স্থানে বুদ্ধিজীবী হত্যা শুরু হয়ে যায়। ঢাকার বুদ্ধিজীবীদের কাছে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হবার জন্য হুঁশিয়ারী দেয়া আল বদরদের চিঠিও এসময় এসে পৌঁছতে থাকে। এই চিঠিটি ছিল নিম্নরূপ :

শয়তান নির্মূল অভিযান

শয়তান,

ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুদের যে সব পাচাটা কুকুর আর ভারতীয় ইন্দিরাবাদের দালাল নানা ছুতানাতায় মুসলমানদের বৃহত্তর আবাসভূমি পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যর্থ চেষ্টা করেছে তুমি তাদের অন্যতম। তোমার মনোভাব, চলাচলও কাজকর্ম কোনটাই আমাদে অজানা নেই। অবিলম্বে হুশিয়ার হও এবং ভারতের পদলেহন থেকে বিরত হও, না হয় তোমার নিস্তার নেই। এই চিঠি পাওয়ার সাথে সাথে নির্মূল হওয়ার জন্য প্রস্তুত হও।—শনি

এ সময়ই পাকবাহিনী আল বদরের কেন্দ্রীয় কমাণ্ডারদের বুদ্ধিজীবী হত্যাকণ্ডের ব্যপারে চূড়ান্ত 'ব্রিফিং' করে। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড তথ্যানুসন্ধান কমিটির অস্থায়ী দপ্তর ঢাকা প্রেসক্লাবে পাকবাহিনীর সাথে আল বদরের যোগাযোগের বহু দলিল সংগৃহীত হয়। একটি দলিল ছিল ১৯৭১ সালের ১৬ নভেম্বর তারিখে ঢাকার আল বদর ক্যাম্পের নামে ইস্যু করা একদিনের নির্দেশ। এই দলিল থেকে বোঝা গিয়েছিল এ সময় পাক সেনাবাহিনী এই ক্যাম্পকে হত্যার উপকরণ, যানবাহন এবং অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করেছে। পাক সেনাবাহিনীর অফিসারদের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে এই খুনিদেরকে হত্যাকর্মে নিয়োজিত করা হয়েছিল। এতে কোন এক ক্যাম্পে ক্লাশ অনুষ্ঠানের সময়সূচীও দেখা গিয়েছিল। এসমস্ত মসস্তিষ্ক ধোলাই ক্লাশের সমস্ত লেকচারই উপ-আঞ্চলিক ও সামরিক আইন প্রশাসক ব্রিগেডিয়ার বশির, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ সেনা অফিসাররা দিতেন বলে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

২ ডিসেম্বর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপ-ইউনিটগুলো পুনর্বিন্যাস করা হয় এবং আটক নিপড়ন ও হত্যা প্রভৃতি কাজে আলাদা আলাদা ইউনিট সমূহকে নিযুক্ত করা হয়।

আল বদর বাহিনীর হত্যাকারীদেরর এ সময়ে ইউনিটে বিভক্ত করে বিভিন্ন এলাকায় অপহরণ করার দায়িত্ব দেয়া হয়। অপহরণের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত বুদ্ধিজীবীর বাড়ীতে হানা দিতে হবে তার আলাদা আলাদা লিস্ট এদের হাতে দেয়া হয়।

৪ ডিসেম্বর শুরু হয় বুদ্ধিজীবী অপহরণের উদ্দেশ্যে আরোপিত সেই কার্ফু এবং ব্লাক আউট। এদিন থেকে ঢাকা শহরে আল বদর বাহিনী 'গণসংযোগ অভিযান' শুরু করে। আল বদর ব্যানার শোভিত জীপে মাইক লাগিয়ে আল বদররা সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। এ সময় তারা 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ,' 'দাঁত ভেঙ্গে দাও, দাঁত ভেঙ্গে দাও হানাদার হিন্দুদের,' ব্রাহ্মণ্যবাদের দালালরা, হুঁশিয়ার হুঁশিয়ার, 'ইসলামের শত্রুরা হুঁশিয়ার সাবধান,' 'ভারতের দালালেরা হুঁশিয়ার সাবধান' ইত্যাদি শ্লোগান দেয়। পুরনো ঢাকার নবাবপুর, সদরঘাট, চকবাজার, নাজিরাবাজার বংশাল এবং নতুন শহরের নিউ মার্কেট, সেকেণ্ড ক্যাপিটাল, মোহাম্মদপুর এলাকায় তারা পথসভার আয়োজন করে। এ সমস্ত সভায় ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ বুদ্ধিজীবিদের হুঁশিয়ার করে দিয়ে বিভিন্ন বক্তব্য দিয়ে আল বদরদের প্রস্তুত থাকতে বলে।

এ উপলক্ষে ছাত্র সংঘের পূর্ব পাক সভাপতি আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ এবং সাধারণ সম্পাদক মীর কাশেম আলী এক যুক্ত বিবৃতিতে 'হানাদার হিন্দুস্তানী বাহিনীর আক্রমনের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেবার জন্য পাকিস্তানী সেনাবাহিনীকে মোবারকবাদ' জানিয়ে বলেন, 'এবারও হিন্দুস্তান তস্করের ন্যায় পাকিস্তানের উপর সর্বাত্মক হামলা চালিয়েছে। ইতিমধ্যেই হিন্দুস্তানের সাথে আমাদের যে প্রচণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়েছে তাতে আমরা আল্লাহর রহমতে সাফল্যজনকভাবে এগিয়ে চলছি।

'পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে সাম্রাজ্যবাদী হিন্দুস্তানী হামলাকে সাফল্যজনকভাবে প্রতিহত করায় জন্য আমরা মহান আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করার সাথে সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকেও জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন।

'হিন্দুস্তানকে হুঁশিয়ার করে দিতে চাই, পাকিস্তানকে ধ্বংস করতে এসে হিন্দুস্তান নিজেই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের গত কালের বেতার ভাষণকে অভিনন্দন জানিয়ে আমরাও ঘোষণা করছি যে এদেশের ছাত্র-জনতা' ৬৫ সালের মতন এবারও ইস্পাত কঠিন শপথ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সাথে সহযোগিতা করে যাবে।

'আমাদের ইতিহাস একথার সাক্ষ্য যে, মুসলমান কোন দিন পরাজয় বরণ করেনি। এবারও ইনশাআল্লাহ আমরা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত পাকিস্তানের বুকে ইসলামের বিজয় ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটাব।

'পরিশেষে এদেশের ১২ কোটি তৌহিদী জনতাকে বলি, কোরআনের মহান আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে এক হাতে সমরাস্ত্র নিয়ে সৈনিকের ভূমিকা পালন করে দুশমন হিন্দুস্তানের উপর মরণ আঘাত হানুন।' ডিসেম্বরের প্রথম দশদিন এভাবে বুদ্ধিজীবী নিধনের প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

সেই অতি নৃশংস হত্যাযজ্ঞ সম্পন্ন করার জন্য আল বদররা ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করা শুরু করে ১০ ডিসেম্বর থেকে। কার্ফু এবং ব্লাক আউটের মধ্যে জীপে করে আল বদররা দিন রাত বুদ্ধিজীবীদের বাড়ি বাড়ি যেয়ে তাঁদেরকে প্রথমে সারা গায়ে কাদামাখানো একটি বাসে তোলে। এরপর বাস বোঝাই বুদ্ধিজীবীসহ নানা স্তরের বন্দীকে প্রথমে মোহাম্মাদপুরের ফিজিক্যাল ট্রেনিং কলেজের আল বদর হেডকোয়ার্টারে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। এখান থেকে ভিন্ন ভিন্ন দলে ভাগ করা অনেক বন্দীকে কাকরাইল মসজিদ' ধানমণ্ডি হাইস্কুল এবং এম, এল, এ হোস্টেলের আল বদর নির্যাতন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। আল বদরদের এই অপহরণ স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিতে হয় কোন আল বদর কমাণ্ডার নতুবা পাকবাহিনীর অনধিক ক্যাপ্টেন মর্যাদার কোন অফিসার। সম্ভবতঃ পাকবাহিনীর নিজস্ব টার্গেট বুদ্ধিজীবিদের অপহরণের ব্যাপারে নিশ্চিত হবার জন্যই পাক সেনা অফিসার অপহরণ স্কোয়াডের নেতৃত্ব দিত।

অপহরণের সময় বুদ্ধিজীদের যিনি যে অবস্থায় 'ছিলেন' আল বদর তাঁদেরকে সে অবস্থায়ই ধরে নিয়ে যায়। কাউকে গভীর রাতে ঘুম থেকে তুলে, কাউকে বা দুপুর বেলায় খাবার টেবিল থেকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। লুঙ্গি, গেঞ্জি, যিনি যে পোশাক পরে ছিলেন, সেই পোশাকেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়। অপহরণের পর পরই গামছা বা পরিধের বস্ত্র দিয়ে প্রত্যেকের হাত পেছন দিকে শক্ত করে বাঁধা হয়।

আল বদর হেডকোয়ার্টারে রেখে নির্যাতন ও জিজ্ঞাসাবাদ করার পর গভীর রাতে বাস ভর্তি করে বুদ্ধিজীবীদেরকে রায়েরবাজার ইটখোলায় নিয়ে গিয়ে কিভাবে হত্যা করা হয়েছে তার প্রত্যক্ষদর্শির বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে।

পুনর্বাসন প্রক্রিয়া

আত্মবিস্মৃত, অকৃতজ্ঞ আমরা আল বদরের এই সমস্ত উম্মাদ খুনিদের পূনর্বাসিত হতে দিয়েছি তাদের সংগঠনিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত রেখে। আজকের ইসলামী ছাত্র শিবির এবং ৭১ এর ইসলামী ছাত্র সংঘের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, শুধু নামের শেষের একটি শব্দের পরিবর্তন এবং বয়োজ্যেষ্ঠ আল বদরদের শিবির মূল সংগঠন জামাতে ইসলামীতে যোগদান ছাড়া।

৭১ থেকে মোটামুটিভাবে ৭৫ সাল পর্যন্ত আলবদর নেতারা আত্মগোপন করে ছিল। গোপনে গোপনে চলছিল সংঘের পুনর্গঠনের কাজ। অর্থসংস্থানের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের দেশসমুহে 'বাংলাদেশে ইসলাম পন্থীরা নির্যাতিত হচ্ছে' এই ধুয়া তুলে অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা হয়। জামাত ও আল বদরের সবচেয়ে জঘন্য খুনীদের কয়েক-জন আজও এসমস্ত দেশে উচ্চ পদে আশীন হয়ে আছে। এসময় তাদের কিছু বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা 'মওলানা' হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে সিরাত মাহফিল, আজিমুশশান জলসা, ওয়াজ মাহফিল ইত্যাদিতে ইসলাম সম্পর্কে ওয়াজ করতে থাকে। ৭২ এর জানুয়ারী মাসেই আল বদরের খুনিরা ছদ্মবেশে তবলীগ জামাতে ঢুকে প্রচারণা শুরু করে। ৬ ফেব্রুয়ারী ৭২ দৈনিক আজাদের 'বদর বাহিনী তবলীগে ঢুকে পরেছে' শীর্ষক প্রতিবেদন থেকে দেখা যায় যে, এ সময় ওরা ৬০টি তবলীগ দল গঠন করে সারা বাংলাদেশ সফরের পরিকল্পনা করে ছিল। ৭৭ সালের শুরু পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে চলতে থাকে আল বদরদের সংগঠিত করার কাজ।

এরপর, ১৯৭৭ সালের ৬ ফেব্রুয়ারী ঢাকার সিদ্দিক বাজার কম্যুনিটি সেণ্টারে একাত্তরের আল বদর হাইকমাণ্ডের নেতৃত্বে আল বদরদের নিয়ে ইসলামী ছাত্র শিবির আত্মপ্রকাশ করে। প্রতিষ্ঠার সময় পরিবর্তন হিসেবে শুধু কুখ্যাত ইসলামী ছাত্র সংঘ থেকে সংঘ বাদ দিয়ে জুনিয়র আল বদরদের সংগঠন 'শাহিন শিবির' শব্দটি জুড়ে দেয়া হয়। এছাড়া পতাকা, মনোগ্রাম ইত্যাদি সমস্তই ছিল অবিকল ইসলামী ছাত্র সংঘের। প্রতিষ্ঠার পর থেকে স্বভাবতঃ ধর্মভীরু, ছাত্র সংঘের অতীত ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ বিপুল সংখ্যক ছাত্র ও তরুণকে এরা দল ভুক্ত করতে সক্ষম হয়। এছাড়া আর্থিক প্রলোভনতো আছেই।

১৬ ডিসেম্বরের পর হতে গোনা মাত্র দশ বারো জন আল বদর খুনী দেশ ছেড়ে পালাতে শুরু পেরেছিল। ৭১ থেকে ৭৭ এই ৬ বছরে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের। এছাড়া স্বাধীনতার পর ছাত্র সংঘের বাঙ্গালী কয়েকজন কর্মী পাকিস্তান চলে যেতে সমর্থ হয়। আল বদর হাইকমাণ্ডের অধিকাংশ সদস্যসহ বাদবাকী সমস্ত আল বদর নামধারী ছাত্র সংঘ কর্মি ছাত্র শিবিরে যোগ দেয়। জামাতী ইসলামীর কর্মিদের জন্য অন্য কোন দলে যোগদান বা অনুপ্রবেশ একেবারেই নিসিদ্ধ। একারণেই, স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় গণহত্যার নেতৃত্ব দানকারী অন্যান্য দল বহুধা বিভক্ত হয়ে যাওয়া এবং এদের অনেক নেতা ও কর্মি পরবর্তীকালে ক্ষমতাশীল দলগুলিতে যোগ দেয়া সত্বেও ৭৭ সালে পুনরুত্থিত ইসলামী ছাত্র শিবির ছিল একেবারে অভগ্ন ৭১ এর আল

বদর বাহিনী। এদের সাংগঠনিক কাঠামো, কর্মসূচী, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা সবই ৭১ এর ছাত্র সংঘের অবিকল অনুকৃতি।

কয়েকজন উল্লেখযোগ্য

ছাত্র শিবির এবং জামাতে ইসলামীতে অন্তরভুক্ত সমস্ত আল বদরের পরিচয় দেয়া এই পরিসরে সম্ভব নয়, তবে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ছাত্র শিবিরের কেন্দ্রীয় নেতৃত্বে যারা ছিল তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিই সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করবে আজকের শিবিরই একাত্তরের আল বদর।

এদের মধ্যে আল বদর বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মতিউর রহমান নিজামী এবং আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদের ৭১ সালের ভূমিকার সংক্ষিপ্ত আলোচনা ইতিপুর্বে হয়েছে। জামাতের রাজনীতির প্রকৃতিই হচ্ছে ধাপে ধাপে কর্মী গড়ে তোলা; বয়স অনুযায়ী শাহীন শিবির, ইসলামী ছাত্র শিবির এবং জামাতে ইসলামীর মূল দলে কর্মীরা অন্তর্ভুক্ত হয়। এর প্রথম দুটি স্তরের যে কোন একটির কোন কর্মীর বয়স বাড়লে তাকে পরবর্তী স্তরে অন্তরভুক্ত করা হয়। এই প্রক্রিয়ার কারণে ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠার সময় উপরোক্ত দুজন ছাত্র সংঘ নেতা শিবিরে যোগ না দিয়ে পরবর্তীতে সরাসরি জামাতে যোগ দেয়। বর্তমানে এ-দুজন যথাক্রমে জামাতে ইসলামীর সহ সাধারণ সম্পাদক এবং ঢাকা শহর আমীর।

ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মীর কাসেম আলী ছিলেন আল বদর হাই কমাণ্ড সাদস্য, চট্টগ্রাম শহর ইসলামী ছাত্র সংঘ সভাপতি এবং চট্টগ্রাম জেলা রাজাকার ও শহর আলবদর বাহিনী প্রধান। 'পুনর্বাসিত রাজাকার, আল শামস ও অন্যান্য সন্ত্রাসবাদী সংগঠন' অধ্যায়ে কিভাবে তিনি শান্তি কমিটির সভায় বক্তব্য পেশ করেন তা উল্লেখিত হয়েছে। বর্তমাসে তিনি ঢাকা মহানগরী জামাতের নায়েবে আমীর এবং রাবিতা-ই-আলম আল ইসলামীর বাংলাদেশ শাখার পরিচালক। ছাত্র শিবিরের দ্বিতীয় সভাপতি কামরুজ্জামান ছিলেন আল বদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক, ইতিপূর্বে তার তৎপরতা আলোচিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি জামাতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক।

ছাত্র শিবিরের তৃতীয় সভাপতি আবু তাহের ছিলেন চট্টগ্রাম জেলা ছাত্র সংঘ সভাপতি দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং জেলা আল বদর বাহিনী প্রধান।

বস্তুত: এভাবে তালিকা দীর্ঘতর করার প্রয়োজন নেই ক্ষুদ্র পরিসর এই পুস্তকে; ইসলামী ছাত্র শিবিরের প্রতিষ্ঠার পর থেকে প্রত্যেক ইউনিটের প্রায় প্রত্যেক নেতা একাত্তরের খুনী আল বদর। বইয়ের শেষে পরিশিষ্টে আল বদর হাই

কমাণ্ডের কে কোথায় আছে সেই তথ্য সংযোজিত হয়েছে।

এই খুনীরাই বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকারী। এদের নৃশংসতার পরিচয় কিছু কিছু ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে ; তবু আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলার জন্য এখানে ইসলামী ছাত্র শিবিরের ১৯৮০-৮১ সালের সাধারণ সম্পাদক এনামুল হক মঞ্জু কিভাবে ১৯৭১ সালে বাঙ্গালী নির্যাতনের কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন তার সামান্য বর্ণনা দেয়া যেতে পারে।

এনামুল হক মঞ্জু ৭১ সালে ছিলেন চট্টগ্রাম সরকারী কলেজ ইসলামী ছাত্র সংঘ সভাপতি এবং আল বদর প্লাটুন কমাণ্ডার। চট্টগ্রাম শহরের টেলিগ্রাফ হিল রোডের হোটেল ডালিমে ছিল তার অফিস এবং নির্যাতন কেন্দ্র (হিন্দুদের কাছ থেকে ভবনটি কেড়ে নিয়ে এর মুসলিম নামকরণ করা হয়েছিল)। এই নির্যাতন কেন্দ্রে কিভাবে বন্দী অসহায় বাঙ্গালীদের ওপর নির্যাতন চালানো হয়েছে তার সামান্য পরিচয় দেবার জন্য ১৯৭২ সালের ৭ জানুয়ারী 'দৈনিক পূর্বদেশ পত্রিকার প্রথম পাতায় প্রকাশিত 'হানাদারদের নির্যাতন কক্ষে' প্রতিবেদনটি এখানে উদ্ধৃত হচ্ছে—'এ বন্দী শিবিরে যাদের আটক রাখা হতো তাদের প্রথম তিনদিন কিছুই খেতে দেওয়া হতনা। এ সময় যারা পানি চাইত-তাদের বেশীর ভাগ দেয়া হতো মানুষের প্রশ্রাব। কাঁচা নারকেলের পুরনো খোলসে করে যেদিন আমাকে পানি হিসেবে তারা খেতে দিল এতটুকু পানিয়, তখন আমি ভেবেছিলাম হয়তো বা অপরিস্কার কোন নালা নর্দমার পানি হতে পারে। প্রতি দিনের ঘড়ি ধরা বিভিন্ন প্রকারের দৈহিক নির্যাতনের ফলে শরীরের অবস্থা এমন হয়েছিল যে, আর কিছু খেতে ইচ্ছা না হলেও মধ্যে মধ্যে পানির তেষ্টায় বুক ফেটে পড়তে চাইতো। তাই পানি চাইতাম। আর তারা এনে দিতো এ জাতীয় জলীয় পদার্থ প্রথম দিন মুখে নিতেই ধরা পড়ে যায়, তাই গলাধঃকরণের আগে ফেলে দিয়ে ছিলাম। এরপর আর পানি খেতাম না।

আল-বদরের বন্দী শিবির চট্টগ্রামের হোটেল ডালিম থেকে ১৭ই ডিসেম্বর খালাস পেয়ে পশ্চিম মাদারবাড়ীর জনাব আবুল কাশেম পেশকারের ছেলে ১৮ বছর বয়সের নজমুল আহসান সিদ্দিকী (বাবুল) তার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে গিয়ে আমাকে এ সব কথাগুলো বলেছিল।

'হোটেল ডালিম' চট্টগ্রামের কেন্দ্রীয় টেলিগ্রাম অফিসের পেছনে অবস্থিত। শত্রু বাহিনীর বর্বর পশুরা হোটেলটিকে দখল করে আলবদরের বন্দী শিবির হিসেবে ব্যবহার করতে ছেড়ে দিয়েছিল।

বাবুল আমাকে জানিয়েছে, প্রায় সাড়ে তিনশ লোক ১৭ তারিখে

ঐ হোটেলটির বিভিন্ন কামরা থেকে মুক্তি পেয়েছে। ১৭ তারিখের আগে ঐ হোটেল থেকে কত লোককে নরখাদকরা হত্যা করেছে বাবুল তা বলতে পারেনি। তবে সে বলেছে প্রতিটি সিঙ্গেল রুমে ১০ থেকে পনের জন লোককে চোখ বেঁধে আটক করে রাখা হতো। ফলে একই রুমে কোন পরিচিত লোক থাকলে তাকেও কথা না বলে চিনবার জো ছিলনা, সুতরাং প্রতিটি রুমে আটক লোকের সংখ্যাও সঠিকভাবে নির্ণয় করা কঠিন ছিলো। প্রত্যেকটি রুমের সামনে ছিল সশস্ত্র পাহারাদার। সময় হলেই তারা এসে নির্যাতন চালিয়ে যেতো।

'বাবুল বললো, মধ্যে মধ্যে রুমের ভেতর নতুন কণ্ঠস্বরও শুনতাম আর কোন কোন সময় পরিচিত কণ্ঠের আওয়াজ শুনতে না পেয়ে ভাবতাম সে হয়তো নেই। দিনের বেলা একটু নির্যাতন কম করা হতো। রাতের বেলা প্রায় সারাক্ষণই নির্যাতন চালানো হতো। অনেক সময় রাত-দিন আলাদা করে নিতেই পারতাম না। কারণ চোখেতো আর আলোর কোন প্রতিফলন পড়ছেনা। যা খেতে দিত তাই খেতে হতো—কেবল পানি ছাড়া। কারণ—না বললে কেউ পনি দিত না।

'সারারাত কেবল হোটেলময় মানুষের আর্তচিৎকারই শুনা যেত। সম্ভবতঃ এ শব্দ বাইরে প্রকশ হতো না।

'কি কি ধরনের শাস্তি দেয়া হতো জিজ্ঞাসকরলে—বাবুল চুপ করে যায়। শুধু বলে—সব রকমের শারীরিক শাস্তি। জিজ্ঞেস করলাম যারা বেরিয়ে এসেছে তাদের সবাই কি অক্ষত ছিল? সে বললো,—'না' অক্ষত কেউ আসতে পারেনি। সবাইকে কিছু কিছু স্থানীয় নির্যাতনের চিহ্ন নিয়ে আসতে হয়েছে। যেমন, কারো শরীরের হাড়ভাঙ্গা, কারো অঙ্গুল কাটা অথবা কারো এক চোখ, এক কান; এক হাত বিনষ্ট ইত্যাদি। বাবুল জানালো তার একটা পা এবং কয়েকটি আঙ্গুলে ভীষণ লেগেছে। তবে একেবারে বিনষ্ট হয়ে না গেলেও স্বাভাবিক হতে অনেক সময় লাগবে।

বাবুল জানায় যে, মধ্যে মধ্যে হোটেলের অভ্যন্তরে গুলির শব্দ শোনা যেতো। কিন্তু সেগুলি কেন বা কি ব্যাপারেতো তাদের জানবার উপায় ও অবকাশ ছিল না। মুক্ত হবার পর সে দেখেছে, হোটেলের একটি রুম খালি ছিল এবং সে রুমের দেওয়াল এবং মেঝেতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বহু রক্ত কণিকার ছাপ রয়েছে। সম্ভবতঃ এ রুমে পর্যায়ক্রমে লোকদের এনে গুলি করে হত্যা করে তারপর অন্যত্রে সরিয়ে ফেলা হতো।

'১৯ ডিসেম্বর চট্টগ্রাম শত্রুমুক্ত হবার পর বাবুল বন্দীদশা থেকে বেরিয়ে এসে চারদিন যাবৎ কারো সাথে কোন কথা বলতে পারে নি। শরীরের বিভিন্ন স্থানে

নির্যাতনের দরুন স্বভাবতই সে ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত বোধ করছিল। তদুপরি তার যেন খানিকটা মানসিক বিকৃতিও ঘটেছে বলে সবাই ধারণা করেছিলেন। চারদিন পর সে প্রথম কথা বলেছিল, ''আমি গোসল করবো।'' তারপর থেকে দু-চারটি কথা সে বলতে থাকে। কিন্তু তার ভেতর বেশীর ভাগ কথাবার্তা কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ মনের অভিব্যক্তি বলে সবাই আশংকা করছেন। আজও বাবুল ঘুমের ঘোরে মধ্যে মধ্যে চিৎকার করে উঠে সামান্য শব্দেও সে আতংকগ্রস্ত হয়ে ওঠে।'

মূল জামাতে ইসলামীতে পুনর্বাসিত খুনী বুদ্ধিজীবী হত্যাকারীদের দৃষ্টান্ত দেবার জন্য এখানে তথাকথিত মওলানা এ, বি, এন, খালেক মজুমদারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হবে।

সাংবাদিক শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলার প্রধান আসামী এ, বি, এম, খালেক মজুমদার ১৯৭১ সালে ঢাকা শহর জামাতে ইসলামীর দপ্তর সম্পাদক ছিলেন। ১৬ ডিসেম্বর থেকে ২২ ডিসেম্বর তিনি আত্মগোপন করে থাকেন। ইতিমধ্যে শহীদুল্লাহ কায়সারের আলবদর বাহিনীর শিকারে পরিণতি হবার খবর জানার পর স্থানীয় কায়েতটুলী মসজিদের ইমাম হাফেজ মোহাম্মদ আশরাফউদ্দিন শহীদুল্লাহ কায়সারে বাড়িতে গিয়ে জানান, স্থানীয় খালেক মজুমদার কয়েক দিন আগে তাঁর কাছে শহীদুল্লাহ কায়সারের ঠিকানা এবং তিনি রাত্রে কোথায় থাকেন জানতে চেয়েছিল। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে ছোট কাটরার গেরিলা বাহিনী খালেককে রামপুরার টেলিভিশন কেন্দ্রের কাছাকাছি একটি গোপন আড্ডা থেকে গ্রেফতার করে। খালেককে আটক করার পর ইমাম সাহেবের কাছে নিয়ে আসা হলে তিনি তাকে সনাক্ত করেন।

গ্রেফতারের সময় খালেকের বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে ১ টি পিস্তল, ৪০ রাউণ্ড গুলি বদর বাহিনীর ট্রেনিং সংক্রান্ত কাগজ, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার ব্যাপারে জামাতের সর্বশেষ সার্কুলার,সামরিক ব্যক্তিদের নামের তালিকাসহ অনেকগুলি ছবি ও অন্যান্য কাগজপত্র পাওয়া যায়। এছাড়া তার ডায়েরীর পাঁতায় কার্ফু জারী করা সংক্রান্ত একটি স্বাক্ষর বিহীন নোটিশ, অপর পাতায় মীরপুর মোহাম্মদপুর থানায় ব্রিগেডিয়ার রাজা, রমনা থানার ব্রিগেডিয়ার আসলাম, তেজগাঁ থানার ব্রিগেডিয়ার শরীফ, সূত্রপুর থানার ব্রিগেডিয়ার বশির এবং ধানমণ্ডি থানার ব্রিগেডিয়ার শফীর নাম পাওয়া যয়। এই সামরিক আফিসাররা বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ ও হত্যার সাথে জড়িত ছিল।

গ্রেফতারের পর খালেক মজুমদারের স্বাক্ষরকৃত ও পেশকৃত এক বিবৃতিতে, বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত আরেও ৯ জনের নাম

পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু এদের অনেকেই সুপরিচিত হওয়ায় সংবাদপত্র গুলি 'সসঙ্গত কারণেই' এদের নাম প্রকাশে বিরত থাকে।

এছাড়া খালেকের উদ্ধারকৃত বিভিন্ন কাগজপত্রে আরও দেখা যায় যে, তার সাথে এবং জামাতের অন্যান্য নেতার সাথে টেলিফোনের বেশ কিছু সংখ্যক অফিসারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। উল্লেখ্য, বুদ্ধিজীবীদের হত্যার জন্য তুলে নিয়ে যাবার সময় তাঁদের সবার বাসার টেলিফোন লাইন কেটে দেয়া হয়েছিল।

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামালার রায় থেকে জানা যায় যে, ১৯৭১ সালের ১৪ ডিসেম্বর সন্ধার পর পরই কারফিউ এবং ব্লাক আউটের মধ্যে এ, বি, এম খালেক মজুমদার আরও ছ'সাত জন আল বদরকে নিয়ে দরজা ভেঙ্গে শহীদুল্লাহ কায়সারের বাড়িতে ঢোকেন। তাদের পরনে ছিল ছাই রঙের পোশাক, সাদা কাপড়ে মুখ বাধা ছিল। হাতে ছিল রিভলবার, রাইফেল এবং স্টেনগান। দলের তিনজন লোক দোতলা থেকে শহীদুল্লাহ কায়সার এবং তাঁর অনুজ জাকারিয়া হাবিবকে ধরে নিয়ে আসে। এসময় শহীদুল্লাহ কায়সারের স্ত্রী পান্না কায়সার, ছোট বোন শাহানা বেগম, ভগ্নিপতি নাসির আহমেদসহ উপস্থিত সবাই তাদেরকে ছেড়ে দেবার জন্য চিৎকার করে অনুনয় করতে থাকেন। এ' পর্যায়ে খালেক মজুমদার ও তার সঙ্গীরা জাকারিয়া হাবিবকে ছেড়ে দিয়ে শহীদুল্লাহ কায়সারকে টেনে নিয়ে যেতে থাকলে তাঁর স্ত্রী এবং আত্মীয়রা আল বদরদের বাধা দেন। তখন খালেক মজুমদার ও তার সঙ্গীরা স্টেনগানের বাট দিয়ে ভয়ার্ত আত্মীয় স্বজনকে পিটিয়ে তাদেরকে পথ থেকে সরিয়ে শহীদুল্লাহ কায়সারকে ধরে নিয়ে চলে যায়।

শহীদুল্লাহ কায়সার হত্যা মামলায় খালেক মজুমদারের বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছিল। বিচারক স্পেশাল জজ এফ, রহমান আসামীকে দোসী সাব্যস্ত করে দণ্ড প্রদান করে বলেন, আসামী হত্যা করার উদ্দেশ্য পাকবাহিনীর দালাল হিসেবে শহীদুল্লাহ কায়সারকে অপহরণ করেছে।' অথচ শাস্তি হিসেবে তাকে মাত্র সাত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং দশহাজার টাকা জরিমানা অনাদায়ে আরও এক বছরের কারাবাসের দণ্ড দেওয়া হয়

এ, বি, এম, খালেক মজুমদার এখন জামাতের একজন কেন্দ্রীয় নেতা ও ধনী ব্যবসায়ী। একজন 'বিশিষ্ট আলেম' হিসেবেও পরিচিত, জামাতের বিভিন্ন সভায় বক্তৃতা দিয়ে বেড়ান। সম্প্রতি তিনি তার কারাবাসের দিনগুলি নিয়ে 'শিকলপরা দিনগুলো' নামে লাল মলাটের একটি বই বের করেছেন। বইটির পাতায় পাতায় মুক্তিযোদ্ধা ও শহীদুল্লাহ কায়সারের পরিবারবর্গের প্রতি তার উষ্মা ও অস্ফালন

লক্ষ্য করার মত। অক্টোবর ১৯৮৫ তে প্রকাশিত এই বইয়ের দুয়েকটি অংশ উদ্ধৃত করা হল '...যখন ১৬ই ডিসেম্বর তাদের (পাক বাহিনী) আত্মগ্লানির ঘোষণা শোনা গেল তখন সকলেই বিস্ময় বিমূঢ়। ...ওখানে (ঢাকা জামাত অফিস) গিয়ে বৃত্তান্ত শুনে হতাশায় ছেয়ে গেল সারা মন। শিউরে উঠল প্রতিটি লোমকূপ।

'দিনের শেষে নেমে এল রাতের অন্ধকার। আমাদের ভাগ্যাকাশ থেকে বিদায় নিল সৌভাগ্যের শুকতারা। কয়েকদিন ধরে চলে আসা নিষ্প্রদীপ মহড়ার রুটিন বাতিল হল। জ্বলে উঠল শহরে বিজলী বাতি।'

ওই রাতে 'আল্লাহতায়ালার কুদরত ও রহস্যের কাছে 'মূর্খ'দের আত্মসমর্পণের কথা জানিয়ে' খালেক মজুমদারের প্রার্থনার অংশবিশেষ—'হে খোদা হে মহামহিম আমাদের ও আমাদের জাতির মধ্যে উদ্ভূত ভুল বুঝা বুঝির নিরসন করে দাও।... খোদাদ্রোহীদের উপর আমাদেরকে বিজয় বখশিষ কর।'

আত্মগোপন অবস্থা থেকে ধরা পড়া এবং জেলে অবস্থান সম্পর্কে লিখেছেন—'খ্যাতনামা না হলেও এবার আমার অখ্যাত ও কুখ্যাতপনাই আমাকে বিখ্যাত করে করে তুলেছে।'

জেলখানায় তার প্রর্থনা—'তোমার শত্রুদের (মুক্তিযোদ্ধা) সাথে খোদাদ্রোহী-দের সাথে পাঞ্জা লরতে লড়তে তারা (আল বদর) খুব ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। তোমার অপরূপ বাগিচার নির্মল সরোবরে তাদের রক্ত-রঞ্জিত দেহ গোসল দিয়ে বিশ্রাম নেবার সুযোগ দাও। সংখ্যা-সল্পতার পরওয়াতো তারা করেনি।'

মুক্তিকামী জনতার বিজয় সম্পর্কে—'হে আহকামুল হাকেমিন। দেশের এ বিপর্যয়ে অনেকেই ভুল করবে—এ ভুল থেকে মানুষদেরকে তুমি বাঁচিয়ে রেখো। ওদের সমূহ বিজয়ে কারো মনে যেন ওদের ন্যায় পরায়ণতা ও সঠিকতার ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না করে।'

৭২ এর ২৯ ফেব্রুয়ারী ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দী আল বদররা জেল ভেঙ্গে পালাতে চেষ্টা করলে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে কয়েকজন আল বদর নিহত হয়। এদের প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—'দেশবাসী জানতে পারলনা তাদের শাহাদতের প্রকৃত কারণ। তারাও দেখে যেতে পারেনি ভুল উপলব্ধি করার পর তাদের প্রতি জাতির অবনত মস্তকের শ্রদ্ধার দৃষ্টি ও মিনতি ভরা আহ্বান—'তোমরা বেরিয়ে এসো—শিকল টুটে ফেলো।আমরাই ভুল করছি। জাতির ভাগ্য নির্মাণের কাজে সব শক্তি নিয়োগ করো। তোমরাই আমাদের ভবিষ্যত।'

১৬ ডিসেম্বরের পর পত্র পত্রিকায় রাজাকার-আল বদরের নৃশংসতার বর্ণনা প্রসঙ্গে লেখা হয়েছে—'সারা দেশে যখন আল বদর—রেজাকারদের বিরুদ্ধে পরিকল্পিত উপায়ে বিষোদগার ছড়াচ্ছিল এ দেশের সংবাদপত্রসহ সব প্রচার যন্ত্রগুলো...১

স্বাধীনতাযুদ্ধকে 'একাত্তরের গণ্ডগোল; 'একাত্তরের বিপর্যয়; মুক্তিযুদ্ধাদের 'খোদাদ্রোহী' রাজাকার আল বদরেরা 'মর্দ্দে মুমিন' ইত্যাদি আখ্যায় অভিহিত করে এই বইটি জুড়ে যেভাবে শহীদুল্লাহ কায়সারের পরিবারের সদস্যসহ মুক্তি-যোদ্ধা ও স্বাধীনতাকামী জনতা সম্পর্কে জঘন্য কুৎসা রটনা করা হয়েছে, তা একা-ত্তরের গণহত্যায় নিহত অমর শহীদদের তাদেরই খুনী দালালরা আজও কি চোখে দেখে তার অনেক দৃষ্টান্তের একটি হতে পারে।

ধরা পড়ার পর খালেক মজুমদারের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, শুধুমাত্র ঢাকার বুদ্ধিজীবী নিধন অভিযানেই বদর বাহিনীর পাঁচশত ঘাতক তৎপর ছিল। অভিযানের পরিকল্পনা প্রণয়ণকারী চৌদ্দজনের নাম তিনি সুনির্দিষ্ট ভাবে উল্লেখ করেন।

এদেরকে আটক করতে পারলেই হত্যাযজ্ঞের সমস্ত ঘটনা জানা যাবে বলে তিনি তাঁর জবানবন্দীতে জানান। এদের মধ্যে একজনকে তিনি বুদ্ধিজীবী হত্যা-কাণ্ডের 'অপারেশন ইনচার্জ' বলে উল্লেখ করেন। অপারেশন ইনচার্জের' সাথে তাঁর শেষ কখন দেখা হয়েছে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি ১৪ ডিসেম্বর সকাল বেলা বলে উল্লেখ করেন। উল্লেখ্য ১৪ ডিসেম্বর ঐ সময় শহরে কার্ফু বলবৎ ছিল। তিনি আরও জানান ঐদিন সকালে 'অপারেশন ইনচার্জ' এবং জামাতে ইসলামীর ঢাকা শহর প্রধান গোলাম সারওয়ার জামাত অফিসে আসেন এবং অফিসে রক্ষিত সমস্ত টাকা পয়সা নিয়ে যান। এরপর তাঁদের সাথে তাঁর আর দেখা হয়নি বলে তিনি জানান।

বহির্বিশ্বে জামাতের দুটি শক্ত ঘাঁটি হচ্ছে যুক্তরাজ্য এবং সৌদি আরব। খুনী আল বদরের যারা ১৬ ডিসেম্বরের আগে পরে পালাতে সক্ষম হয়েছিল তারা এই দুই জায়গা থেকেই আজও স্বাধীনতা বিরোধী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। যুক্ত-রাজ্যের ইস্ট লণ্ডন মসজিদ, বার্মিংহাম সিটি মসজিদ, ম্যানচেস্টার মসজিদসহ বিভিন্ন মসজিদে পর্যন্ত ইমামের চাকুরী নিয়ে বিশেষতঃ সিলেট জেলার খুনী আল বদররা জামাতী সংগঠন 'দাওয়াতুল ইসলামের' মাধ্যমে তাদের তৎপরতা চালিয়ে

---

১. শিকলপরা দিনগুলো, এ বি, এম, এ, খালেক মজুমদার, প্রকাশক সাজ্জাদ খালেক মুরাদ, ১৮১, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা-২, কর্তৃক আধুনিক প্রেস, ১৫, শ্রীসদাস লেন ঢাকা-১ থেকে মুদ্রিত প্রথম প্রকাশ-অক্টোবর :৯৮৫।

যাচ্ছে। এই দুর্জারগায় অবস্থা- নরত আল বদর খুনীদের পরিচয় দেবার জন্য দুটি দৃষ্টান্ত দেয়া হবে।

বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপরেশন ইনচার্জ মঈন্‌দ্দিন এখন লণ্ডনে জামাত নিয়ন্ত্রিত 'সপ্তাহিক দাওয়াত' পত্রিকার বিশেষ সম্পাদক। সাংগঠনিক কাজে তিনি প্রায়ই বাংলাদেশ সফর করেন।

স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ দিকে চৌধুরী মঈনুদ্দিনসহ বেশ কয়েকজন ঘাতককে দৈনিক পুর্বদেশ স্টাফ রিপোর্টারর চাকরী দিয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনার অন্যতম কেন্দ্র অবজার্ভার ভবনে নিয়ে আসা হয়। এখান থেকে চৌধুরী মঈনুদ্দিন 'ইনটেলেকচুয়াল অপারেশন' অর্থাৎ বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ, নির্যাতন এবং হত্যায় নিয়োজিত আল বদরের পরিচালনা করেন। এছাড়া বুদ্ধিজীবী হত্যার নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলী, ব্রিগেডিয়ার বশির আহমদ প্রমুখের কাছে বুদ্ধিজীবীদের নাম ঠিকানা সংগ্রহ করে দেয়াও ছিল তার দায়িত্ব।

সৌদি আরবে পুনর্বাসিত আল বদরের দৃষ্টান্ত দেবার জন্য এখানে উপস্থাপন করা হবে আল বদর হাই কমাণ্ডের সদস্য আশরাফুজ্জানের কথা। এই আশরাফুজ্জামান খান ছিল বদর বাহিনীর প্রধান ঘাতক। স্বহস্তে গুলি করে সে মীরপুর গোরস্তানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন শিক্ষককে হত্যা করে বলে সুনিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

যে গাড়ীতে করে হতভাগ্য অধ্যাপকদের গোরস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তার চালক মফিজুদ্দিন নামে জনৈক আল বদর আশরাফুজ্জামানকে বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের 'চীপ এক্সিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ) হিসেবে উল্লেখ করেছিল।

১৬ ডিসেম্বরের পর ৩৫০, নাখালপাড়ায় আশরাফুজ্জামান যে বাড়ীতে থাকত সেখান থেকে তার ব্যক্তিগত ডায়েরীটি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। ডায়েরীর দুটি পৃষ্টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯ জন বিশিষ্ট শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের চিকিৎসক ডাঃ গোলাম মুর্তজার নাম এবং বিশ্ববিদ্যালয় কোয়াটারের কত নম্বর বাড়ীতে তাঁরা থাকেন তা লেখা ছিল। এই ২০ জনের মধ্যে মোট ৮ জন ১৪ ডিসেম্বর নিখোজ হন। এরা হচ্ছেন—মুনীর চৌধুরী (বাংলা). ডঃ আবুল খায়ের (ইতিহাস), গিয়াসউদ্দিন আহমেদ (ইতিহাস), রশিদুল হাসান (ইংরেজী , ডঃ ফয়জুল মহী (শিক্ষাগবেষণা) এবং ডঃ মুর্তজা (চিকিৎসক)।

ড্রাইভার মফিজুদ্দিনের স্বীকারোক্তি থেকে জানা যায়, আশরাফুজ্জামান খান এদের নিজ হাতে গুলি করে মেরেছিল। মফিজুদ্দিনের স্বীকারোক্তির

ভিত্তিতে রায়ের বাজারে বিল এবং মিরপুরের শিয়ালবাড়ী বধ্যভুমি থেকে অধ্যাপকদের গলিত বিকৃত মৃতদেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিল। ডায়েরীতে উল্লেখিত অবশিষ্ট অধ্যপকদেরও আর কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ডায়েরীতে এছাড়াও যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হচ্ছেন—ওয়াকিল আহাম্মদ (বাংলা), ডঃ নীলিমা ইব্রাহীম (বাংলা), ডঃ লতিফ (শিক্ষা গবেষণা), ডঃ মনিরুজ্জামান (ভুগোল) ডঃ কে, এম, সাদউদ্দীন (সমাজ তত্ত্ব), এ, এম, এম, শহীদুল্লাহ (গণিত), ডঃ সিরাজুল ইসলাম (ইসলামের ইতিহাস), ডঃ আখতার আহম্মদ (শিক্ষা), জহিরুল হক (মনোবিজ্ঞান), আহসানুল হক (ইংরেজী), সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ইংরেজী) এবং কবীর চৌধুরী।

ডায়েরীরর আরেকটি পৃষ্ঠায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ষোলজন দালাল অধ্যাপকের নাম। এছাড়াও ছিল বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপারেশন ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দীন, আল বদর কেন্দ্রীয় কমাণ্ডের সদস্য শওকত ইমরান ও ঢাকার বদর বাহিনীর প্রধান শাবমুল হকের নাম।

ডায়েরীতে শহীদ বুদ্ধিজীবী ছাড়াও বহু বাঙ্গালীর নাম ঠিকানা লেখা ছিল। এ'দের সবাই বদর বাহিনীর হাতে নিহত হয়েছিলেন। এক টুকরো কাগজে তৎকালীন পাকিস্তান জুট বোর্ডের ফাইন্যান্স মেম্বার আবদুল খালেকের নাম, পিতার নাম, ঢাকার ঠিকান ও স্থায়ী ঠিকানা লেখা ছিল। ৭১ এর ৯ ডিসেম্বর আবদুল খালেককে বদর বাহিনী অফিস থেকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। তাঁর মুক্তিপণ হিসেবে বদর বাহিনী ১০ হাজার টাকা দাবী করেছিল। আবদুল খালেকের কাছ থেকে মুক্তিপনে টাকা দিয়ে দেবার অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি লিখিয়ে নিয়ে বদর বাহিনী তাঁর বাড়িতে যায়। আবদুল খালেকের স্ত্রী সে সময় মাত্র ৪৮০ টাকা দিতে পেরেছিলেন। বাকী টাকা তিনি পরে দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বদর বাহিনীর লোকদের কাছে আবদুল খালেককে ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু আবদুল খালেক আর ফিরে আসে নি।

আশরাফুজ্জামান কয়েকজন সাংবাদিক হত্যার সাথেও জড়িত ছিল। দৈনিক পুর্বদেশের শিফ্‌ট ইনচার্জ ও সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক আ, ন, ম, গোলাম মোস্তাফাকেও আশরাফুজ্জামন ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

আশরাফুজ্জামান খান ছিল ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটির একজন সদস্য স্বাধীনতার পর সে পাকিস্তানে যায়। বর্তমানে এই ঘাতক রেডিও পাকিস্তানে কর্মরত রয়েছে।

মানুষখেকো বাঘের মত রক্ত পিপাসু খুনীদের রক্তের পিপাসা যায় না। ১৯৮৫ সালের জুলাইয়ে ঢাকায় অনুষ্ঠিত শিবিরের মাঝারি শ্রেণীর নেতাদের এক প্রশিক্ষণ

কর্মসূচীর প্রশ্নপত্রে ইসলাম ধর্মের জামাতী ও শিবির সংস্করণের পরিচয় পাওয়া যায়। এ প্রশ্নপত্রের প্রশ্নের একটি ছিল এরকম, 'ইসলামের সবচেয়ে বড় ফরজ কি? উত্তরে কেউ কেউ লিখেছেন ঈমান আনা, কেউ নামাজ পড়া, কেউ বা আবার আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস করা ইত্যাদি। কিন্তু এসমস্ত উত্তরের সবই কেটে দেওয়া হয়েছে। শুধু যারা লিখেছেন 'ইসলামী আন্দোলন করা', তাদের উত্তরই সঠিক বলে টিক চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

জামাতে ইসলামী ও ছাত্র শিবিরের ইসলামী আন্দোলনের স্বরূপ সারা বিশ্ব দেখেছে ১৯৭১ সালে। সভ্য মানুষের ইতিহাসের সবচেয়ে কালো অধ্যায় হয়ে রয়েছে তা। ইসলামী বা অনৈসলামী যাই হোক বিরোধী শক্তিকে কাফের ও ইসলামী আন্দোলনের শত্রু বলে আখ্যায়িতকরে দয়ামায়াহীন ভাবে অবিশ্বাস্য ধরনের নির্যাতন চালিয়ে হত্যা করাই হল এই আন্দোলনের স্বরূপ। '৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে এই আল বদররা ইতিমধ্যে বহুবার তাদের মজ্জাগত নৃশংসতার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছে। বিরোধী ছাত্র সংগঠনের সদস্যের পায়ের রগ কেটে ছেড়ে দিয়ে হত্যা করা, ছাত্রাবাস ঘেরাও করে পিটিয়ে হত্যা ইত্যাদি নানা প্রকারকার্যকলাপ ৭১ এর কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই 'আন্দোলনের' প্রস্তুতি হিসেবে তারা আবার গড়ে তুলেছে আল বদর বাহিনীর অনুরূপ সশস্ত্র জল্লাদবাহিনী। সাপ্তাহিক বিচিত্রার (১৪ বর্ষ ৪২ সংখ্যা, ১৪ মার্চ ৮৬, পৃ-২৩) প্রতিবেদন থেকে জানা যায় ১৯৭৫ সালের পরে কোন এক সময়ে গোলাম আজমের নেতৃত্বে এবং অন্যান্য জামাতী নেতার তত্ত্বাবধানে এই আর্মস ক্যাডার গঠিত হয়। এর নামকরণ করা হয়েছে 'মোমেনীন সালেহীন।' এই সালেহীনদেরদের নাকি ট্রেনিং দেওয়া হয় ঝিনাইদহ ও নাটোর এলাকায়। নড়াইলের আলবদর কমাণ্ডার সোলায়মান নামে এক জামাতী পরিচালনা করেন এই ট্রেনিং। ইতিপূর্বে এই সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের দুটি দল মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে গিয়েছিল বিশেষ ট্রেনিং গ্রহণের জন্য। ৭১ সালের আল বদর বাহীনর সংস্করণ হচ্ছে এই মোমেনীন সালেহীন।

যশোরের 'মোমেনীন সালেহীন' সংগঠকরা একাত্তরে কি করেছিল তার পরিচয় দেবার জন্য এখানে ১৫ জানুয়ারী ১৯৭২ তারিখে দৈনিক আজাদে প্রকাশিত অধ্যাপিকা হামিদা রহমান লিখিত 'নড়াইল : হত্যাযজ্ঞের আরেকটি বধ্যভূমি' শীর্ষক নিবন্ধের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করে এই অধ্যায়ের ইতি টানা হবে— ৭১ সালে জল্লাদ এহিয়া খান তার পশু সেনাবাহিনী লেলিয়ে দিয়ে কি অসীম আত্যাচারই না করেছে এই নড়াইলের

অধিবাসিদের প্রতি—ইতিহাসের স্বাক্ষর রাখার উপযোগী। ২৫শে মার্চের ভয়াবহ রাত্রির পর থেকে যশোর শহরের অনেক লোক প্রাণভয়ে পালিয়ে নড়াইল সদর এবং তার পার্শ্ববর্তী স্থানে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের অনেকেই জল্লাদ এহিয়ার সেনা বাহিনীর হাতে মার খেয়ে প্রাণ হারিয়েছে। ফিরে এসেছে খুব কম সংখ্যক লোক।

'নড়াইলের পথে ভায়না একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। সেই স্থানে নাম করা লোক আলী আকবর। গত ৮ই এপ্রিল দস্যু বাহিনী এই গ্রামটি ঘিরে ফেলে মুক্তি বাহিনীর আশ্রয়স্থল হিসেবে। মাছ যেমন করে জালে ধরে তেমনি করে এই ভায়না গ্রাম ঘিরে ফেলে গ্রামের সমস্ত লোকদের নিয়ে মাঠে একত্রিত করে। তারপর বৃদ্ধা, মহিলা, শিশুদের কাতার করে দাঁড় করান হয় তার মধ্যে ২৫ বৎসর থেকে ৩০ বৎসরের মধ্যের বয়স্ক মানুষের আলাদা কাতার করা হয়। সেখানে এক সঙ্গে ৪৫ জন মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। আলি আকবরের তিন ভাইকে একত্রে গুলি করে মারা হয়। আলী আকবর পি, আই, এ চাকুরী করত। কোন মতে শুয়ে সে প্রাণ রক্ষা করে। কিন্তু আর কেউ সে যাত্রায় রক্ষা পায়নি। নাড়ানোর খেয়াঘাট জল্লাদ বাহিনীর হত্যাযজ্ঞের বধ্যভূমি ছিল। সেখানে নিয়ে প্রতিদিন ২০ থেকে ৩০ জন মানুষকে পিছনে হাত বেধে হত্যা করা হত আর তাদের লাশ নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হত। এছাড়া বাঙ্গালী হত্যার জন্য একটি কসাইখানাও তৈরী করা হয়েছিল। এই কসাইখানায় মানিক, ওমর ও আশরাফ এ তিনজন লোককে যশোর ক্যান্টনমেন্টে পাঠিয়ে মানুষ জবাই করার ট্রেনিং দিয়ে আনা হয়েছিল প্রতিদিন এরা ৭ থেকে ১২ জন লোক জবাই করত। প্রতিটি লোককে জবাই করার জন্য মাথা পিছু ১০ টাকা রেট ছিল।

'একদিন সর্বমোট ৫৬ জন লোককে এই কসাই খানায় জবাই করা হয়েছিল। ১৫ই এপ্রিল থেকে ১০ই ডিসেম্বর পর্যন্ত এখানে এই জবাই এর কাজ সংঘটিত হয়েছে। এখানের হিসেবে পাওয়া গিয়েছে যে, ২৭২৩ জন লোককে এই জবাই খানায় হত্যা করা হয়েছিল। অচেনা লোকজন ধরে নিয়ে এসে প্রথমে ওদের মার ধর করা হত, পরে কানকাটা হত, তারপর চোখ উপড়ে ফেলা হত। সবশেষে এদের জবাই করা হত।... এখানকার শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান ছিলেন মওলানা সোলায়মান। ডাঃ আবুল হোসেন ও আবদুর রসীদ মোক্তার—এই তিন জন মিলে শান্তি কমিটির নাম করে হত্যাযজ্ঞের সহায়তা করতো। ওমর গর্ব করে বলত, "আমি দিনে হই ওমর আর রাতে হই সীমার। আমার এ খঞ্জর দেখছনা, এতে বধ করি শত কাফের।"

৭

পুনর্বাসিত দালাল বুদ্ধিজীবী

৭১-এর স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় বর্বর পাকবাহিনীর আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিল এদেশের ছাত্র-বুদ্ধিজীবী সমাজ। ২৫ মার্চের নারকীয় হত্যাকাণ্ডের সূচনা হয়েছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে এবং হত্যাযজ্ঞের প্রথম দিনেই শহীদ হয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথিতযশা অধ্যাপকবৃন্দ। বুদ্ধিজীবীদের উপর উৎপীড়ন, নিগ্রহ যুদ্ধের নয় মাস অব্যাহত ছিল এবং হানাদার বাহিনীর আত্মসমর্পণের প্রাক্কালে আল বদরদের সহয়তায় ব্যাপক আকারে বুদ্ধিজীবী হত্যা সম্পন্ন হয়।

এই পরিস্থিতিতে বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ সীমান্ত অতিক্রম করে পশ্চিম বঙ্গ ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলে চলে যান এবং যুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অংশ নেন। অপর একটি অংশ দেশের অভ্যান্তরে পালিয়ে বেড়ান এবং যাদের পক্ষে শহর ছেড়ে চলে যাওয়া সম্ভব ছিল না তাঁরা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় দিনযাপন করেন।

গণহত্যা আরম্ভ হওরার পর পশ্চিমের প্রচারযন্ত্রসমুহে যখন ব্যাপক আকারে বুদ্ধিজীবী হত্যা ও উৎপীড়নের বিবরণ প্রকাশ করতে থাকে, তখন সামরিক কর্তৃপক্ষ তাদের কার্যকলাপের সমর্থনে, আওয়ামীলীগ সহ স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী এবং মিত্রদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতি ও সমর্থন আদায়ের জন্য তৎপর হয়। সংবাদপত্রে প্রকাশিত এই সমস্ত বিবৃতি প্রদানে কিম্বা বেতার টেলিভিশনে গঠিত বিভিন্ন কথিকায় বুদ্ধিজীবীদের একটি অংশ স্বেচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অংশগ্রহণ করেন।

একথা অস্বীকার করা যাবে না যে এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সচেতন

ভাবে পাকবাহিনীর গণহত্যাকে সমর্থন করেছিলেন। এই সমস্ত বুদ্ধিজীবীর নৈতিকতা ও বিবেচনাবোধ কোন পর্যায়ে নেমেছিল তা একটি উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যেতে পারে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞান বিভাগের তৎকালীন অধ্যাপক আহমদ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার অঙ্গনে দাঁড়িয়ে জনসমক্ষে ঘোষণা দিয়েছিলেন, পাকিস্তানী বাহিনী যদি বাঙ্গালী নারীদের শ্লীলতাহানী করে তবে তাদের কোন পাপ হবে না, কারণ তারা ইসলাম রক্ষার জন্য 'জেহাদে' নিয়োজিত। তাদের জন্য এই কাজ 'মুতা' বিবাহের পর্যায়ে পড়ে।১ তখন এবং এখনও ইসলামের সেবক হিসেবে নিজেদের পরিচয়দানকারী দালাল শিক্ষকদের কেউই সেসময় এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করেনি।

দালাল বুদ্ধিজীবীদের নেতৃস্থানীয় কয়েকজন

দালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের মধ্যে মুখ্য ব্যাক্তিটি ছিলেন ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে তিনি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩০ জন বাঙ্গালী অধ্যাপক এবং ২জন বাঙ্গালী অফিসারের একটি তালিকা তৈরী করে সামরিক হেডকোয়ার্টারে দাখিল করেন। এই তালিকায় আধ্যাপকদের ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করে চার ধরনের শাস্তি ১। হত্যা ২। কারাদণ্ড ৩। চাকুরী থেকে বহিস্কার এবং ৪। ধরে নিয়ে গিয়ে প্রহার করার সুপারিশ করা হয়। দণ্ড প্রাপ্ত অধ্যাপকদের অনেকেই আল বদর বাহিনীর হাতে নিহত অথবা নির্যাতিত হন।

সাজ্জাদ হোসেনের প্রস্তুতকৃত এই তালিকা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড তথ্যানুসন্ধান কমিটির হস্তগত হলেও এর কোন সুষ্ঠু বিচার হয় নি। সাধারণ ক্ষমায় মুক্তি পাবার পর। সাজ্জাদ হোসেন সৌদি আরবে চলে যান। এখন তিনি সেখানকার কিং আব্দুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। (দৈনিক আজাদ ৭/২/৭২)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে তালিকা প্রস্তুত সমাপ্ত হবার পর প্রাদেশিক গভর্ণর টিক্কা খানের নির্দেশে সাজ্জাদ হোসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এবং প্রদেশের বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্বাসিত দালাল শিক্ষকদের মধ্যে আরবী বিভাগের ডঃ মুস্তাফিজুর রহমান, বাংলার ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ, মনোবিজ্ঞানের ডঃ মীর ফকরুজ্জামান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের চেয়ারম্যান আব্দুল বারী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে কয়েকজন দালাল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকের একাত্তরের

১. 'দৈনিক গণকণ্ঠ'', ২৬ এপ্রিল '৭২

কার্যকলাপের সামান্য বর্ণনা দেয়া হল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর ডঃ মীর ফখরুজ্জামান ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শান্তি কমিটির সাধারণ সম্পাদক। বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের নায়ক জেনারেল রাও ফরমান আলীর মেয়ে তাঁর বিভাগের ছাত্রী ছিল। সেই সূত্রে রাও ফরমান আলীর সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয় এবং শেষ পর্যন্ত তিনি তাঁর মুখ্য সহচর হিসেবে কাজ করেন ডঃ গোবিন্দ চন্দ্র দেব নিহত হবার পর ফজলুল হক হলের প্রভোস্ট হওয়া সত্ত্বেও একই সাথে তাঁকে জগন্নাথ হলেরও প্রভোস্ট করা হয়। তিনি জগন্নাথ হলের নাম পরিবর্তন করে এর মুসলিম নামকরণের প্রস্তাবও করেছিলেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের শেষ লগ্নে বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর প্রবেশের খবরে আনন্দিত হয়ে তিনি গরু জবাই করে কাঙ্গালী ভোজের আয়োজন করেছিলেন। গভর্ণর ডাঃ আব্দুল মুত্তালিব মলিকের প্রতিরক্ষা তহবিলে অর্থ সংগ্রহের জন্য শিক্ষকদের কাছে বাধ্যতামূলক চাঁদা আদায়ের ব্যাপারে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলাদেশপন্থী শিক্ষক এবং ফজলুল হক হলের নেতৃস্থানীয় ছাত্রদের নামের তালিকা তিনি জেনারেল রাও ফরমান আলীর কাছে সরবরাহ করেছিলেন বলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের অভিযোগ ছিল। মনোবিজ্ঞান বিভাগের বাংলাদেশমনা যে সমস্ত শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে বাড়ি চলে গিয়েছিলেন, বুদ্ধিজীবী নিধনযজ্ঞ শুরু হবার পূর্ব মুহূর্তে তিনি তাঁদের টেলিগ্রাম করে ঢাকায় নিয়ে আসেন। এরপর এ' সমস্ত শিক্ষকের বাড়িতে আল বদর বাহিনী হানা দিয়েছিল, কিন্তু ব্যাপারটি আঁচ করতে পেরে অন্যত্র পালিয়ে যান বলে তাঁরা রক্ষা পেয়ে যান। (দৈনিক আজাদ ২৯/১/৭২)

গণিত বিভাগের অধ্যাপক এ, এফ, এম আব্দুর রহমান আর একজন উল্লেখযোগ্য পুনর্বাসিত স্বাধীনতা বিরোধী। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের গোড়া থেকেই তিনি এর বিরোধীতা করে এসেছেন। ১৯৬৭ ৬৮ সালে যে ৫৩ জন বুদ্ধিজীবী পত্রপত্রিকায় রবীন্দ্র বিরোধী বিবৃতি দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে আবদুর রহানের নাম প্রথম দু'জনের মধ্যে ছিল। ৬৯-৭০ সালের গণ অভ্যুত্থানের সময়ও আব্দুর রহমান পাক সামরিক জান্তার পক্ষে ছিলেন।

৭১ এর ২৫ মার্চের পর স্বাভাবিক ভাবেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হয়ে যায়। সে সময় তৎকালীন সামরিক আইন প্রশাসকের দপ্তর থেকে 'স্বাভাবিক অবস্থা' ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

খোলার যে উদ্যোগ নেয়া হয়, এ, এফ আবদুর রহমান ছিলেন তার পুরোধা। তিনি কিছু দালাল শিক্ষককে নিয়ে রাও ফরমান আলীর সঙ্গে দেখা করে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে বলে আশ্বস দেন। রাও ফরমান আলী এ' প্রসঙ্গে বলেছিলেন শতকরা ২০ জন ছাত্রছাত্রী উপস্থিত থাকলেই বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হবে। ফরমান আলীর এই কথা আবদুররহমানই সদম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে উপস্থিত ছাত্রছাত্রীরদের জানিয়েছিলেন। সে সময়ে পাক সামরিক বাহিনী গণহত্যার পক্ষে ছাত্রছাত্রীর উদ্দেশ্য করে তিনি যে সমস্ত মন্তব্য করেন তাও উল্লেখ করার মত। এ' প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেয়া যায়। জগনাথ হলে পাকবাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কথা সবারই জানা। এ' বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ছিল, '২৫শের রাতে জগনাথ হল থেকে ছাত্ররা পাকিস্তানী বাহিনীর ওপর রকেট বোমা ছুঁড়েছিল বলেই তারা হল আক্রমণ করেছিল, না হলে করত না।'

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত সন্দেহভাজনদের অন্যতম ছিলেন তিনি ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক গিয়াসউদ্দীনের হত্যার সাথে জড়িত বলে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়ে ছিল।

স্বাধীনতার পর অন্যান্য দালাল শিক্ষকদের সাথে তাকেও ছুটি দেয়া হয়। কিন্তু ১৯৭২ সালের ২৮ মার্চ ছুটি ভোগরত অবস্থাতেই তিনি ক্লাস নিতে আসেন। বিক্ষুব্ধ ছাত্রছাত্রীরা এ' সময় অনির্দিষ্টকালের জন্য ক্লাসবর্জন শুরু করে, কিন্তু আবদুর রহমানে পুনর্বাসনকে তাঁরা ঠেকাতে পারেন নি। (দৈনিক সংবাদ, ৩০/৩/৭২)

ফর্মেসী বিভাগের প্রফেসর ইমেরিটাস আবদুল জব্বারের বিরুদ্ধেও বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ডের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ ছিল। বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার অপারেশনাল ইনচার্জ চৌধুরী মঈনুদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে তাঁর কক্ষেই দালাল শিক্ষকদের সাথে রুদ্ধদ্বার আলোচনা করত। পাক সামরিক অফিসাররাও নিয়মিত তাঁর কাছে যাতায়াত করত বলে তখনকার পত্র পত্রিকায় উলেখ করা হয়েছে।

শহীদ মিনার ছিল তাঁর ভাষায় পুজার বেদী। পাকিস্তানী সামরিক বাহিনীকে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শহীদ মিনার ভেঙ্গে ফেলার পরামর্শতিনিই দিয়েছিলেন। দখলদারী আমলে ছাত্রদের কাছে শহীদ বুদ্ধিজীবীদের হত্যাকাণ্ডকে তিনি 'দুর্ঘটনা' হিসেবে অভিহিত করতেন। মুক্তিযোদ্ধারা ছিল তাঁর ভাষায় 'পাকিস্তানের জারজ সন্তান।' (দৈনিক গণকণ্ঠ, ২০/৪/৭২)

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছাড়াও বিভিন্ন কলেজ-স্কুলের একশ্রেণীর শিক্ষকও পাক-

বাহিনীর দালালীতে তৎপর ছিলেন। তেজগা কলেজের অধ্যক্ষ তোফায়েল আহমদ চৌধুরী এ ধরণের স্বাধীনতাবিরোধী শিক্ষকদের একটি দৃষ্টান্ত হতে পারেন। স্বাধীনতাযুদ্ধের শুরুতে তিনি ঐ কলেজের নৈশ বিভাগের উপধ্যক্ষ পদে বহাল ছিলেন। তিনি ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সপক্ষীয় শিক্ষক ও ছাত্রদের সম্পর্কে সামরিক কর্তৃপক্ষকে তথ্য সরবরাহ করতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবদুল জব্বার, কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির এ, কিউ, এম শফিকুল ইসলাম, এবং আবুল কাশেমের সঙ্গে একযোগে তিনি রাও ফরমান আলীর সাথে যোগাযোগ রাখতেন। স্বাধীনতার পর তোফায়েল আহমদ চৌধুরীকে কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা একটি সাধারণ সভায় তোফায়েল চৌধুরীর বিরুদ্ধে দালালীর অভিযোগ এনে তার অপসারণের দাবীতে ক্লাস বর্জন শুরু করে। এতে তোফায়েল আহমদ চৌধুরীর কিছু হয়নি, তবে বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী ছাত্রকে পুলিশ গ্রেফতার করে। পরবর্তীতে তোফায়েল আহমদ চৌধুরী কলেজের স্থায়ী অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। (দৈনিক গণকণ্ঠ,—২৬/৪/৭২)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দালাল শিক্ষকদেরকে সময় সুকৌশলে ছাত্র-জনতার রোষানল থেকে বাঁচানো হয়েছিল। ১৬ ডিসেম্বরের পর দালাল শিক্ষকদের তালিকা প্রস্তুত করে এদেরকে বিভিন্ন মেয়াদে ছুটি দেওয়া হয়। এদের মধ্যে কেউ কেউ জেলে ছিলেন। বাদবাকীরা লিখিত দরখাস্ত পাঠিয়ে নিজেদের সুবিধামত সময় পর্যন্ত ছুটি বাড়িয়ে নেন। তারপর, উত্তেজনা থিতিয়ে গেলে সময়সুযোগমত ফিরে আসেন নিজ নিজ কর্মস্থলে।

একশ্রেণীর সাংবাদিকও স্বাধীনতাযুদ্ধের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এদের মধ্যে ইত্তেফাকের খোন্দকার আবদুল হামিদের প্রসঙ্গটি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে লুকিয়ে থাকা খোন্দকার আবদুল হামি গ্রেফতার হবার পর ১১ ফেব্রুয়ারী '৭২ তারিখের পূর্বদেশ পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় 'এ্যালায় কেমুন বুঝতাছেন' শিরোনামের সংবাদটিতে লেখা হয়, 'দালাল খোন্দকার আবদুল হামিদকে গতকাল বৃহস্পতিবার রাত ৯টায় এলিফেন্ট রোড থেকে লালবাগ পুলিশ গ্রেফতার করে। তিনি দৈনিক ইত্তেফাকের সহকারী সম্পাদক হিসেবে গত সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকারের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য বিদেশ গমন করেন। এছাড়া তিনি রেডিও পাকিস্তানের 'ব্রাহ্মণ, ক্ষমা কর' স্পষ্ট ভাষণের লেখক ছিলেন।

৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতি

১৭ মে ৭১ তারিখে সংবাদপত্রে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর নিম্নোক্ত বিবৃতিটি প্রকাশিত হয়।

'নিউইয়র্কের ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সী বলে পরিচিত একটি সংস্থা তাদের ভাষায় 'ঢাকায় বিদ্বজনের ব্যাপক হত্যাকান্ডে' উদ্বেগ প্রকাশ করে যে বিবৃতি দিয়েছেন আমরা তা পাঠ করে হতবাক হয়ে গিয়েছি। আমরা পূর্ব পাকিস্তানের অধ্যাপক, কলেজ শিক্ষক, লেখক, সাংবাদিক ও শিল্পীবৃন্দ আমাদের নিরাপত্তা, কল্যাণ ও ভবিষ্যতের জন্য আইসিইউই'-র উদ্বেগ প্রকাশকে গভীর ভাবে অনুধাবন করছি। যাই হোক, ঘটনার সত্যাসত্য যাচাই না করে, বা কিনা পন্ডিত ব্যক্তিদের প্রথম গুণ বলে বিবেচিত, এরূপ সম্মানিত, বিদ্বান ও সুধী ব্যক্তিরা এমন একটি বিবৃতি প্রকাশ করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। সত্যানুসন্ধানই যাদের জীবনের লক্ষ্য তেমন একটি পেশায় নিয়োজিত ব্যক্তিরাই অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমাদের মহান সঙ্গীরা পন্ডিত ও জ্ঞানান্বেষীর এই মৌল নীতি থেকে বিচ্যুত হয়ে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির অভিযোগকে সম্বল করে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন এবং অভিমত প্রকাশ করেছেন।

আমাদের অনেকেই গুলিবিদ্ধ ও নিহতের তালিকায় তাঁদের নাম দেখতে পেয়ে হতবাক হয়েছেন।

'নেহাত নাচার হয়েই আমাদের জানাতে হচ্ছে আমরা মৃত নই।

'আমাদের পেশাগত কাজের স্বাভাবিক রীতি অনুসারেই আমরা ঢাকা টেলিভিশনের পর্দায় আবির্ভূত হওয়ার সুযোগ নিয়েছি।

'আমাদের মৃত্যুর খবর যে অতিরঞ্জিত এটা জানিয়ে দিয়ে বন্ধু বান্ধব আত্মীয়-স্বজন এবং ছাত্রদের আশ্বস্ত করেছি।

'ঢাকা ও অন্যান্য স্থানে গোলযোগ চলাকালে আমাদের অধিকাংশই মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে নিজ নিজ গ্রামে চলে গিয়েছিলাম, একারণেই হয়তো ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়ে থাকবে। সময় নির্দিষ্ট করে বলার কারণ আছে। কেননা এই সময়টাতেই দেশের প্রতিষ্ঠিত বৈধ সরকারকে অমান্য করার কাজ পুরোদমে চলছিল। নির্বাচনে জনগণের কাছ থেকে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসন আদায়ের ম্যান্ডেট পেয়ে চরমপন্থীরা স্বায়ত্বশাসনের দাবীকে এক তরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে সম্প্রসারিত ও রূপায়িত করার জন্য উঠে পড়ে লেগে গিয়েছিল, যারাই জনতার অর্পিত আস্থার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতায় অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে তাদের উপর দুর্দিন নেমে এসেছিল।

'এই সময়েই' ব্যাপকভাবে শিক্ষার অঙ্গনকে রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধির কাছে অপব্যবহার করা হতে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে ছাত্ররা লেখা পড়া বা খেলাধূলায় ব্যস্ত ছিলনা। তা ছিল বাংলা দেশ মুক্তি ফৌজের প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, তা ছিল মেশিনগান, মর্টার ইত্যকার সমরাস্ত্রের গোপন ঘাঁটি। ফ্যাসীবাদী সন্ত্রাসবাদ ও রাজনৈতিক দলগত অসহিষ্ণুতার এই শ্বাসরুদ্ধকার পরিবেশ এড়ানোর জন্য আমাদের অধিকাংশই আমাদের গ্রামগুলোতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাকিস্তানকে খন্ড বিখন্ড করার সশস্ত্র প্রয়াস নস্যাৎ এবং প্রদেশে আইন শৃংখলা পুনঃপ্রতিষ্ঠার আগে কেউ শহরে ফিরে আসেননি।

'অবশ্য আমাদের কিছু সহকর্মী বাড়িতে না ফিরে সীমান্ত পার হয়ে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। ভারতীয় দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকার ২৫শে এপ্রিলের খবরে দেখা যাচ্ছে যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাদের পনের জনকে তাদের স্টাফ হিসেবে নেয়ার পরিকল্পনা নিয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানী বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের আরো শিক্ষকদের তাদের দিকে আকৃষ্ট করার জন্য ভারত সরকারের কাছে বিপুল অংকের বরাদ্দ দাবী করেছে।

'পাকিস্তানী শাসন কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে আমাদের নিজস্ব অভাব-অভিযোগ রয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের যেটা প্রাপ্য সেটা না পেয়ে আমরা অসুখী। আমাদের এই অসন্তোষ আমরা প্রকাশ করেছি একই রাষ্ট্র কাঠামোর আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ব্যাপক স্বায়ত্ব শাসনের পক্ষে ভোট দিয়ে।

'কিন্তু আওয়ামী লীগ চরমপন্থীরা এই সরল-সহজ আইন সঙ্গত দাবীকে এক তরফা স্বাধীনতা ঘোষণার দাবীতে রূপান্তরিত করায় আমরা মর্মাহত হয়েছি। আমরা কখনো এটা চাইনি, ফলে যা ঘটেছে তাতে আমরা হতাশ ও দুঃখিত হয়েছি। বাঙ্গালী হিন্দু, বিশেষ করে কোলকাতার মাড়োয়াড়ীদের আধিপত্য ও শোষণ এড়ানোর জন্যই আমরা বাংলার মুসলমানেরা প্রথমে ১৯০৫ সালে বৃটিশ রাজত্বকালে আমাদের পৃথক পূর্ব বাংলা প্রদেশ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেই এবং আবার ১৯৪৭ সালে ভোটের মাধ্যমেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের অন্যান্য প্রদেশের মুসলিম ভাইদের সাথে যুক্ত হওয়ার সচেতন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। উক্ত সিদ্ধান্তে অনুতপ্ত হওয়ার আমাদের কোন কারণ নেই।

'পাকিস্তানের সংখ্যাগুরু প্রদেশ হিসেবে সারা পাকিস্তানকে শাসন করার অধিকার আমাদের আছে। আর সেটা আমাদের আয়ত্বের মধ্যেই এসে গিয়েছিল। ঠিক তখনই চরমপন্থীদের দুরাশায় পেয়ে বসল এবং

তারা জাতীয় অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলল। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া দেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন দিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া আলোচনা কালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগকে সংখ্যাগুরু দল হিসেবে অভিনন্দন জানিয়েছেন। কিন্তু উল্টাটি ঘটে গেল এবং নেমে এল জাতীয় দুর্যোগ।

'কিন্তু আমাদের ভবিষৎ সম্পর্কে আশাবাদী হওয়ার সঙ্গত কারণ রয়েছে। আমরা পূর্ণাঙ্গ গণতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত এবং বর্তমান সরকার অবস্থা অনুকূল হওয়ার সাথে সাথে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া চালু করার ইচ্ছা আবার ঘোষণা করেছেন। এমতাবস্থায় বিশ্বের অন্যান্য স্থানের আমাদের বন্ধু একাডেমিসিয়ানরা আমাদের কল্যাণের জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করায় আমরা কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমরা আমাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোন রকম হস্তক্ষেপের বিরোধিতা ও নিন্দা করছি।' (দৈনিক পাকিস্তান ১৭/৫/৭১)

এই বিবৃতিতে যাঁরা স্বাক্ষর করেন তাঁরা হলেন—

১। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২। প্রিন্সিপাল ইব্রাহিম খাঁ, সাবেক কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী, পাকিস্তান সরকার, লেখক, নাট্যকার।
৩। এম কবীর, ইতিহাস বিভাগের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৪। ডঃ মীর ফখরুজ্জামান, মনস্তত্ব বিভাগের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, অধ্যক্ষ, এফ এইচ মুসলিম হল।
৫। ডঃ কাজী দীন মোহম্মদ, রিডার, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৬। নুরুল মোমেন, নাট্যকার, সিনিয়র লেকচারার, আইন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৭। জুলফাকার আলী, ও এস ডি, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।
৮। আহসান হাবীব, কবি।
৯। খান আতাউর রহমান, চিত্র পরিচালক-অভিনেতা ও সঙ্গীত পরিচালক।
১০। শাহনাজ বেগম, গায়িকা।
১১। আশকার ইবনে শাইখ, নাট্যকার, সিনিয়র লেকচারার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২। ফরিদা ইয়াসমিন, গায়িকা।
১৩। আবদুল আলিম, পল্লী গায়ক।
১৪। আবদুল্লাহ ইউসুফ ইমাম, চিত্র পরিচালক, প্রযোজক এবং লেখক, প্রযত্নে টেলিভিশন, ঢাকা।
১৫। এ এইচ চৌধুরী, পরিচালক-প্রযোজক, লেখক, টেলিভিশন, ঢাকা।

১৬। ডঃ মোহর আলী, রিডার, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা।
১৭। মুনীর চৌধুরী, বাংলা বিভাগের প্রধান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮। ডঃ আশরাফ সিদ্দিকী, বেঙ্গলি ডিপার্টমেন্ট বোর্ড*, ঢাকা।
১৯। খোন্দকার ফারুখ আহমেদ, গায়ক।
২০। এস এ হাদী, গায়ক।
২১। নীনা হামিদ, গায়িকা।
২২। এম এ হামিদ, গায়ক।
২৩। লায়লা আর্জুমান্দ বানু, গায়িকা।
২৪। শামসুল হুদা চৌধুরী,** চীফ ইনফর্মেশন অফিসার, ই-পি আই ডি সি, ঢাকা।
২৫। বেদারউদ্দীন আহমেদ, শিল্পী।
২৬। সাবিনা ইয়াসমীন, গায়িকা।
২৭। ফেরদৌসী রহমান, গায়িকা।
২৮। মোস্তফা জামান আব্বাসী, গায়ক।
২৯। সরদার জয়েনউদ্দিন, ছোট্ট গল্পকার।
৩০। সৈয়দ মুর্তজা আলী, লেখক, সমালোচক।
৩১। কবি তালিম হোসেন, প্রযত্নে নজরুল একাডেমী, ঢাকা।
৩২। শাহেদ আলী, ছোট গল্পকার, প্রযত্নে ইসলামিক একাডেমী, ঢাকা।
৩৩। কবি আবদুস সাত্তার, সম্পাদক, মহে নও, ঢাকা।
৩৪। ফররুখ শীয়র, নাট্যকার, সুপারভাইজার, রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা।
৩৫। কবি ফররুক আহমেদ, প্রাইড অব পারফরমেন্স।
৩৬। সম্পাদক আবদুস সালাম, পাকিস্তান অবজার্ভার, ঢাকা।
৩৭। সম্পাদক এস জি এম বদরুদ্দীন, মর্নিং নিউজ, ঢাকা।
৩৮। সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, দৈনিক পাকিস্তান, ঢাকা।
৩৯। ফতেহ লোহানী, চিত্র পরিচালক-অভিনেতা, প্রেসিডেন্টের স্বর্ণ পদক প্রাপ্ত।
৪০। হেমায়েত হোসেন, লেখক, প্রাক্তন সম্পাদক, এলান, রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা।
৪১। বি এম রহমান, লেখক, ঢাকা।
৪২। মবজলুল হোসেন, নাট্যকার, রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা।
৪৩। আকবর উদ্দীন, লেখক, গ্রন্থকার, ঢাকা।
৪৪। আকবর হোসেন, লেখক, ঢাকা।

* এটি হবে বাংলা উন্নয়ন বোর্ড

** বর্তমানে জাতীয় সংসদের স্পীকার।

৪৫। এ এফ এম আবদুল হক, লেখক; প্রাক্তন পরিচালক, পাবলিক ইন্সট্রাকশন, সদস্য, পাবলিক সার্ভিস কমিশন।
৪৬। অধ্যক্ষ এ কিউ এম আদমউদ্দিন, শিক্ষাবিদ।
৪৭। আলী মনসুর, নাট্যশিল্পী।
৪৮। কাজী আফসারউদ্দিন আহমেদ, লেখক।
৪৯। সানাউল্লাহ নুরী, লেখক।
৫০। শামসুল হক, কবি ও লেখক।
৫১। সরদার ফজলুল করিম, লেখক।
৫২। বদিউজ্জামান, লেখক।
৫৩। শফিক কবীর,* লেখক।
৫৪। ফওজিয়া খান, গায়িকা।
৫৫। লতিফা চৌধুরী, গায়িকা।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩৩ জন অধ্যাপকের বিবৃতি

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের ভারতীয় প্রচার নির্জলা মিথ্যা' শিরোনামে দৈনিক পাকিস্তানে ২৭/৬/৭১ তারিখে এ পি পি পরিবেশিত নিম্নোক্ত প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়।

'পাকিস্তানী সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন ধ্বংস করেছে বলে ভারতীয় বেতারের প্রচারনাকে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলরসহ তেত্রিশ জন অধ্যাপক নির্লজ্জ মিথ্যা বলে অভিহিত করেছেন।

'তাঁরা এক বিবৃতিতে বলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকার সকল ভবন অক্ষত রয়েছে এবং কোন ভবনেরই কোন রূপ ক্ষতি সাধন করা হয়নি।

'বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকগণ আমাদের প্রিয় স্বদেশ ভূমির সংহতি ও অখন্ডতা রক্ষায় আমাদের সেনাবাহিনীর সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের গভীর প্রশংসা করেন।

'বিবৃতিতে বলা হয়, আমরা নিম্ন স্বাক্ষরকারী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যায়ের শিক্ষকগণ পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনায় গভীর বেদনা বোধ করছি। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে ভারতীয় যুদ্ধবাজ যারা মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টিকে কখনো গ্রহণ করেনি প্রধাণতঃ তাদের চক্রান্তের ফলেই এটা হয়েছে।

'আমরা আমাদের প্রিয় স্বদেশভূমির সংহতি ও অখন্ডতা রক্ষার জন্য আমাদের সেনাবাহিনীর সময়োচিত ব্যবস্থা গ্রহণের প্রশংসা করছি।

* ছাপার ভুল। স্বাক্ষর রয়েছে শফিকুল কবীর।

'আমরা দেশের সংহতি ও অখন্ডতা বিপন্ন করার জন্য চরম পন্থীদের অপপ্রয়াসের তীব্র নিন্দা করছি। বহির্বিশ্বের চোখে পাকিস্তানের মর্যাদা হ্রাস ও পাকিস্তানকে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবে পঙ্গু করার অপচেষ্টা এবং সীমান্তে সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী পাঠিয়ে আমাদের ঘরোয়া ব্যাপারে ভারতীয় হস্তক্ষেপের আমরা নিন্দা করছি। আমরা ভারতের ভিত্তিহীন ও দুরভিসন্ধিমূলক প্রচারণার নিন্দা করছি।

'ভারতীয় বেতারে প্রচারিত একটি খবরের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে—উক্ত খবরে অভিযোগ করা হয়েছে যে পাকিস্তান সেনাবাহিনী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ধ্বংস করে দিয়েছে। আমরা দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করছি, এটা একটি নির্লজ্জ মিথ্যা প্রচারণা। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গনের সকল ভবন অক্ষত রয়েছে এবং কোন ভবনের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করা হয়নি। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বর্তমান মুহূর্তে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন আমাদের সকলের মধ্যে ঐক্য ও শৃংখলা। আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস রেখে আমরা বর্তমান সংকট হতে মুক্ত হতে পারব। বিবৃতি স্বাক্ষরকারীরা হলেন—

'ভারপ্রাপ্ত ভাইস চ্যান্সেলর ও আইন ফ্যাকাল্টির ডীন জনাব ইউ, এন, সিদ্দিকী, ইতিহাস বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রফেসর ডঃ আবদুল করিম,[১] সমাজ বিজ্ঞানের রীডার ও অধ্যক্ষ ডঃ এম বদরুদ্দোজা, ইসলামের ইতিহাসের লেকচারার জনাব মোহাম্মদ ইনামুল হক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যক্ষ ও প্রফেসর ডঃ রফিকুল ইসলাম চৌধুরী, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের রীডার জনাব মোঃ আনিসুজ্জামান, ইংরেজীর সিনিয়র লেকচারার খোন্দকার রেজাউর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেকচারার জনাব সৈয়দ কামাল মোস্তফা, রাষ্ট্রবিজ্ঞানের লেকচারার জনাব এম, এ, জিন্নাহ, ইতিহাসের সিনিয়র লেকচারার জনাব রফিউদ্দীন, রসায়নের প্রফেসর ও অধ্যক্ষ জনাব এ, কে এস আহমদ, সমাজ বিজ্ঞানের সিনিয়র লেকচারার জনাব রুহুল আমিন, বাণিজ্যের অধ্যক্ষ জনাব মোঃ আলী ইমদাদুল খান, ইতিহাসের সিনিয়র লেকচারার জনাব হোসেন মোঃ ফজলে দাইয়ান, বাংলার সিনিয়র লেকচারার জনাব মোঃ দিলওয়ার হোসেন, সংখ্যা তত্বের সিনিয়র লেকচারার জনাব আবদুর রশিদ, ইতিহাসের রীডার জনাব মুকাদ্দাসুর রহমান, ইতিহাসের লেকচারার জনাব আহসানুর কবির, অর্থনীতির লেকচারার জনাব শাহ মোঃ হুজ্জাতুল ইসলাম, ইংরেজীর অধ্যক্ষ জনাব মোহাম্মদ আলী,[২] পদার্থবিদ্যার রীডার জনাব এজাজ আহমদ, গণিতের লেকচারার জনাব এস, এম, হোসেন, গণিতের রীডার

১. প্রাক্তন উপাচার্য
২, বর্তমান প্রপাচার্য

জনাব জেড, এইচ, চৌধুরী, সংখ্যাতত্ত্বের লেকচারার জনাব হাতিম আলী হাওলাদার, বাংলার রীডার ডঃ মোঃ আবদুল আওয়াল, বাংলার সিনিয়র লেকচারার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান, বাংলার সিনিয়র লেকচারার জনাব মোঃ মনিরুজ্জামান হায়াৎ,* ইতিহাসের গবেষণা সহকারী জনাব আবদুস সায়ীদ, অর্থনীতির লেকচারার জনাব মোঃ মুস্তফা, ইতিহাসের লেকচারার মিসেস সুলতানা নিজাম, ইতিহাসের রীডার ডঃ জাকিউদ্দিন আহমদ ও ফাইন আর্টসের লেকচারার জনাব আবদুর রশিদ হায়দার।'

বিবৃতি সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন

ঢাকা ও চট্টগ্রামের বুদ্ধিজীবীদের বিবৃতির মূল বক্তব্য একই এবং অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। একই জায়গা থেকে এই বিবৃতিগুলো এসেছে। স্বাক্ষরদাতাদের তালিকায় এমন কয়েকজনের নাম রয়েছে যাঁরা প্রগতিশীল চিন্তার অধিকারী এবং যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে বিকশিত করার ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। ৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর ভেতর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর নাম রয়েছে যিনি ডিসেম্বরে আল বদরের ঘাতকদের হাতে নিহত হন।

৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিবৃতির মূল ভাষ্য ইংরেজীতে ছাপানো (করাচীর সইফি প্রিন্টার্স কর্তৃক মুদ্রিত) নয় পৃষ্ঠার এই বিবৃতির নামপত্রে বড় হরফে লেখা—'A STATEMENT BY EAST PAKISTAN SCHOLARS AND ARTISTS।' বিবৃতির মূল ভাষ্যের পর নামের তালিকা স্বাক্ষরকারীদের পরিচিতি সহ ছাপা হয়েছে। এই তালিকায় মোট ৫৭টি নাম, রয়েছে এর ভেতর গায়ক আব্দুল আলিমের নাম দুবার ছাপানো রয়েছে। ছাপানো নামের পাশে তিনি দুবার সই করেছেন, প্রথমবার 'আবদুল আলিম' এবং শেষের বার শুধু 'এ আলিম।' ডঃ কাজী দীন মোহাম্মদ এবং নুরুল মোমেনের নামের মাঝখানে 'কবীর চৌধুরী, পরিচালক বাংলা একাডেমী, ঢাকা' ছাপা রয়েছে কিন্তু পাশে কবীর চৌধুরীর সই নেই। সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, মুনীর চৌধুরী, কাজী দীন মোহাম্মদ, মীর ফখরুজ্জামান চৌধুরী, ইব্রাহিম খাঁ প্রমুখ নামের পাশে সই করা ছাড়াও নামপত্রের উপর সই করেছেন। মোস্তফা জামান আব্বাসী, সানাউল্লাহ নুরী ও শামসুল হক বাংলায় সই করেছেন, অন্য সবাই করেছেন ইংরেজীতে।

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে স্বাক্ষরদাতাদের অনেকে পরবর্তী কালে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পক্ষে কাজ করেছেন। ফলে অনুমান করে

* লেখক হায়াৎ মামুদ

১৬ ডিসেম্বরের পর বিভিন্ন দৈনিকে আত্মগোপনকারী মওলানা মান্নানকে ধরিয়ে দেবার আবেদন প্রকাশিত হয়। ৭-৫-৭২ দৈনিক আজাদে প্রকাশিত মওলানা মান্নানকে ধরিয়ে দেবার আবেদন।

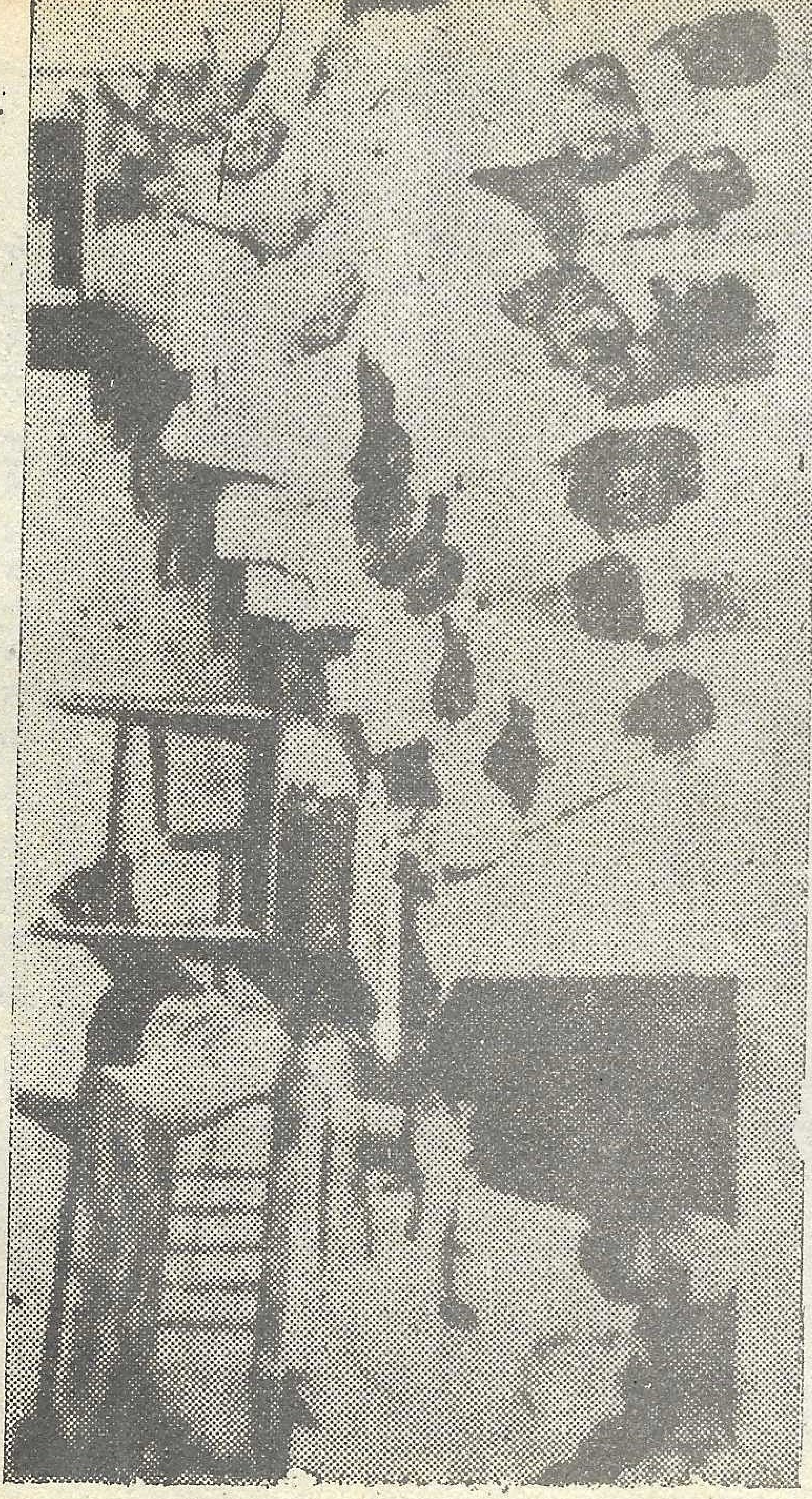

লে : জেনারেল নিয়াজীর সাথে বৈঠকরত মাদ্রাসা শিক্ষকদের ছবি। প্রতিনিধিদলের নেতা মওলানা মান্নানকে নিয়াজীর পাশে দেখা যাচ্ছে। দৈনিক পূর্বদেশ ২৮-৯-৭২

শান্তি কমিটি গঠনের সূত্রপাত। টিক্কা খানের সাথে বৈঠকরত ১২জন রাজনৈতিক নেতার সমন্বয়ে গঠিত প্রতিনিধি দলের নেতা নূরুল আমিন ও গোলাম আযম। দৈনিক পূর্বদেশ, ৬-৪-৭১

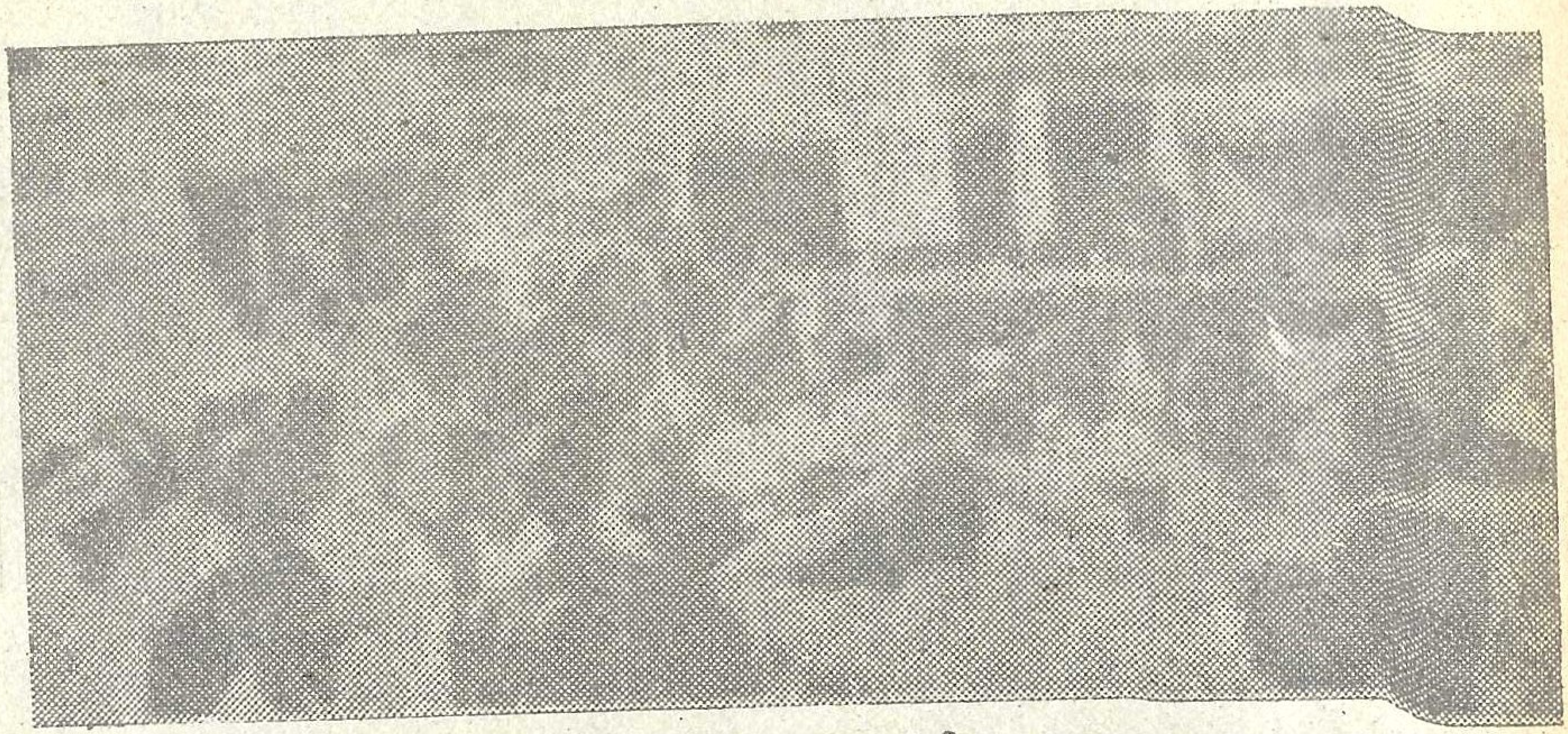

৯ ও ১০ ডিসেম্বরের মাঝামাঝি রাত থেকে ঢাকায় আলবদর বাহিনী হত্যার জন্য ব্যাপকভাবে বুদ্ধিজীবীদের অপহরণ করা শুরু করে। ১১-১২-৭১ দৈনিক আজাদে প্রকাশিত এই ছবিটির ক্যাপশন ছিল, গতকাল গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে হুশিয়ারী প্রদান করিয়া আলবদুর আয়োজিত পথ সভায় বক্তৃতা করিতেছেন আলবদর প্রধান জনাব মুজাহিদ (আলী আহসান মুহাম্মদ মুজাহিদ)। এই সভায় অপর বক্তা ছিলেন আলবদর হাই কমান্ডের ৩নং ব্যক্তি মীর কাশেম আলী।

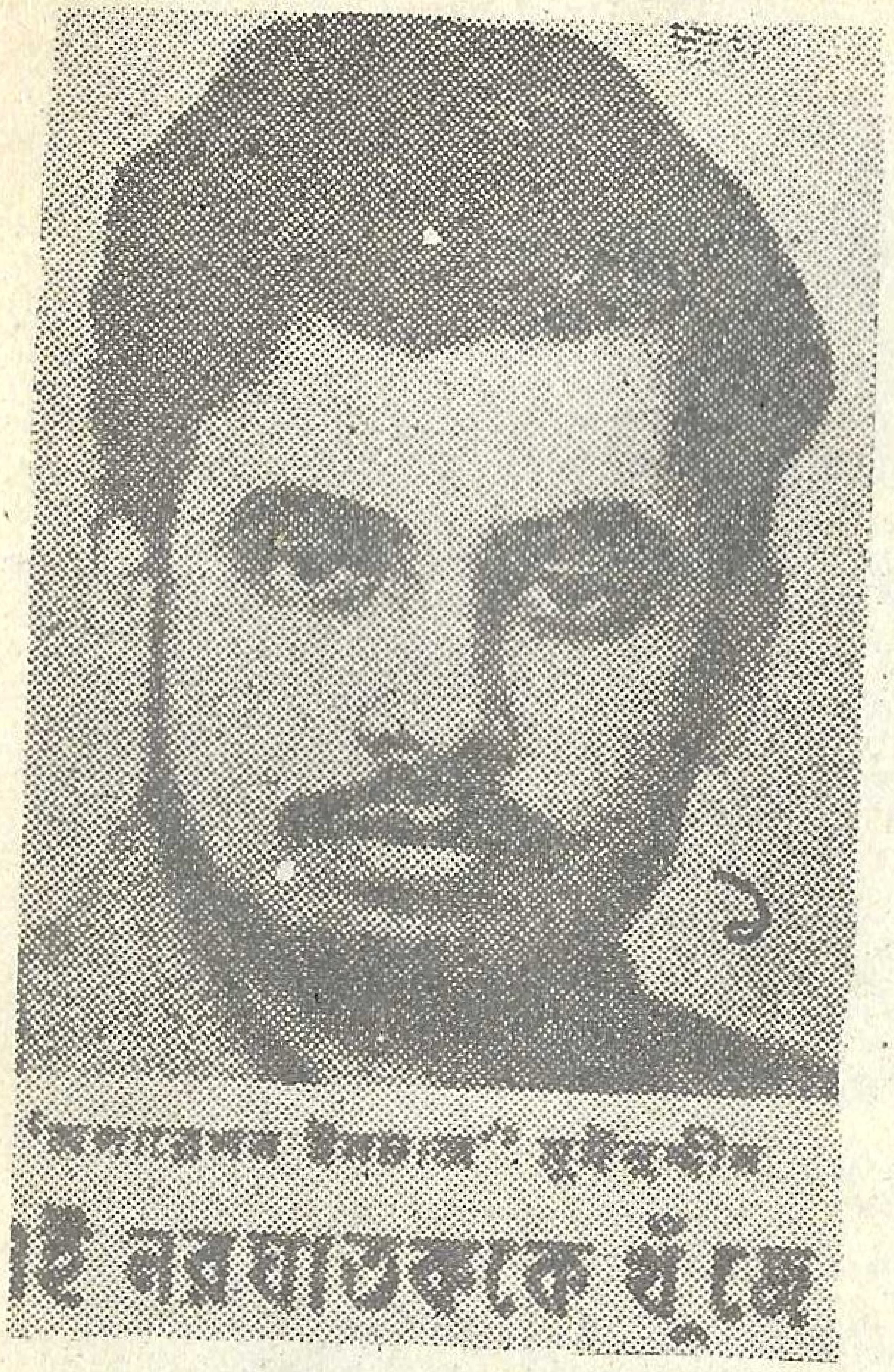

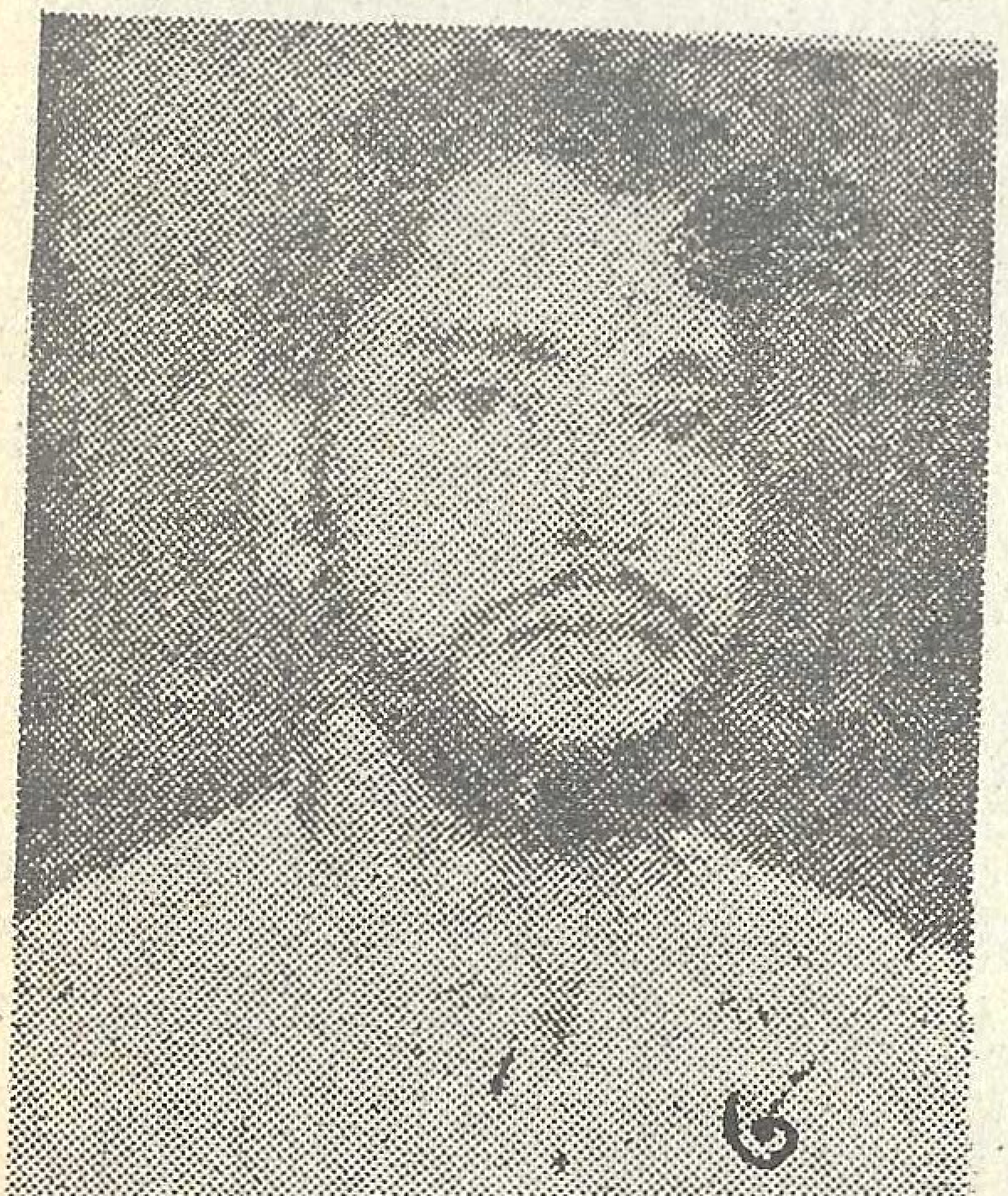

বুদ্ধিজীবী হত্যাকাণ্ড পরিচালনাকারী আলবদর নেতাদের কয়েকজন (১) 'অপারেশন ইনচার্জ'' চৌধুরী মঈনুদ্দিন (২) 'প্রধান জল্লাদ' আশরাফুজ্জামান খান (৩) শহীদুল্লাহ কায়সারের অপহরণকারী এবি এম খালেক মজুমদার—এর কাছ থেকেই বুদ্ধিজীবী হত্যা পরিকল্পনার যাবতীয় তথ্য উদ্ধার করা হয়েছে।

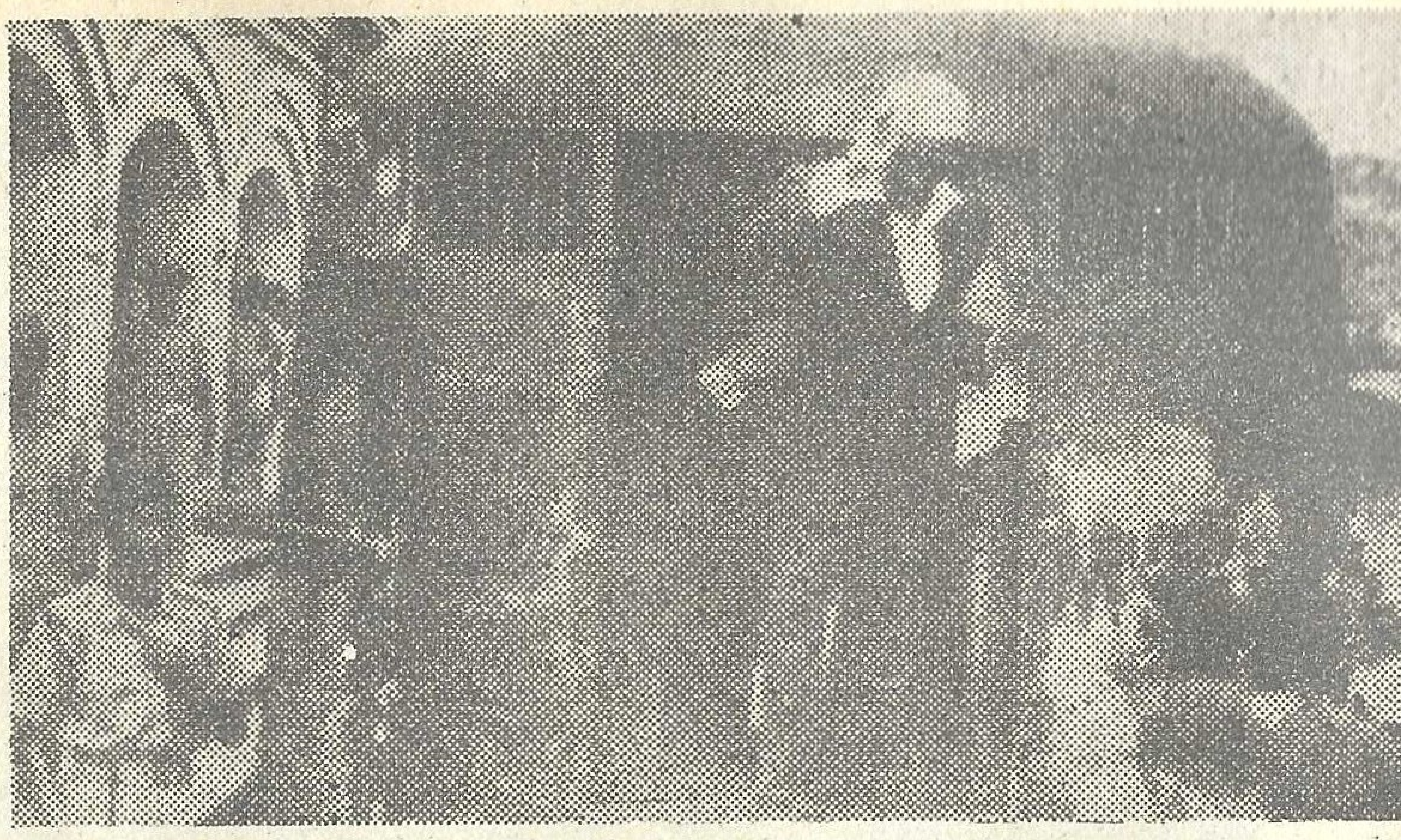

মুক্তিযুদ্ধকালে 'পূর্ব পাকিস্তানে' ইয়াহিয়া খানের বেসামরিক প্রতিনিধি গভর্নর ডাঃ মালেক ১৬ ডিসেম্বর '৭১ মুক্তিযুদ্ধ কমাণ্ডের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হন। পরাজিত পাকিস্তান বাহিনীর বাংলাদেশ অঞ্চলের অন্যতম প্রধান কোলাবরেটর গভর্নর ডাঃ মালেককে কারাগার থেকে বিচারের জন্য কয়েদীদের ভ্যানে করে কোর্টে নিয়ে যাওয়া হয়। চিত্রে ডাঃ মালেককে প্রিজন ভ্যান থেকে কোর্ট এলাকায় নামতে দেখা যাচ্ছে

আদালত কক্ষে কিছুসংখ্যক দালালসহ ডাঃ মালেক আসামীর কাঠগড়ায়।

A STATEMENT BY EAST PAKISTAN SCHOLARS AND ARTISTS

পাক বাহিনীর পক্ষে ৫৫ জন বুদ্ধিজীবীর বিতর্কিত
বিবৃতির শিরোনাম পত্র

বুদ্ধিজীবী হত্যার প্রস্তুতি হিশেবে '৭১-এর ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ থেকে আলবদর বাহিনী ঢাকার বিভিন্ন স্থানে পথসভার আয়োজন করে। আলবদর হাই কমাণ্ডের সদস্যরা এসমস্ত সভায় বক্তৃতা করে। ৫-১২-৭১ দৈনিক পূর্বদেশে প্রকাশিত এমনি একটি পথসভার দৃশ্য

ফকিরাপুলের রাজাকার বাহিনী। পাকিস্তানী পতাকাধারীর পাশে কালো স্যুট পরিহিত ব্যক্তিটি হচ্ছেন কমাণ্ডার ফিরোজ মিয়া। —দৈনিক বাংলা ১৪-৭-৭২

'৭১-এ পাক বাহিনী জয়পুর হাটে বেশ কিছু সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধাকে গ্রেফতার করে চোখ বাঁধা অবস্থায় সারা শহর ঘোরানোর পর তাদের হত্যা করা হয়। ছবিতে এই অভিযানে নেতৃত্বদানকারী মেজর আফজালের পাশে তদানিন্তন জয়পুর হাট শান্তি কমিটির চেয়ারম্যান আবদুল আলীম (X চিহ্নিত) হাস্যোজ্জ্বল দাঁড়িয়ে। সামনে উপবিষ্ট পেছনে হাত বাধা হতভাগ্য মুক্তিযোদ্ধারা। জয়পুর হাট মুক্ত হবার পর এখানে আবদুল আলীমকে খাঁচায় পুরে জনসাধারণের দেখার জন্য রেখে দেওয়া হয়েছিল।

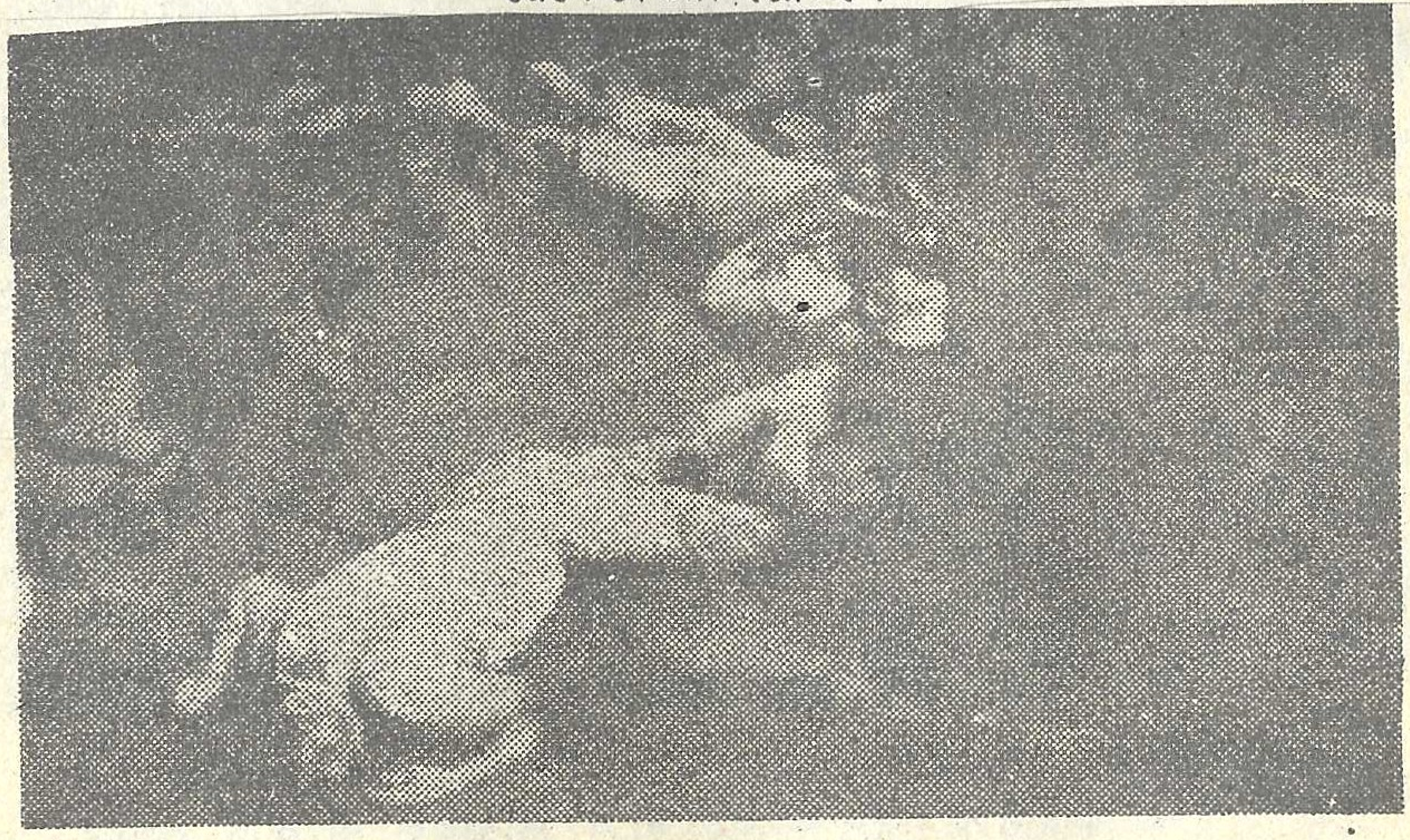

ঢাকার রায়ের বাজার বধ্যভূমিতে প্রাপ্ত শহীদ মুক্তি-যোদ্ধা ভ্রাতৃদ্বয় বদিউজ্জামান, শাহজাহান ও মুস্তফজাহানের লাশ

৮

উপসংহার

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নারকীয় হত্যাকান্ড—বিশেষ করে জার্মান নাৎসী বাহিনী কর্তৃক লক্ষ লক্ষ নিরীহ ইহুদী, কমিউনিস্ট এবং অ-জার্মান নাগরিকদের ঠান্ডা মাথায় নির্মমভাবে হত্যার পর বিশ্ববিবেক এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ-অপরাধীদের খুঁজে বের করে শাস্তি বিধানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মহাযুদ্ধ অবসানের পর থেকে যে তৎপরতা শুরু হয়েছে, ৪২ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও তা অব্যাহত রয়েছে। ঘাতক ও তাদের দোসরদের প্রতি শান্তিপ্রিয় মানুষের ঘৃণা এখনও অটুট রয়েছে। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একসময় বিপুল সংখ্যক নাৎসী যুদ্ধের পর গোপনে পালিয়ে গিয়েছিল, সেই যুক্তরাষ্ট্রে আজ যুদ্ধের অপরাধে অভিযুক্ত অস্ট্রিয়ার প্রেসিডেন্ট এবং জাতিসংঘের সাবেক মহা-সচিব কূর্ট ওয়াল্ডহেইমকে ঢুকতে দেওয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত জনমতকে সেখানকার সরকারও উপেক্ষা করতে পারছে না। কারাগারের অভ্যন্তরে নাৎসী নেতা হেস আজও মৃত্যুর দিন গুনছে। আঙ্গো ধরে এনে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে সেই সব ঘাতকদের। মাত্র সেদিন (১১/৫/৮৭) ফ্রান্সের এক আদালতে বিচার শুরু হয়েছে সাবেক গেস্টাপো প্রধান ক্লস বারবির।

একমাত্র ব্যতিক্রম হচ্ছি আমরা। মানবেতিহাসের নৃশংসতম হত্যাকান্ড যারা ঘটিয়েছিল, যারা তাদের সর্বোতভাবে সহযোগিতা করেছিল, তাদের বিনা বিচারে কিম্বা বিচারের প্রহসন করে ছেড় দেয়া হয়েছে, ক্ষমা করা হয়েছে, জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে মর্যাদার আসনে বসানো হয়েছে। লক্ষ লক্ষ শহীদের স্বজনরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন, শেখ মুজিবুর

রহমান থেকে জেনারেল এরশাদ পর্যন্ত যাঁরা সরকারে ছিলেন এবং আছেন—কে তাঁদের অধিকার দিয়েছিল ৩০ লক্ষ শহীদের রক্তের সঙ্গে এই বেঈমানী এবং বেইনসাফী করবার ? শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের পরিবার মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করবে একমুঠো ক্ষুধার অন্ন জোগাবার জন্য, মাথাগোজার এতটুকু আশ্রয়ের জন্য, চিকিৎসার অভাবে তারা ধুঁকে ধুঁকে মরবে আর ঘাতক, দালালরা মন্ত্রীসভার আসন অলংকৃত করবে, লক্ষ কোটি টাকার বৈভব গড়বে—এরই জন্যে কি আমরা স্বাধীনতা চেয়েছিলাম ?

একাত্তরের চৌদ্দই ডিসেম্বর গভীর রাতে, মানুষের ইতিহাসের অন্যতম বধ্যভূমি রায়ের বাজারের জলাভূমিতে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে এক অজ্ঞাত পরিচয় শহীদ তাঁর হত্যাকারী আল বদরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন—'আমার কাছে তোরা দায়ী থাকিব।'

সেই অজ্ঞাতনামা শহীদ এবং আমাদেরই পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী বাংলাদেশের আরও অগণন পবিত্র শহীদের রক্তের ওপর দাঁড়িয়ে আছি আমরা। স্বাধীনতার স্বাদ তাঁরা আমাদের এনে দিয়েছেন। তাঁদের রক্তের ঋণে আমরা এবং আমাদের ভবিষ্যত বংশধর চিরঋণে আবদ্ধ। অথচ তাঁদের পবিত্র স্মৃতির অবমাননা করে আমরা কি চরম বিবেকহীনতারই পরিচয় দিই না। ইতিহাসের যে কোন বিপ্লব, যে কোন জাতির স্বাধীনতা যুদ্ধের চেয়ে অধিক রক্তস্নাত এই গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের চেতনাই কি হওয়া উচিত নয় আমাদের ব্যক্তিগত, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সকল মহৎ প্রয়াসের অনুপ্রেরণার মূল উৎস ?

সেই পবিত্র শহীদানের প্রমাণিত হত্যাকারীরা আমাদের আরও স্বজনের রক্তপানের জন্যে চোখের সামনে আজ আবারও ছুরি শানাচ্ছে, অথচ আমরা এমনই অকৃতজ্ঞ, এমনই কাপুরুষ যে, ভ্রাতৃ হত্যাকারীদের পরিচয় উদ্ঘাটনের সাহসও আমাদের নেই। আমরাও কি একইভাবে সেই শহীদদের কাছে দায়ী হয়ে নেই ?

পরিশিষ্ট

একাত্তরের নেতৃস্থানীয় দালালরা এবং তাদের বর্তমান অবস্থান

১. কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির সদস্যবৃন্দ*

১।	খাজা খয়েরউদ্দিন	পাকিস্তানে মুসলিম লীগ নেতা
২।	এ, কিউ, এম শফিকুল ইসলাম	এডভোকেট, লাহোর হাইকোর্ট। বাংলাদেশে ব্যবসা আছে
৩।	গোলাম আজম	বাংলাদেশে অবৈধ বসবাসকারী জামাতে ইসলামীর আমীর
৪।	মওলানা সৈয়দ মোহাম্মদ মাসুম	কেন্দ্রীয় মজলিশে সাদারাত সদস্য, বাংলাদেশ ইত্তেহাদুল উম্মাহ
৫।	আবদুল জব্বার খদ্দর	স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
৬।	মাহমুদ আলী	পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের সমাজ-কল্যাণ বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী
৭।	এম, এ, কে রফিকুল ইসলাম	তথ্য পাওয়া যায়নি
৮।	ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)	স্বাধীনতাযুদ্ধ চলাকালে স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
৯।	আবুল কাশেম	স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়

* কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির ১০৪ জন সদস্যের সবার নাম পাওয়া যায় নি। এই তালিকায় উল্লেখিত নামগুলি মুদ্রিত দলিলের ভিত্তিতে প্রদত্ত হল। কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির বাকী সদস্যরা ছিলেন স্বাধীনতা বিরোধী উগ্রপন্থী দলগুলির নেতৃবৃন্দ।

১০।	গোলাম সারওয়ার	লন্ডনে জামাতীদের সংগঠন দাওয়াতুল ইসলামের নেতা এবং লন্ডনভিত্তিক ইসলামিক ইনস্টিটিউটের পরিচালক
১১।	সৈয়দ আজিজুল হক (নান্না মিয়া)	জাতীয় পার্টির কেন্দ্রীয় নেতা এবং জাতীয় সংসদ সদস্য
১২।	এ, এস, এম, সোলায়মান	সভাপতি, বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক পার্টি
১৩।	পীর মোহসেন উদ্দিন (দুদু মিয়া)	সহ সভাপতি, বাংলাদেশ ডেমোক্রেটিক লীগ
১৪।	শফিকুর রহমান	চেয়ারম্যান, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
১৫।	মেজর (অবঃ) আফসার উদ্দিন	আহবায়ক, বাংলাদেশ গণতন্ত্র বাস্তবায়ন পরিষদ, সভাপতি, ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক পার্টি, প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি পদপ্রার্থী।
১৬।	সৈয়দ মোহসেন আলী	শিল্পপতি, প্রাক্তন সভাপতি, শিল্প ও বণিক সংস্থা এবং ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ, প্রাক্তন পরিচালক, আই, এফ, আই, সি ব্যাংক।
১৭।	ফজলুল হক চৌধুরী	স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।
১৮।	মোঃ সিরাজুদ্দিন	শিল্পপতি, ঢাকা শহর সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ।
১৯।	এডভোকেট এ, টি, সাদি	অবসর প্রাপ্ত এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট।
২০।	এডভোকেট আতাউল হক খান	সহ সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
২১।	মকবুলুর রহমান	শিল্পপতি
২২।	আলহাজ মোহাম্মদ আকিল	ভারপ্রাপ্ত সভাপতি, বাংলাদেশ নেজামে ইসলাম দল।
২৩।	প্রিন্সিপাল রুহুল কুদ্দস	কেন্দ্রীয় কর্ম পরিষদ সদস্য, জামাতে ইসলামী
২৪।	নুরুজ্জামান	শিল্পপতি, পরিচালক ইসলামিক উন্নয়ন ব্যাংক

২৫। মওলানা মিয়া মফিজুল হক	কেন্দ্রীয় মজলিশে সাদারাত সদস্য, ইত্তেহাদুল উম্মাহ, বাংলাদেশ।
২৬। এডভোকেট আবু সালেক	সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট
২৭। এডভোকেট আবদুন নাঈম	স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
২৮। মওলানা সিদ্দিক আহমদ	কেন্দ্রীয় মজলিশে সাদারাত সদস্য, ইত্তেহাদুল উম্মাহ, বাংলাদেশ
২৯। আবদুল মতিন	মহাসচিব, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
৩০। ব্যারিস্টার আখতার উদ্দিন	সৌদী আরবে অবস্থানরত, সৌদিয়া ইন্টারন্যাশনালের আইন উপদেষ্টা
৩১। তোয়াহা বিন হাবিব	শিল্পপতি, সদস্য, কেন্দ্রীয় মজলিশে সুরা, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
৩২। হাকিম ইরতিজায়ুর রহমান আখুনজাদা	স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়
৩৩। রাজা ত্রিদিব রায়	করাচীতে ব্যবসা করছেন
৩৪। ফয়েজ বক্স	সভাপতি, নিখিল বাংলাদেশ মুসলিম লীগ।

২. পূর্ব পাকিস্তান শান্তি ও কল্যাণ কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যবৃন্দ।

১। মওলভী ফরিদ আহমদ, সভাপতি	স্বাধীনতার পর পরই নিখোঁজ হন।
২। নুরুজ্জামান, সাধারণ সম্পাদক	প্রাক্তন পরিচালক, ইমাম প্রশিক্ষণ কোর্স, ইসলামিক ফাউন্ডেশন
৩। মওলানা আবদুল মান্নান	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী
৪। জুলমত আলী খান	সহ সভাপতি, বি, এন, পি
৫। এ, কে, এম, মুজিবুল হক	শিল্পপতি।
৬। ফিরোজ আহমদ	তথ্য পাওয়া যায় নি।

৩. মালেক মন্ত্রীসভার সদস্যবৃন্দ

১।	আবুল কাশেম	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।
২।	নওয়াজেশ আহমদ	সহ সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
৩।	এ, এস, এম সোলায়মান	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।
৪।	ওবায়দুল্লাহ মজুমদার	কেন্দ্রীয় মজলিশে শূরা সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন।
৫।	আব্বাস আলী খান	ভারপ্রাপ্ত আমীর, জামাতে ইসলামী
৬।	মওলানা এ, কে, এম ইউসুফ	সেক্রেটারী জেনারেল, জামাতে ইসলামী
৭।	মওলানা ইসহাক	মজলিশে শূরা সদস্য, বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন
৮।	শামসুল হক	তথ্য পাওয়া যায়নি
৯।	জসিমুদ্দিন আহমদ	স্বাধীনতার পর স্বাভাবিক মৃত্যু হয়।
১০।	আখতারুদ্দিন আহমদ	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।
১১।	অংশু প্রু চৌধুরী	প্রাক্তন মন্ত্রী
১২।	এ, এম, মোশাররফ হোসেন	সেক্রেটারী জেনারেল, ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগ
১৩।	মুজিবুর রহমান	বাংলাদেশ-সৌদী আরব মৈত্রী সমিতি প্রধান

৪. ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎকারী তদানীন্তন পূর্ব পাক প্রতিনিধি দল

১।	হামিদুল হক চৌধুরী	মালিক, অবজার্ভার গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
২।	মাহমুদ আলী	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে
৩।	ডঃ সাজ্জাদ হোসেন	অধ্যাপক, কিং আবদুল আজিজ বিশ্ববিদ্যালয়, সৌদী আরব, বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থান করছেন
৪।	বিচারপতি নূরুল ইসলাম	উপরাষ্ট্রপতি

৫। ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

৫· জাতিসংঘে পাক প্রতিনিধি দলের বাঙ্গালী সদস্যবৃন্দ

১। শাহ আজিজুর রহমান	সভাপতি, বি, এন, পি (শাহ)
২। জুলমত আলী খান	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।
৩। রাজিয়া ফয়েজ	সহ সভাপতি, বাংলাদেশ মুসলিম লীগ
৪। ডঃ ফাতিমা সাদিক	অবসর জীবন যাপন করছেন
৫। এ, টি, সাদী	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

৬. কেন্দ্রীয় শান্তি কমিটির লিয়াজোঁ অফিস এবং ভারপ্রাপ্ত লিয়াজোঁ অফিসারবৃন্দ *

১। কোতওয়ালী থানা: ১। এ, আই, আহমদ শের, আহসান মঞ্জিল, ১৭, আহসানুল্লাহ রোড, ঢাকা। ফোন ২৪৬৩৪০।

২। সাকী সুলতান, কসাইটোলা, ঢাকা, ফোন ২৫১৩১৫।

২। লালবাগ থানা: ১। আলহাজ্ব নাজির হোসেন, চেয়ারম্যান, লালবাগ ইউনিয়ন কমিটি, ৫৩, জগন্নাথ সাহা রোড, ঢাকা, ফোন ২৫৩১৮১।

২। এস, এম, হাবিবুল হক, হাউজ নং ৬১২, রোড নং ১৮, ধানমণ্ডী, ঢাকা, ফোন: অফিস ২৫০৮০৬, বাসা ২৫৪০৬৪।

৩। নোয়াব আলী এডভোকেট, সেন্ট্রাল রোড, ঢাকা, ফোন ২৫০২৬১। এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।

৩। সূত্রাপুর থানা: ১। আলহাজ্ব সিরাজউদ্দিন, সাবেক এম, পি, এ, ৯১, ঋষিকেশ দাস রোড, ঢাকা, ফোন: অফিস ২৮১৩৪২, বাসা ২৮২৫৪০। ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।

২। জনাব মাহতাবুদ্দিন খান, ৫৪, আর, কে, মিশন রোড, ঢাকা ফোন ২৪৫৩৫৪।

৩। ফরজুল হক, ১২ ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, ফোন ২৫৭৫৯৬।

৪। তমিজউদ্দিন ৩১, জারিয়াতলী লেন, ফোন ২৫৭৩৫৬।

৫। আবদুর রশিদ, রথখোলা রোড, ফোন ২৫০৪০।

৪। তেজগাঁও থানা: ১। ইকবাল ইদ্রিস, ৭৫, ইন্দিরা রোড, তেজগাঁও

* লিয়াজোঁ। অফিসগুলির ঠিকানা ও ফোন নং '৭১ সালের

৯. ইসলামী ছাত্র সংঘের কেন্দ্রীয় কমিটি
(আল বদর হাইকমান্ড)

১। মতিউর রহমান নিজামী (সারা পাকিস্তান প্রধান)	সহ সাধারণ সম্পাদক, জামাতে ইসলামী
২। আলী আহসান মুহম্মদ মুজাহিদ (পূর্ব পাকিস্তান প্রধান)	ঢাকা মহানগরী আমীর, জামাতে ইসলামী। পরিচালক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা
৩। মীর কাসেম আলী (প্রথমে চট্টগ্রাম জেলা প্রধান ছিলেন, পরবর্তীতে আল বদর বাহিনীর নেতৃত্বের ৩ নম্বর স্থান লাভ করেন)	ঢাকা মহানগরী নায়েবে আমীর, জামাতে ইসলামী। পরিচালক, রাবেত-ই-আলম (বাংলাদেশ) সদস্য (প্রশাসন), ইবনে সিনা ট্রাস্ট।
৪। মোহাম্মদ ইউনুস	কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য, জামাতে ইসলামী। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ইসলামী ব্যাংক। পরিচালক, ইসলামিক সমাজ কল্যাণ সমিতি। সভাপতি, মুসলিম বিজনেসম্যান সোসাইটি
৫। মোহাম্মদ কামরুজ্জামান (বদর বাহিনীর প্রধান সংগঠক)	কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক, জামাতে ইসলামী। সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা।
৬। আশরাফ হোসাইন (বদর বাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা ও ময়মনসিংহ জেলা প্রধান)	ঢাকায় ব্যবসা করেন
৭। মোহাম্মদ শামসুল হক (ঢাকা শহর প্রধান)	কেন্দ্রীয় মজলিশে শুরা সদস্য, জামাতে ইসলামী
৮। মোস্তফা শওকত ইমরান (ঢাকা শহর বদর বাহিনীর অন্যতম নেতা)	স্বাধীনতার পর পরই নিখোঁজ হন
৯। আশরাফুজ্জামান খান (ঢাকা শহর বদর বাহিনীর	সৌদী আরবে চাকুরী করেন

হাইকমান্ড সদস্য এবং বুদ্ধি-জীবী হত্যাকান্ডের 'চীফ এক্সিকিউটর' (প্রধান জল্লাদ)	
১০। আ, শ, ম রুহুল কুদ্দুস ঢাকা বদর বাহিনীর অন্যতম নেতা।)	মজলিশে শুরা সদস্য, জামাতে ইসলামী।
১১। সরদার আবদুস সালাম (ঢাকা জেলা প্রধান)	কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক, জামাতে ইসলামী
১২। খুররম ঝা মুরাদ	লন্ডনে অবস্থানরত আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত জামাত নেতা। বিভিন্ন দেশে জামাতীদের তৎপরতার সমন্বয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত আছেন।
১৩। আবদুল বারী (জামালপুর প্রধান)	ঢাকায় চাকুরী করেন।
১৪। আবদুল হাই ফারুকী (রাজশাহী জেলা প্রধান)	দুবাইয়ে ব্যবসা করেন।
১৫। আবদুল জাহের মোহাম্মদ আবু নাসের (চট্টগ্রাম জেলা প্রধান)	ঢাকায় সৌদী রাষ্ট্রদুতের ব্যক্তিগত সহকারী এবং গ্রন্থাগারিক
১৬। মতিউর রহমান খান (খুলনা জেলা প্রধান)	জেদ্দায় চাকুরী করেন।
১৭। চৌধুরী মঈনুদ্দীন (বুদ্ধিজীবী হত্যাকান্ডের 'অপারেশন ইনচার্জ')	লন্ডন থেকে প্রকাশিত জামাতের 'সাপ্তাহিক দাওয়াত' পত্রিকার বিশেষ সম্পাদক এবং লন্ডন ভিত্তিক জামাতীদের সংগঠন দাওয়াতুল ইসলাম নেতা।

এছাড়া ঢাকা শহর বদর বাহিনীর দুই নেতা নুর মোহাম্মদ মল্লিক ও এ, কে, মোহাম্মদ আলী এবং রাজশাহী জেলা বদর বাহিনী প্রধান আজাহারুল ইসলামের বর্তমান অবস্থান জানা যায় নি।

১০। টিক্কা খান কর্তৃক গঠিত প্রাদেশিক শিক্ষা সংস্কার কমিটি

১। ডঃ সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন* (ভি, সি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে
২। ডঃ হাসান জামান	সৌদী আরবে কর্মরত অবস্থায়

(রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	মৃত্যুবরণ করেন।
৩। ডঃ মোহর আলী (ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)	লন্ডনে অবস্থানরত, ইসলামিক ইনস্টিটিউটের কর্মকর্তা।
৪। এ, এফ, এম, আবদুর রহমান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের অধ্যাপক
৫। আবদুল বারী (ভি, সি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)	চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের গভর্নিং বডির সদস্য,
৬। ডঃ সাইফুদ্দিন জোয়ার্দার	পরলোক গমণ করেছেন।
৭। ডঃ মকবুল হোসেন	অবসর জীবন যাপন করছেন।

১১. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক, দালালীর অভিযোগে যাঁদের বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়া হয়েছিল

ক) বেগম আখতার ইমাম প্রভোস্ট, রোকেয়া হল	ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করছেন।
খ) বাংলা বিভাগ—	
১. ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ*	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে।
গ) আরবী বিভাগ	
১. ডঃ মোঃ মুস্তাফিজুর রহমান	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত
২. ডঃ ফাতিমা সাদিক**	ইতিপূর্বে উল্লেখিত হয়েছে
ঘ) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ	
১. ডঃ গোলাম ওয়াহেদ চৌধুরী	ঢাকায় গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রির মালিক
২. ডঃ রশিদুজ্জামান**	যুক্তরাষ্ট্রে চাকুরীরত
৩. ডঃ এ, কে, এম শহীদুল্লাহ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত
৪. এ. কে, এম; জামাল উদ্দিন মোস্তফা**	ঢাকায় ব্যবসা করেন।
ঙ) সমাজ বিজ্ঞান বিভাগ—	
১. মোঃ আফসার উদ্দিন	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকুরীরত, উচ্চ শিক্ষাকালীন ছুটি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন।

চ) মনোবিজ্ঞান বিভাগ

১. ডঃ মীর ফখরুজ্জামান — সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

ছ) পদার্থ বিদ্যা বিভাগ

১. ডঃ মোঃ শামসুল ইসলাম — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

জ) ফার্মেসী বিভাগ

১. ডঃ আবদুল জব্বার — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত।

ঝ) পরিসংখ্যান বিভাগ

১. ডঃ মাহবুবউদ্দিন আহমদ — তথ্য পাওয়া যায়নি।

২. মোঃ ওবায়দুল্লাহ** (আসকার ইবনে শাইখ নামে পরিচিত) — বাংলাদেশ টেলিভিশন ও রেডিও বাংলাদেশের নাট্যকার।

ঞ) শিক্ষা গবেষণা ইনস্টিটিউট

১. মোঃ হাবিবুল্লাহ, — পাকিস্তানে বাস করছেন

২. আবদুল কাদের মিয়া** — তথ্য পাওয়া যায়নি

৩. ডঃ শাফিয়া খাতুন — প্রাক্তন মন্ত্রী এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশন সদস্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত

চ) স্বাস্থ্য প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট

১. লেঃ কঃ (অবঃ) মতিউর রহমান — ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করছেন।

ছ) সাংবাদিকতা বিভাগ

১. আতিকুজ্জামান খান — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত অবস্থায় মারা যান।

জ) উর্দু ও পার্সী বিভাগ

১. ডঃ আফতাব আহমেদ সিদ্দিকী — পাকিস্তানে বাস করছেন।

২. ফজলুল কাদের** — তথ্য পাওয়া যায় নি

ঝ) আইন বিভাগ

১. নুরুল মোমেন — ঢাকায় অবসর জীবন যাপন করছেন।

ঞ) ইসলামের ইতিহাস বিভাগ

১. ডঃ এস, এম, ইমামুদ্দিন — পাকিস্তানে বাস করছেন।

ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেয়ার টেকার

এস, ডি, দলিলুদ্দিন — ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত

~~ঠ)~~ উদ্ভিদ বিদ্যা বিভাগ

১. মোঃ মাহ্বুবুল আলম তথ্য পাওয়া যায় নি
ফাইজুল জালাল**

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সমস্ত দালাল শিক্ষকের অনেকই বুদ্ধিজীবী হত্যার সাথে জড়িত ছিলেন। আল বদর বাহিনীর প্রধান জল্লাদ আশরাফুজ্জামান খানের ডায়েরীতে এ'দের অনেকের নাম উল্লেখ ছিল।

ড) শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের
উচ্চমান সহকারী নাসির আহমেদ*

ঢ) চীফ এঞ্জিনিয়ার অফিসের পেইন্টার
জহীর খান**

ণ) এঞ্জিনিয়ারিং অফিসের পিয়ন
শাহজাহান**

ত) সলিমুল্লাহ হলের পিয়ন
মোহাম্মদ মুস্তফা**

১ অক্টোবর ১৯৭৩ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নামের শেষে(*) ও (*)(*) চিহ্নিত ব্যক্তিরা যথাক্রমে চাকুরী থেকে বরখাস্ত ও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিস্কৃত হন। (সূত্র দৈনিক বাংলা ৩/১০/৭৩)

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের যে সমস্ত অধ্যাপককে দালালীর অভিযোগে বাধ্যতামূলক ছুটি দেয়া হয়—

ক)

১। ডঃ আবদুল বারী উপাচার্য	চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন

খ) বাংলা বিভাগ

১। ডঃ গোলাম সাকলায়েন রীডার	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, রাঃ বিঃ
২। আজিজুল হক	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাঃ বিঃ
৩। শেখ আতাউর রহমান	সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রাঃ বিঃ
গ) বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজিস্ট্রার আবদুর রহিম জোয়ার্দার	ঢাকার শ্যামলীতে নিজস্ব ভবনে অবসর জীবন যাপন করছেন।

দালালীর অভিযোগে যাঁদের স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে গ্রেফতার করা হয়।

১।	মকবুল হোসেন চেয়ারম্যান, বাণিজ্য বিভাগ	প্রফেসর, বাণিজ্য অনুষদ, রাঃ বিঃ
২।	আহমদ মোহাম্মদ প্যাটেল চেয়ারম্যান, ভূগোল বিভাগ	পাকিস্তানে বাস করছেন
৩।	সোলায়মান মন্ডল চেয়ারম্যান, অর্থনীতি বিভাগ	প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাঃ বিঃ
৪।	ওয়াসিম বারী বাঘী, সহযোগী অধ্যাপক, মনস্তত্ব বিভাগ	পাকিস্তানে বাস করছেন
৫।	জিল্লুর রহমান রিডার, আইন বিভাগ	প্রফেসর ও ডীন আইন অনুষদ, রাঃ বিঃ
৬।	কলিম, এ, সাসারামী সহযোগী অধ্যাপক, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ	প্রফেসর, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, রাঃ বিঃ

দালালীর অভিযোগে অভিযুক্ত এবং স্বাধীনতার পর পলাতক।

১।	আহমেদ উল্লাহ খান সহযোগী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ	প্রফেসর, ইংরেজী বিভাগ, রাঃ বিঃ
২।	ইবনে আহমদ, অন্যতম ডেপুটি রেজিস্ট্রার	প্রাক্তন রেজিস্ট্রার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া

সূত্র—দৈনিক বাংলা—১৭/৫/৭২

'.....আজ এখানে দাঁড়িয়ে এই রক্ত গোধূলিতে
অভিশাপ দিচ্ছি।
আমাদের বুকের ভেতর যারা ভয়ানক কৃষ্ণপক্ষ দিয়েছিলো সেঁটে,
মগজের কোষে কোষে যারা
পুঁতেছিলো আমাদেরই আপনজনের লাশ
দগ্ধ, রক্তাপ্লুত,
যারা গণহত্যা
করেছে শহরে গ্রামে টিলায় নদীতে ক্ষেত ও খামারে,
আমি অভিশাপ দিচ্ছি নেকড়ের চেয়েও অধিক
পশু সেই সব পশুদের।

ফায়ারিং স্কোয়াডে ওদের
সারিবদ্ধ দাঁড়
করিয়ে নিমেষে ঝাঁ ঝাঁ বুলেটের বৃষ্টি
ঝরালেই সব চুকে বুকে যাবে তা আমি মানি না।
হত্যাকে উৎসব ভেবে যারা পার্কে মাঠে
ক্যাম্পাসে বাজারে
বিষাক্ত গ্যাসের মতো মৃত্যুর বীভৎস গন্ধ দিয়েছে ছড়িয়ে,
আমি তো তাদের জন্যে অমন সহজ মৃত্যু করি না কামনা।
আমাকে করেছে বাধ্য যারা
আমার জনক জননীর রক্তে পা ডুবিয়ে দ্রুত
সিঁড়ি ভেঙে যেতে
ভাসতে নদীতে আর বনবাদাড়ে শয্যা পেতে নিতে,
অভিশাপ দিচ্ছি আজ সেই খানে দজ্জালদের।'

অভিশাপ দিচ্ছি/শামসুর রাহমান